১ম বর্ষ ১৩৩২ — অগ্রহায়ণ। — ১ম সংখ্যা ~~কার্ত্তিক~~

"শোভনা"

রাজনৈতিক আঁলোচনা বর্জ্জিত
মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক — শ্রী প্রজাপতি জানা।
সহ „ শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তি।

বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা প্রতি সংখ্যা তিন আনা মাত্র।

সূচি পত্র।

অগ্রহায়ণ ।

১ম বর্ষ
১৩৩৩

১ম সংখ্যা
~~কার্ত্তিক~~

"শোভনা"

রাজনৈতিক আলোচনা বর্জ্জিত
মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক — শ্রী প্রজাপতি জানা।
সহ „ শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তি।

বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা প্রতি সংখ্যা তিন আনা মাত্র।

সূচি পত্র।

১ম বর্ষ
১৩২৯

শোভনা

১ম সংখ্যা
কার্ত্তিক

শোভনা

এস হৃদয়ে শোভনা, কুসুম-বরণা
করেতে লইয়া বীণা,
এস স্নিগ্ধ উজলা বাক্‌রাণী বালা
বরষি অমিয়কণা।
এস ভাষারআসরে মোহন ঝঙ্কারে,
জলদ গভীর মন্দ্রে,

এস কবিতাকাননে, পুষ্পবর
পঞ্চম পূরিত ছন্দে
এস বীণার বাদনে, কোকিল
তটিনীর গানে তু
এস রূপ বিতরণে, জ্যোতিঃ
উজলি সাহিত্য-ভূ

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তি।

মুগ্ধ

—§§§—

যখন সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা, আমাকে দুর্ব্বল পাইয়া, টিপিয়া মারিতে-ছিল; তখন আমার মনটা একবার জ্বালা জঞ্জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিতান্তই আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল। মন এমন অবস্থাতে ও পর্য্যন্ত নেমে এসেছিল, যাতে আমি গলায় দড়ি দিয়ে এ সংসার থেকে অব্যাহতি পাই! এমনি করে সংসারের নানা জ্বালা জঞ্জাল আমার মাথাটাকে টিপে ধূলির সঙ্গে প্রায় একাকার করে রেখেছিল। এমন সুবিধাও হয়ে উঠেনি যাতে মাথা তুলে একটু প্রতিকার করতে পারি! বিনিদ্র রজনীগুলার মধ্যে অন্ধকারে কতকি চিন্তা আমার মাথা মন্ডল করিয়া দিত! শেষে ভাবিয়া স্থির করিলাম, ভ্রমণে যাইয়া এ যন্ত্রণার কতকটা উপশম করিব।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

সিটী দিয়া বাষ্পীয় শকট ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল; পরের ষ্টেসনেই কাশী। আমি কাশী অবধি টিকিট করিয়াছি; সেই কাশীতে নামিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছি। দিবা রাত্র ধরিয়া গাড়ীর একঘেয়ে স্বর নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল; নানা নূতন নূতন বস্তু জানালা হইতে নিতান্ত উদ্গ্রীব হইয়া দেখিবার আশা তখন থাকিলেও মন আর টিকিয়া উঠিতে পারিয়াছিল না— শারীরিক অসুস্থতার নিমিত্ত।

সিটি দিয়া বাষ্পীয় শকট থামিয়াছে। পিপীলিকার মত জনস্রোত নামিতেছে ও উঠিতেছে। অল্পক্ষণ পরে স্রোতটা কিছু কমিয়া গেল, আমিও নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া কোথায় যাইব কি করিব কিছুই মনে নাই; শুধু একটা বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছি; তখন রাত্রি তেমন নাই;

ঊষাদেবী অলক্ত বসন পরিয়া আগমন করিতেছেন! কেবল চলিতেছি — কোথায় যাইব তাহার স্থির নাই।

পথে একটী স্ত্রীলোক স্নান সমাপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার সিক্ত বসন জড়াইয়া দিয়া মন্থর গমনে আসিতেছে। যৌবন-শ্রী যেন তার সিক্ত বসন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমি আমার মুগ্ধ আঁখি দুটাকে তার উপর হতে কোন ক্রমে শত চেষ্টা করিয়াও ফিরাইতে পারিতেছি না। এমন কতবার দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দুটী নয়নের দ্বারা তার রূপসুধা পান করিতে-ছিলাম তা মনে নাই। যখন সে ডাকিল "এযে নির্ম্মল দা" তখন যেন লজ্জায় আমার মাথা পর্য্যন্ত উঠিল না। এমনকি আমার মনে হইতে লাগিল এ কুঞ্চিত ভ্রু, উন্নত গ্রীবা, রক্তাভ গণ্ড, অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত ফুল্ল অধর,— এমনকি প্রতি পদক্ষেপ পর্য্যন্ত যেন আমার বিশেষ চেনা। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা গুলাকে স্মৃতির দ্বারা মনের মাঝে আলোড়িত করিতে লাগিলাম, কিন্তু এত পরিচিত হস্ত পদের রূপসীটিকে চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাকে নীরব দেখিয়া সে ই-মধ্যে বলিয়া লইয়াছে, "দয়া করে আমার বাসায় চলুন।" আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে লাগিলাম।

(খ)

আমি খোলা জানালার ধারে বসিয়া উন্মুক্ত মাঠের দিকে আমার দৃষ্টিটাকে ছড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু মনের এমন বিকৃত অবস্থা, চক্ষু দুটা এমন সৌন্দর্য্য হইতে বিন্দুমাত্র আনন্দ গ্রহণ করিতে পারিতেছিলনা। কেবল তখন মনের উপর দিয়া যেন এক একটা দমকা বাতাস বহিয়া যাই-

তেছিল। মন যেন কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না—এমন, পায়ের নখ পর্য্যন্ত যাহার চেনা তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইতেছে কেন? ....এরূপ নানা প্রকার প্রশ্নে তখন আমার মাথা ভরিয়া উঠিতেছিল। তারপর যদি তাকে না চিনিতে পারিলাম তবে তাহার বিশেষ পরিচয় না লইয়া কেন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় চলিয়া আসিলাম? সে নীরব গৃহ হইতে পলাইয়া আসিবার মতলব যে আমার মনে উঠে নাই এমন নহে; কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা ছিলনা যাহাতে উঠিয়া পলাইয়া আসিতে পারি। মনকে সহস্র চিন্তায় ভারি করিয়া আমার দৃষ্টিটা উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া শরতের শস্য শ্যামল প্রকৃতির উপরে ছড়াইয়া দিলাম।

* * * * * * *

কতক্ষণ এমন ভাবে ছিলাম মনে নাই, সহসা কপাটের উপর আঘাত পড়ায় চাহিয়া দেখিলাম সে সুন্দরী এক থালা লুচি লইয়া দাঁড়াইয়া। বলিলাম "এই যে আমার জল খাওয়ার ত তেমন ইচ্ছা নাই; কল্য যে একটা বিনিদ্র রজনী গিয়াছে।" মুচকি হাসিয়া সুন্দরী উত্তর দিল "দয়া করে দুখানা খান, ঘেন্না করবেন না।" আমি নীরবে সে গুলির সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিলাম।

আমার দুর্দমনীয় ক্ষুধার জ্বালায় যে পেট জ্বলিতেছিল, তার বিন্দু বিসর্গও ভাবনার তাড়নে জানতে পারিনি। খাওয়ার সময় এমন সময় করে উঠতে পারিনি যাতে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। খাওয়ার শেষে চাহিয়া দেখি, সুন্দরী চৌকাটের উপর বসিয়া আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। আহার শেষে নিকটস্থ রেকাব হইতে

পান একটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম "কৈ আপনাকে ত আমি চিনেও চিন্‌তে পারছি না !" সুন্দরী স্মিত মুখে বলিল 'আমি যখন সারা গ্রামের ইস্কুলে পড়ি, সেদিন অবধি আপনাকে চিনি; আমার নাম কুসুম, পিতার নাম —" সুন্দরীর অসমাপ্ত বাক্যের উপর আমি উত্তর দিলাম "হাঁ হাঁ" আর আমার যেন কথা বলিতে সাহস হইল না। যেন কি একটা অপরাধ করিয়াছি,— লজ্জায় মাথা ঝুকিয়া পড়িল! সেও আমাকে নীরব দেখিয়া "তবে এখন আসি, অবসর মত দেখা করিব।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি তাকে থামাইয়া আর দুটা কথা বলিবার জন্য যদিও বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা হয়ে উঠেনি, যাতে আমি একটা কথা মুখ ফুটিয়া বলি।

(গ)

সন্ধ্যা হইতে বেশী বিলম্ব নাই। অস্তগামী বৃদ্ধ সূর্য্যদেব সারা প্রকৃতির উপর সিন্দুর ছড়াইয়া দিয়াছেন, রাঙা রাঙা মেঘখণ্ড, বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ন্যায়, সারা আকাশ ছড়াইয়া পৃথিবীর সামান্য ক্ষুদ্র বস্তু হইতে সমস্ত বস্তুকে লাল করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনের ভিতরও যেন সেরূপ পুড়িয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। মনে মনে আত্মাকে কত ধিক্কার দিতে লাগিলাম, কেননা কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে আমাকে ভালবাসে কিনা? যে স্মৃতিকে উদ্ধার করিতে স্বর্গ মর্ত্ত হাৎড়াইয়া ছিলাম তাহা যেন চোখের সাম্‌নে জল জল করিতে লাগিল। এমনকি লুকোচুরি খেলাটী পর্য্যন্ত যেন

আমার মনের উপর অমৃত ঢালিতে লাগিল। বকুল ফুলের মালা লইয়া আসিতে ভুলিলে বা অন্য কাহাকেও দিলে, পড়া জিজ্ঞাসা করিতাম; কত জিজ্ঞাসা করিতাম মনে নাই— তবে এদিক ওদিক করিয়া একটু ভুল তাড়িয়া বাহির করিতাম। তাহার পর নির্দ্দয়-ভাবে শাস্তি দিতে ভুল করিতাম না। ....ইত্যাদি নানা প্রকার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত হইয়া আমার মনকে তখন একটা অপূর্ব্ব শান্তির রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল; আমার চিন্তা ভিন্ন যেন ঐ পৃথিবীতে কিছুই ছিলনা।

আমি যখন ভাবনার তাড়নায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম তখন গড় গড় শব্দে একটী অশ্বযান আমার সম্মুখে আসিয়াছিল; তাহা হইতে একটী বৃদ্ধ ও একটী যুবক, ট্রাঙ্ক-বাহিত চাকর একটির সহিত অবতরণ করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন কিনা বা আমি তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে পারিনি; এটা স্থির করিয়া উঠিতে আমি নিতান্ত অসমর্থ। সন্ধ্যার পর জল খাওয়ার আসিল; কিন্তু কুসুমের দেখা পাওয়া গেল না। তাহার পর রাত্রে ভাত খাইয়া শুইলাম, কিন্তু তবুও তাহার দেখা পাইলাম না। একটা চাকরের দ্বারা সংবাদ পাইলাম "তিনি এখন দেখা করিতে পারিবেন না, সকালে আপনাকে দয়া করিয়া বাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।" আমি যদিও নবাগত বাবুদের পরিচয় পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু চাকরের তৎপরতা দেখিয়া আমি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না।

* * * * * * *

মনে হইল কুসুম বলিয়াছে চলিয়া যাইতে, আর এক মুহূর্ত্তও যেন মন সেখানে থামিল না। কুসুম আমার মনকে এমন দখল করিয়া বসিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে একটু কথা বলিতেও আমার শক্তি ছিলনা।

ষ্টেসনে আসিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। সামান্য একটা রমণীর ইঙ্গিতে কাশীর সজীব বিশ্বেশ্বরের চরণে একটী পুষ্পও সমর্পণ করিতে পারিলামনা। —এমনকি তাঁহার চরণ দর্শনও একবার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিলনা। কাশীর এমন পবিত্র স্থান ছাড়িয়া যাইতে মন যেন নিতান্ত অনিচ্ছুক হইল। ষ্টেসনে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের কথা ভাবিতে ভাবিতে, মনে হইল ফিরিয়া যাই, তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি। কিন্তু পরক্ষণেই কুসুমের কথা মনে হইয়া, মন আর একরূপ হইয়া গেল; আমি পুরী পর্য্যন্ত টিকিট কাটিয়া বসিলাম।

ট্রেনে উঠিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম; আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিশ্বেশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলাম। যদিও সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে উঠেনি, কিন্তু তাঁহার প্রতি যখন মন প্রাণ সব দিয়া চিন্তায় লিপ্ত হইলাম, অগ্রে যেন তাঁহার বিশ্ব-মোহন মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ যেন আর স্থির থাকিতে পারিয়াছিলনা; মন যেন স্বতঃই দেহের ভিতর তাঁহার চরণে লুটিয়া পড়িতেছিল। সেই চিন্তার মাঝখানে ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে — সে জলন্ত বিরাট ট্রেনের উপর বসিয়া আমার মনে হইতেছিল যেন স্বর্গীয় পুষ্পরথে আরোহন করিয়া আমি স্বর্গের অন্বেষণে যাইতেছি।

[ঘ]

ইতিমধ্যে পুরীতে পৌঁছিয়াছি। একটী বাঁসা করিয়া মন ও স্বাস্থ্যকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য নিতান্ত উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছি। এখানে চির-বিচ্ছিন্ন হিন্দু এক আসনে বসিয়া, এক পাত্রে এক প্রাণে ভোজন করিয়া, হিন্দুর বহু-বহু-- পুরাতন একতার আভাস জাগাইয়া দেয়, তখন প্রাণ নিতান্ত আনন্দে নাচিয়া উঠে। জানিনা কবে সারা ভারতবর্ষ এমনি পূণ্য তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

অনেক দিন হইল এখানে রহিয়া গেলাম। বৈকালে দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ আই ঠাই করিয়া উঠে; এক পা ভ্রমণেরও যো নাই। আর সন্ধ্যায় শীত অনুভবও মন্দ হয় না। শীত গ্রীষ্মের এমন সম্মিলন খুব কমই দেখিয়াছি।

সংসারের দিকে মন আর টানিতেছিল না, যেন সংসার-বন্ধন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! মানুষের সংস্পর্শ যেন বিছার ন্যায় দংশন করিতেছে, সকল সময়েই যেন মনের মধ্যে বাজিতে লাগিল, যে কুসুম একদিন একটি সামান্য অফুটন্ত গোলাপ-কোরকের ন্যায় আমার সম্মুখে বেড়াইত এবং আমার মনের মাঝে সৌন্দর্য্যের এতটুকু লোভ পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারেনি, সে কুসুম আজ ষোল কলায় প্রস্ফুটিত হইয়া, মনের মাঝে সৌন্দর্য্যের এত লোভ জন্মাইয়া দিল। আমি যে প্রথম হইতে সৌন্দর্য্য-পিপাসু নহে — এমন নহে।

সর্ব্বদাই কুসুমের কথা মনে হইয়া মনকে আর কোন বিষয়ের এতটুকু চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে দিল না। মনে সাত পাঁচ কতকি ভাবিলাম কিন্তু কুল কিনারা পাইলাম না। প্রতি কার্য্যে — প্রতি দৃষ্টিতে যেন আমার চোখের মাঝে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কেবল ভাবিতেছি, সে বিবাহ করিয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম না কেন? আর আমার বাড়ী যে সে গ্রামে নাই তাহাও না জানাইলাম কেন? আর আমার বর্ত্তমান অবস্থারও পরিচয় দিলাম না কেন? সেদিন যে বৃদ্ধটী একটী যুবক সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল সে বা কে? আর যুবকটি বা কে? কুসুমকে সে বিবাহ করে নাই ত? .... মনের মাঝে এইরূপ নানা প্রশ্ন উঠিয়া মনকে ভারী করিয়া তুলিল। তখন যদিও আমি বিন্দুমাত্র অদৃষ্ট-বাদী ছিলাম না, কিন্তু এমন কষ্টে পড়িয়া নির্দ্দোষ অদৃষ্টের মাথায় দোষ চাপাইয়া মনে একটু শান্তি পাইবার

প্রয়াস পাইলাম। সবই ব্যর্থ হইল। মনে হইতে লাগিল সে সুন্দর যুবকটী তাঁহার স্বামী, আমাকে দেখিয়া কুসুমের নিকট পরিচয় লইয়া আমার প্রতি হয়ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। এ সব কথা আলোচনায় কুসুমের কথা দূরে পড়িয়া যায় দেখিয়া, আবার তাহার চিন্তায় মনকে ডুবাইয়া দিলাম।

আমার সুদূর বাল্য জীবনের স্মৃতি মনের মাঝে উদিত হইল। আজ প্রায় দশ বৎসর হইল আমি আমার পিতৃ-বাসস্থান ছাড়িয়াছি। যখন ছাড়ি, তখন কেউ জানতে পারেনি। দেশের সঙ্গে দলাদলি করিয়া আমার পিতা দেশের অন্যায় অত্যাচার হইতে নিজের মাথাকে বাঁচাইবার জন্য এবং নিজে বংশের উত্তরাধিকারীকে বাঁচাইবার জন্য রাত্রে দশক্রোশ দূরে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন হইতে কুসুমের সঙ্গে আর দেখা নাই। কুসুম স্ত্রীলোক; তাই তাহার অল্প বয়স হইতে অনেকটা জ্ঞান হইয়াছে। তবে সে আমার সমবয়সী নহে, আমা হতে প্রায় আট বছরের ছোট। আমার মনে হইল, আমার সহিত তাহার বিবাহ হইবে বলিয়া কথা ছিল। তাহার পিতা ও আমার পিতা আমাদের বাল্য প্রণয় দেখিয়া নিতান্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তখন বিবাহের অর্থ সম্পূর্ণ রূপে না বুঝিয়াও আমি একদিন উপহাস ছলে কুসুমকে বলিয়া ছিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।" তার উত্তরে সে নিতান্ত বিরক্তির মুখভঙ্গি করিয়া একটা ঘুসি তুলিয়াছিল। আমার পিঠে যদিও সে ঘুসিটা লাগিয়াছিল, কিন্তু উত্তোলনের তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র। জানিনা সেদিন সে বিবাহের অর্থ বুঝিত কিনা!

[আগামী বারে সমাপ্য।]

শ্রী আদিত্যকুমার বাঁবুড়া।

বেদ ও বেদান্তের উৎপত্তি।

অরেহস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্
ঋক্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। শং ব্রাহ্মণ
যস্য নিশ্বসিতং বেদাঃ। সাং।

বেদ পরমেশ্বরের নিশ্বসিত অর্থাৎ নিশ্বাস স্বরূপ। নিশ্বাস যেমন অনায়াসে শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং পুনশ্চ শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেই প্রকার বেদও পরমাত্মা হইতে উদ্ভব হয় এবং পুনর্ব্বার তাঁহাতেই লীন হয়। তাঁহার নিশ্বাস বহির্গমনের কাল ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ ৪,৩২০,-০০০০০০ বৎসর। এই পরিমাণ কাল জগৎ বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে। ইহার নাম উদয় কল্প। আবার এতাবৎ সংখ্যাই পরাত্মার নিশ্বাস নিরোধের কাল। ইহার নাম ব্রহ্মার রাত্রি বা ক্ষয়কল্প। এই কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মজগৎ কারণে লীন হইয়া মহা প্রলয়াবস্থায় থাকিবে। পুনশ্চ উদয়-কল্পে কর্ম্মজগৎ সৃষ্ট হইবে এবং ক্ষয় কল্পে কারণে বিলীন হইবে। এই প্রকারে সৃষ্টির অনন্ত প্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কত চতুর্যুগ কত মন্বন্তর ও কত ব্রহ্মকল্প অতীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাকরা মনুষ্যের সাধ্য নহে। উদয়কল্পে যখন পরমাত্মার নিশ্বাস বহির্গমন হইবে তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হইবে এবং বেদের উদ্ভব হইবে। ক্ষয়কল্পে যখন পরমাত্মার নিশ্বাস নিরোধ হইবে তখনই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে এবং বেদও তাঁহাতে বিলীন হইবে। এই প্রকারে বেদের আবির্ভাব ও তিরো-ভাব হইয়া থাকে। এই কথা আর্য্যজ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রমাণানুগত সুতরাং সর্ব্বথা আমাদের শ্রদ্ধেয়। বেদ জ্ঞানময় যখন সর্গারম্ভ হয় তখন জ্ঞানের আবশ্যক হয় সুতরাং পরমাত্মা হইতে বেদের উদ্ভব হয়। যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় জ্ঞানের আবশ্যক থাকেনা সুতরাং জ্ঞানময় বেদ পরমাত্মায়

বিলীন হয়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিনের কোন সময় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায় বিশদ-রূপে বলিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে অনূদিত হইল।

প্রশ্ন। কত বৎসর বেদের উৎপত্তি হইয়াছে?

উত্তর। বেদ ও জগতের উৎপত্তি কাল ১৯৬০৮৫২৯৭৬ বৎসর।

প্রঃ। প্রমাণ কি?

উঃ। এই বর্ত্তমান সৃষ্টির সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর কাল চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে ষষ্ঠ মন্বন্তর অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ মনুর কাল অতীত হইয়াছে। সাবর্ণি আদি সপ্ত মন্বন্তরের অধিকারের কাল এখনও অবশিষ্ট আছে। মন্বন্তরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ এবং একসপ্ততি চতুর্যুগের নাম মন্বন্তর। উহার গণনা এই প্রকার। সত্যযুগের সংখ্যা ১৭২৮০০০ বর্ষ। ত্রেতার ১২৯৬০০০ বর্ষ। দ্বাপরের ৮৬৪০০০ বর্ষ। কলির ৪৩২০০০ বর্ষ। চতুর্যুগের সমষ্টি ৪৩২-০০০০ বৎসর। উহার একসপ্ততি গুণে ৩০৬৭২০০০০ বৎসর হয়। উহারই নাম এক মন্বন্তর। অতীত ষষ্ঠ মন্বন্তরের সংখ্যা ১৮৪০৩২০০০০ বৎসর। বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরের অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর ১২০৫৩২৯৭৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। এখনও ১৮৫১৮৭১০২৪ বৎসর ভোগাবশেষ আছে। এই মন্বন্তরের এখন ২৮ চতুর্যুগ চলিতেছে। তন্মধ্যে সম্প্রতি কলিযুগের অধিকার। উহার ভুক্তকাল ৫০১২ এবং ভোগাবশিষ্ট কাল ৪২৬৯৮৮ বৎসর।

এই গণনানুসারে বর্ত্তমান কালের অতীত ষষ্ঠ মন্বন্তরের ভুক্তকাল ১৮৪০৩২০০০০ এবং বর্ত্তমান সপ্তম মনুর ভুক্তকাল ১২০৫৩২৯৭৬ বৎসর, এই উভয়ের যোগফল ১৯৬০৮৫২৯৭৬ বৎসর। এই কালই বর্ত্তমান কল্পে-র বেদ ও জগদুৎপত্তির কাল শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা, ভৃগু এবং বশিষ্ঠাদি অষ্টাদশ জ্যোতিষ প্রবর্ত্তক ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্য-ভট্ট ভাস্করাচার্য্য শ্রীপতিলল্ল, বরাহ মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং শ্রীধরাচার্য্য

প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্ব্বিদগণ এইরূপ গণনা করিয়াছেন এবং এই গণনাই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অখণ্ডভাবে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে গণিত যুগ মন্বন্তর কল্প ইত্যাদি আমাদের সকল শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমাদের সকল ক্রিয়া কলাপের সংকল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সংকল্প পুরুষপরম্পরাগত হইয়া একেবারে আমাদের অস্থিমজ্জাতে নিহিত হইয়াছে। বেদও জগদুৎপত্তির এই কাল আমাদের শাস্ত্রতঃ ব্যবহারতঃ সিদ্ধ। আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণ অনন্তকালের স্থুল ও সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়াছেন যথা নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, পৈত্র ও দৈব, অহোরাত্র মাস, বৎসর যুগ, মন্বন্তর ও কল্প ইত্যাদি। এইরূপ কালবিভাগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। এইরূপ অনন্তকালের বিভাগ ও জ্ঞান অন্য কোন জাতির মধ্যে নাই এবং হওয়ারও সম্ভব নাই। যাঁহারা বলেন যে বেদোৎপত্তির কাল ২৪০০ কিংবা ২৯০০ অথবা ৩০০০ বৎসর তাঁহারা কাল জ্ঞানানাভিজ্ঞ। এইকথা তাঁহাদের বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা ও আধুনিকতার পরিচায়ক। উহা দৃঢ়তর প্রমানদ্বারা অবধারিত হয় নাই সুতরাং অগ্রাহ্য।

য়িহুদিদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পৃথিবী-সৃষ্টির যে কাল উক্ত হইয়াছে তাহা আমাদের শাস্ত্রোক্ত কল্পারম্ভের কাল নহে। উহা বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভকাল। উক্ত শাস্ত্রোক্ত কাল ৫৯১৭ বৎসর আমাদের শাস্ত্রোক্ত কলির আরম্ভকাল ৫০১৪ বৎসর। এই ব্যতিক্রম গণনার ব্যতিক্রমে হইতে পারে কিম্বা অন্য কোন কারণেও হইতে পারে। ফল উহা যে কলির আরম্ভকাল এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয়না এবং ঐ শাস্ত্রেরও অপ্রামান্য হয় না।

[ক্রমশঃ]

শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদতীর্থ।

তুমিই সব।

দেব! তুমিই—
শিশির-সিক্ত প্রভাত-পুষ্পে,
সুবাস-রঙ্গে ভাসি,
মানব-অলি পাগল কর,
বিভোর কর আসি;
স্নিগ্ধ সমীরে বহিয়া সদা
জুড়াও শ্রান্ত অঙ্গ,
তটিনী-বক্ষে তরঙ্গ তুলি
দেখাও কিবা রঙ্গ!
মেঘের কোলে জলদ-রূপে
ঢাল্‌ছ বারি-রাশি,
তপন-তারা-শশীর করে
হাস মধুর হাসি;
তরু-শাখায় মঞ্জরী হয়ে
দুল্‌ছ মৃদুল বায়,
মাতার বক্ষে পীযূষ হয়ে
বাড়াও শিশুর কায়
বিহগ-কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
গাচ্ছ মধুর গান,
সর্ব্ব রূপে মিশিয়া সকলে
মোহিছ জগত-প্রাণ।

শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী
এইচ,এম,বি।

আকাঙ্খা ।

—•••❋❋❋❋❋❋❋•••—

সে মাসটা ছিল শ্রাবন মাস। সকাল হতে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি হচ্ছিল মেঘটাও থাক্‌তে থাক্‌তে গুর গুর করে উঠ্‌ছিল ও একটা একটা উত্তরে বাতাস স্বন স্বন করে বয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় আমি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে বসেছি কি যেন একটা কিসের আকাঙ্খা এসে আমার মনের উপর অধিকার করে বস্‌ল। আমি মনকে অনেক বুঝালুম, বল্লুম তুই অতবড় দুরাশা করেছিস বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা করেছিস তা হওয়া যে একবারেই অসম্ভব। কিন্তু মন কিছুতেই বুঝে উঠল না, সে বল্ল, আমার সে আকাঙ্খিত .... চাই। তখন আর কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পাল্লুম না, মনের তাড়নায় সে পিচ্ছিল রাস্তা ধরে বারালুম। সে সময় ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি গায়ে পড়তে লাগল, সেদিকে কোন রকম লক্ষ্য না করে সে পথ ধরে চল্‌তে লাগলুম। পথিকরা কেউ কেউ আমাকে শুধু গায়ে বৃষ্টির মাঝখান দিয়ে যেতে দেখে পাগল বলে ঠাওরান, আবার কেউ কেউ বা হি হি করে হাসতেও লাগল। আমি কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করে সোজা পথ ধরে চল্‌তে লাগলুম।

আবার একটা কালো মেঘ উঠে গোটা আকাশটা ছেয়ে ফেলল্। মুসলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হোল। আরও অনেক বাধা বিঘ্ন এসে সামনে ঠেকলো, সে গুলাকে অতিকষ্টে অতিক্রম করে গন্তব্য পথে চল্‌তে লাগলুম। চলতে চলতে পরিশ্রমে শরীরও পর পর অবসন্ন হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার একটু আগে একটা বনের ধারে উপস্থিত হলুম বন দেখেই প্রাণটা শিউরে উঠ্‌ল। কিন্তু যাই হক মনের বশে সে বনের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলুম। কিছুদূর যেতে যেতে দূরে দেখলাম কিনা একটা মস্ত বড় ভালুক আমার দিকে আসছে। তখন শরীর একবারে অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছল, এমনকি নড়ারও শক্তি রহিত হওয়ার মত হল কোনদিকে পলাতে

পারলুম না। তখন যেন মনের আকাঙ্খা সব ভুলে গেলুম; আর জীবনের মমতা এসে পর পর আকড়ে ধরল।

মাথাটা তখন বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল সেইখানেই অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর কখন কি হল আমার কিছু মনে নাই, যখন জ্ঞান হল দেখলুম পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যদেব লাল হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রাতের স্নিগ্ধ বায়ুসঞ্চারে যখন আমার ভাল রকম জ্ঞান হইল; তখন ভাবতে লাগলুম কেনবা আমি এখানে এসে পড়েছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলু না। পূর্ব্বের কথা আমি সব ভুলে গেছি। তখন ভাবলুম আমি পাগল নাকি

যা হউক সেখান হতে উঠে বন ছেড়ে পথ ধরে চলতে লাগলুম; কেনই বা এখানে এসে পড়ছিলুম। তারপর সংসারের মায়া মমতা আমা আকড়ে ধরছল আর নানা ভাবনা এসে আমার মনকে মন্ডল ক তুলতেছিল।

এমন সময় দূরে পথিক গাহিতেছিল,—

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবেনা।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

শ্রী প্রজাপতি জানা।

—∘∘∘✤✤✤✤✤✤∘∘∘—

কুটির-রাণী।

৪ টার পর office থেকে আসতে একটা urgent তা— কাশীতে মায়ের বড় শক্ত ব্যারাম হয়েছে, আমি যেন কাল বি কাশীতে পৌঁছি। তাড়াতাড়ি নিজেকে তৈরি করে নিয়ে এক গাড়ী ভাড়া করে হাওড়া ষ্টেসনে এসে পৌঁছলুম। Time-

দেখলুম, ট্রেন ছাড়তে বেশী দেরী নাই; তাড়াতাড়ি একখানা থার্ড ক্লাশের টিকিট কেটে একটা কামরায় ঢুকে পড়লুম। মিনিট কয়েক পরে ট্রেন মন্থর গমনে প্লাটফরম্ ছাড়তে লাগল, তারপর রেলগাড়ি ধোঁয়া খমন করতে করতে উল্কাবেগে দৌড়তে লাগল। বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়তেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনা, সহসা জেগে উঠে দেখলুম ট্রেন থেমেছে, কুলী হেঁকে যাচ্ছে— বর্দ্ধমান। সেখানে মিনিট কতক থেমে ট্রেন আবার দৌড়তে লাগল। কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রেন মোগল সরাই ষ্টেসনে এসে পৌঁছল। ব্যাগটা হাতে করে আমি নেমে পড়লুম। নিকটে পার একটা প্লাটফরমে কাশীর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়ীতে একটা কামরায় ঢুকলুম। যে কামরাটায় আমি ঢুকলুম তাতে একজন প্রবীন ভদ্রলোক আর তাঁর পাশে এক বালিকা বসেছিল। অপর বেঞ্চে একজন মাড়োয়ারী বসে ছিল। আমিও একটা বেঞ্চ দখল করলুম। মিনিট কতক পরে ট্রেনের বিউগল বেজে উঠল, ট্রেনও দৌড়তে লাগল। আমি ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়েছি, সবে মাত্র আমার একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় সেই কামরায় ধপাস করে একটা শব্দ হোল। আমি তাড়াতাড়ি চেয়ে দিয়েই শিউরে উঠলাম। দেখলাম, বালিকাটি ঘুমোচ্ছে, ভদ্রলোকটি সংজ্ঞাহীন ভাবে বেঞ্চের নীচে গড়িয়ে পড়েছেন; তাঁহার দেহে সাড়া শব্দ কিছুই নাই; আর সেই মাড়োয়ারী একটা ছোট শিশির হাতে করে আমার দিকে আসছে। আমি তখন সব বুঝতে পারলাম। উঃ! কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক এটা! এই আরকের শিশিটা শুঁকিয়ে দিয়ে সে সেই নিদ্রালু ভদ্রলোকটিকে অচেতন করে ফেলেছে। হায় যদি তিনি না পড়তেন, তাহলে বোধহয় এ সর্ব্বনাশ হোত না। আমি দেরী না করে বাঘের মত লাফিয়ে উঠে মাড়োয়ারিটার হাতে এমন এক আঘাত দিলাম যে শিশিটা সশব্দে মেজের উপর পড়ে গিয়ে গুঁড়ো

হয়ে গেল। বালিকাটি সে শব্দে জেগে উঠল, আমি তাকে সংক্ষেপে সব কথা জানালুম। আমার কথা শুনে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা গেল। এর ভেতর সে মাড়োয়ারিটা আমার পিঠে দু তিন বার আঘাত করেছিল, আমি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার গলা টিপে ধরলাম। সে তখন কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে আমার বাঁ হাতে আঘাত করল। আমি দারুণ আঘাত পেয়ে তার হাত ছেড়ে দিলুম। আমার ক্ষত স্থান দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগল, সর্ব্বাঙ্গ অবস হয়ে এল, কিছু সময়ের জন্ম আমি কি করব কিছু ঠিক করে উঠতে পারলাম না; সহসা আমার মনে হল এ্যালারম্ সিগন্যালটা টানলে গাড়ী থেমে যায়, আমি তখুনি এ্যালারম্ সিগন্যালের শিকল ধরে নাড়া দিলুম। মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ি থেমে গেল। "What's the matter ?" বলিয়া গার্ড পৌঁছতেই আমি তাঁকে ক্ষীণ কণ্ঠে সব কথা বল্লুম। তিনি তখুনি মাড়োয়ারীটাকে পুলিশের জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকটির গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন,— "Horrible ! he is dead and gone" তাঁর কথাশুনে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলুম, সত্যই তাঁর দেহ শীতল হয়ে গেছে। তারপর আমরা কিছু ক্ষণ বালিকাটির শুশ্রূষা করতেই তার জ্ঞান ফিরে এল। সুস্থ হয়ে সে সেই মৃতদেহের উপর ঝুকে পড়ে "বাবাগো ! বাবাগো !" বলে কাঁদতে লাগল, আমি তাকে শান্তনা দিতে লাগলুম। গার্ডসাহেব আমার নিকট থেকে যথারীতি প্রমানাদি নিয়ে লাস চালান দিলেন; পরে বালিকাটির রক্ষণের ভার আমাকে দিয়ে চলে গেলেন। এমন সময় গাড়ী গঙ্গার সেতুর উপর উঠল। সেতুর উপর থেকে বেনীমাধবের ধ্বজা দেখে যাত্রীর দল "জয় বিশ্বনাথ কি জয়" বলে চিৎকার করে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে

গাড়ী সেভুর ওরপারে কাশী ষ্টেসনে পৌঁছল। আমি টিকিট কলেক্টরের হাতে টিকিট দুখানা দিয়ে বালিকাটিকে সঙ্গে করে ষ্টেসনের বাইরে এসে পড়লুম। তারপর বালিকাটিকে জিজ্ঞাসা করলুম,—

এখন তুমি যাবে কোথা? এখানে তোমার কোন আত্মীয় আছেন কি?

এখানে কেন এ জগতে আর আমার আপনার বলতে কেউ নাই, আমার সাত বছর বয়সের সময় মাতৃহারা হই তারপর আজ আবার বাপকেও হারালুম।

এই বলে সে কাঁদতে লাগল। এদিকে মায়ের জন্য আমার মন নিতান্ত আকুল হয়ে উঠেছিল; আমি আর দেরী না করে তাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলুম। মায়ের তখন ভয়ানক জ্বর, আমি বালিকা-টির থাকবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে মায়ের সেবায় নিযুক্ত হলুম।

দিন কতক পরে একদিন একটা সংবাদপত্রে দেখতে পেলুম,—

গতবারে আমরা কাশীর পথে মেল ট্রেনে যে ভীষণ হত্যার কথা জানাইয়াছিলাম, অদ্য তাহার বিচার শেষ হইল। আসামীর মুখে প্রকাশ যে, সে মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী, পরস্পর পরস্পরের শত্রু; বিবাদী মাড়োয়ারির বেশে স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য মৃত ব্যক্তির সঙ্গ লইয়া পথিমধ্যে বিষাক্ত ঔষধপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশ করে।

[২]

দিন কতক পরে মা বেশ সুস্থ হলেন। একদিন তিনি বালিকাটিকে পাশে ডেকে বল্লেন,— "মা, আমার ইচ্ছে করে তোমাকে আমাদের এই কুটিরের রাণীটি করে রাখি। উত্তরে সে কিছু বলেছিল না, তবে তার কাজল-মাখান আকুল চাউনি নীরব ভাষায় কৃতজ্ঞতার কত উচ্ছ্বাসই না জানিয়েছিল!

তারপর মায়ের আদেশে একটা শুভদিনে শুভলগ্নে আমাদের দু হাত এক হয়ে গেল।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী।

"প্রার্থনা"

হে ভগবান! হে-ভগবান!
নশ্বর জগতে দিওনা আমায়
ধন-রতন-দান
হাতে দাও তুলি চিত্র আঁকিতে,
কণ্ঠে দাও সুর, সঙ্গীত গাহিতে
মুছেনা যার তান।
হারালেও তুলি চিত্র থাকিবে,
নিভিলেও সুর, ধ্বনিত হইবে
মোর সে গান।
হে ভগবান, হে ভগবান!

"শ্রী........"

"শারদীয় জোছনা রজনী"

মহীবুকে পুনঃ এসেছে আজিকে
শারদ জোছনা রজনী,
কৌমুদীকিরণে কি মধুর ওই
সেজেছে প্রকৃতি সজনী।

উঠিয়াছে তব রূপের মাধুরী
বহিছে সুধার ধার।
তারকার দলে গেঁথেছে প্রকৃতি
বিমল কুসুম হার।

থাকিয়া থাকিয়া তরুশিরে কিবা
রজত লহরী ছুটে,
সরসী-সলিলে সুষমা বিকাশি
শতেক নলিনী লুটে।

সরসী-ভবনে সরোজিনী সখা
খেলে কত লুকোচুরি,
আনন্দ আলয় অলির ঝঙ্কারে
সমাকুল সরঃ-পুরী।

শারদ জোছনা রজনি! তোমায়
বাসিয়াছি কত ভালো,
মানস মোহন মুরতি তোমার
করিয়াছে হৃদি আলো।

আমি রূপ সাগরে নীরবে ডুবিয়া
হয়েছি আপন হারা,
চেয়ে আছি সদা তোমারই দিকে
মুছিয়া নয়নধারা।

সেখ মহিয়ুদ্দিন হোসেন

ফুল

—:::—

আমি ফুল ভালবাসি,— সে দেখিতে সুন্দর বলিয়া আমি তাহাকে ভালবাসি নাই, তাহার রূপে মজিয়া আমি তাহাকে ভালবাসি নাই;— তাহার মধ্যে এমন একটা স্বর্গীয় মাধুরী আছে যাহা আমাকে চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় টানিয়া রাখিয়াছে।

তাহাকে সকলে ভালবাসে তাই আমিও ভালবাসি। সে দেবতার পরম আদরের বস্তু, তাহাকে পাইলে দেবতাগণ যতই সন্তুষ্ট হন বোধ হয় জগতের অন্য কোন বস্তুতে তত সন্তুষ্ট নন। মানুষ তাহার হার গলায় পরিয়া থাকে, বাতাস তাহার সুষমা বক্ষে লইয়া আপনাকে ধন্য করে, শাখা প্রশাখা তাহাকে সবুজ পাতায় বেষ্টন করিয়া রাখে, অলিকুল ভক্তিপ্রেমোন্মত্ত শঙ্করের মত সৃষ্টির প্রথম হইতে চরম পর্য্যন্ত তাহার মধুপানে উন্মত্ত।

প্রভাতে সে ফুটিয়া উঠিলে গগন-বিহারী পক্ষিকুল তাহার পানে চাহিয়া মধুর সঙ্গীত ছড়াইয়া থাকে, নিহার-বিন্দু সোহাগ করিয়া তাহার ননীর দেহ ধুইয়া দেয়, শীতল সমীর নিজ কোমল করে তাহার গাত্রে মন্দ-মৃদুল স্পর্শ দিয়া যায়, অলিকুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করিয়া উঠে; সূর্য্যদেব আপন কনক-কিরণ ছড়াইয়া তাহাকে মোহন ভাবে সাজাইয়া দেন।

আবার সন্ধ্যার যখন সে ঝরিয়া যায়, তখন মলয় পবন আকুল-ভাবে হু-হু—করিয়া বহিয়া যায়; তাহার সেই স্পর্শ গাত্র দাহ করে—বোধ হয় যেন সে কতকাল গ্রীষ্মের দেশে বহিতেছিল। তাহার অদর্শনে সন্ধ্যা সুন্দরীর বদন খানি ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া যায়,— যেন তাহার বদন খানিতে কে বিশ্বের সমস্ত কালিমা ঢালিয়া দেয়। তাহার বিরহে প্রকৃতি ক্ষণ কালের জন্য নীরব হইয়া যায়, যেন কতকাল তার বাক্‌শক্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গগনের তারকা-রাজি আকুল প্রাণে উদাস নেত্রে তাহারই পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

এইরূপ বিশ্বের সকলেই তাহাকে ভালবাসে,— শুধু যে ভালবাসে এমন নয়;— তার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখ।

আমিও তাহাকে ভালবাসিয়া থাকি। তবে আমার এ ভালবাসা তামসিক বা রাজসিক নয়,— আমার এ ভালবাসা সাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক।

শ্রী পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

অনুপমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনন্দকিশোর মিত্রের কথা।

বর্ত্তমান জীবনের ইতিহাসটা লিখিতে বসিতে আজ অতীতের কতইনা করুণ কাহিনী আমার স্মৃতি-সমুদ্রে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সেই আমার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যখন আমার পিতা মাতা আমাকে এই সংসারে একাকী ফেলিয়া কোন্ অজানা অচেনা দেশে চলিয়া গেলেন তখন আমার দুঃখে কাহারও চোখে জল ঝরিল না, কাহারও প্রাণে একটি সহানুভূতি জাগিল না। এইরূপ দুঃখে কষ্টে আমার কিছুদিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন আমার পিতার এক মহাজন আদালত হইতে ডিক্রি জারি করিয়া আমার পৈত্রিক বাস্তুবাটি আর পুকুর খানি নিলাম করিয়া আমাকে নির্দ্দয় ভাবে একবস্ত্রে গৃহের বাহির করিয়া দিল। সহায় হীন আশ্রয়হীন হইয়া আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলাম। সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-সংগ্রহ করিতাম, আর সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোন এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি যাপন করিতাম। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলে পর, বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আমার দুঃখের কাহিনী শ্রবন করিয়া এক পরম দয়ালু মহাত্মা আমাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দান করিয়া অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

চিরদিন কাহারও একভাবে যায়না, অথবা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখা নাই, তাই;— কেন কি জানি সেই মহাত্মার — আমার অন্নদাতা আশ্রয়দাতা প্রভুর শেফালিকার ন্যায় কোমল হৃদয় খানি কালের কুটিল চক্রে কঠিন পাষাণে পরিণত হইল, তিনি আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনাদর করিতে লাগিলেন। এমনকি শেষে আমি আবার নিরাশ্রয় হইলাম।

স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিতাম তাঁহারই এই নির্ম্মম আচরণে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এইকি সেই মহাপুরুষ, যিনি একদিন আমাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে মনে কতইনা আনন্দ অনুভব করিতেন! এইকি সেই মহাপুরুষ, যাঁহার হৃদয় একদিন পরের দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত! উঃ! কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন। এ সংসারে ভগবানের লীলা মানব-বুদ্ধির অগোচর। তিনি কখন কাহার মতি গতি কিভাবে পরিচালিত করেন তাহা তিনিই জানেন। আজ যাহার হৃদয় খানি সেফালিকার ন্যায় শুভ্র, কোমল, দুদিন পরে তাহার হৃদয় কঠিন পাষানের মত দৃঢ় শক্ত। আবার আজ যেই নির্ভীক হৃদয়-হীন কাল হয়ত সেই মহান, উদার, ধার্ম্মিক।

আমার পঠদ্দশায় আমি আবার আশ্রয়হীন হইলাম। ধীরেন্দ্রনাথ সেন নামে আমার এক সহধ্যায়ী ছিলেন; একবার তিনি বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি সেই সময় প্রাণপন যত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। যেই সামান্য উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি সর্ব্বদা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। তিনি আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমাকে আপন গৃহে স্থান দিলেন। তাঁহারই সাহায্যে ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মেডিকাল কলেজ হইতে এল, এম, এস, উপাধি গ্রহন করিয়া আমি দুই বৎসর শিয়াল দহ ক্যাম্বেল হাসপাতালে এ্যাসিসট্যান্ট সার্জ্জনের চাকুরি গ্রহন করিলাম। এই দুই বৎসরের মধ্যে যে অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, তদ্দ্বারা এক দরিদ্র গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করিলাম। কিছুদিন পরে আমার একটি পুত্র জন্মিল, তার নাম রাখিলাম সুধীর। ক্রমে আমাদের সংসারে খরচ বাড়িতে লাগিল। আমি তখন বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথের পরামর্শে এই সামান্য ৮০ টাকা বেতনের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কলিকাতায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া ব্যবসা

খুলিলাম। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরিত্যক্ত কয়েকটী কেস আরোগ্য লাভ করাতে আমার যশ অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু ধীরেন্দ্র বাবু বি, এল, পাশ করিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, অল্প দিনের মধ্যে তাঁহারও ওকালতিতে বেশ পশার জমিয়া উঠে। আমার পুত্র জন্মিবার কয়েক মাস পরে তাঁহারও একটি পুত্র জন্মিল, তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিলেন যতীন্দ্র। সুধীর আর যতীন্দ্র একই স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া যথাসময়ে এণ্ট্রান্স পরিক্ষায় পাশ করিল। আমরা তাহাদিগকে একই কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। তাহারা উভয়ে উভয়কে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। এক বৃন্তে ফোটা দুইটী ফুলের মত তাহারা একত্রে অধ্যয়ন করিত, একত্রে ভ্রমণ করিত।

সুধীর জন্মিবার কয়েক বৎসর পরে আমার একটী কন্যা জন্মিল, আমি তার নাম রাখিলাম অনুপমা। অনুপমা তাহার দাদার মত যতীন্দ্রকে খুব ভালবাসিত। যেদিন তাহার যতীন দা তাহাকে পড়া বলিয়া না দিত, সে দিনটা তাহার আদৌ ভাল লাগিত না। যেদিন তাহার যতীন দা একটীবারও না তাহাকে দেখা দিত; সেদিন সে কেবল মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত, পরদিন যখন যতীন্দ্র তাহার সহিত দেখা করিত তখন সে তাহার সহিত কতইনা কলহ করিত। কন্যার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি একদিন ধীরেন্দ্র নাথকে বলিলাম, "শুনেছ ভাই একটা সুখবর, অনুর জন্য আমাকে আর ভাবতে হবে না। আমি তার একটী সুপাত্র যোগাড় করেছি।" "কোথা হে?" "আমার এক বন্ধুর ছেলে, ছেলেটি এ বছর ফার্ষ্ট-আর্টস পরিক্ষায় পাশ করেছে, নাম যতীন্দ্র নাথ সেন।" "হাঁ সত্যই একটা সুখবর বটে!"

এইরূপে সুখ শান্তির মধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেলে পর

সহসা একদিন নির্ম্মম বিধাতার কঠোর বিধানে আমার এই সাজান বাগানে একটা বজ্রপাত হইল। একটি কোমল কুসুম অকালে সে কঠোর আঘাতে বৃন্তচ্যুত হইল — কালের কুটিল হস্ত আমার জীবনের অবলম্বন, বুকের রক্ত সুধীরচন্দ্রকে ছিনিয়া লইয়া গেল। বুকের ধন, নয়নের মণি হারাইয়া পুত্র-শোকাতুরা জননী রোগ-শয্যায় শায়িত হইল। দুইমাস ক্রমাগত ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিয়া আমার পত্নীও প্রাণ ত্যাগ করিল। আমার সাজান বাগান মরুভুমিতে, সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল।

—০:০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লেখক,— শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন।

সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি আমাদের বাগানের পার্শ্বস্থিত আমার পড়ার ঘরে বসিয়াছিলাম, চন্দ্রের রৌপ্য-রশ্মি খোলা জানালার ভিতর দিয়া মেঝের উপর উছলিয়া পড়িতেছিল। মলয় বাতাস লুপ্ত-হওয়া কোন কোমল হস্তের মৃদু স্পর্শের মত অনুভূত হইতেছিল। অলিকুলের গুন গুন শব্দ হারাণ কোন চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরের ন্যায় কর্ণে বাজিতেছিল। সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পুষ্প-সুবাস ভাসিয়া আসিয়া হারাণ-দিনের সুখ-স্মৃতি গুলাকে মনের মাঝে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

হায়! শৈশব-বন্ধু সুধীরের সহিত কতদিনই না এইখানে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ লেখা পড়া করিয়াছি, কিন্তু আজ বিধির বিধানে সে আর আমি কত দূরে। সে আজ মুক্ত পাখির মত কোন অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল। রাখিয়া গেল আমার হৃদয় দগ্ধ করিতে স্মৃতি খানি।

পুরাতন স্মৃতি গুলা মনের মাঝে জাগিয়া আমাকে আকুল করিতে লাগিল। কোন সুদূর অতীতের পরপার হইতে ভাসিয়া আসা একটী সুখের রাগিনী ভালবাসার মূর্চ্ছনা আমার প্রাণটাকে মোচড় দিতে লাগিল।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "নন্দকিশোর বাবু আপনায় ডেকে পাঠিয়েছেন।" আমি তখনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলাম। নন্দকিশোর বাবু তখন তাঁহার মেডিক্যাল হলে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিকট বসিতেই তিনি বলিলেন, "কাল আমরা আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ডেকেছিলুম।" "কতদিনে ফিরবেন?" "এক সপ্তাহের ভিতর। আমাদের অবর্তমানে বাড়ী ঘরটার দিকে লক্ষ্য রেখো।" এই বলিয়া তিনি একখানা সংবাদ-পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পার্শ্বের পর্দ্দাখানি সরাইয়া অনুপমার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। অনুপমা সাদর-আহ্বানের সহিত আমাকে নিকটে বসাইয়া বলিল, —

কালকের আমরা আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছি, এরমধ্যে আপনি আমাদের চিঠি পত্র লিখবেন।

তখন রাত্রি অধিক হইয়া আসিতেছিল, আমি তাহার কথায় সম্মতি জানাইয়া সেদিনকার মত বিদায় হইলাম।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

রত্ন-কণা

যে যাহাই করুক না কেন তুমি নিজে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা কর অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আত্ম নিয়োগ কর। মহাত্মা গান্ধি

কাজই যদি করিতে হয় পুরুষের মত করিও। কথাই যদি বলিতে হয় মানুষের মত বলিও। বুক ফুলাইয়া যদি প্রাণের কথা না বল তবে নীরব থাকিও দণ্ড পুরস্কারকে যদি অগ্রাহ্য না কর তবে কাজে হাত দিওনা। কথায় অকপট হও কার্য্যে অকপট হও। স্বামী স্বরূপানন্দ

শোক দুঃখের মধ্য দিয়া কর্ম্ম করিয়া আত্মার বিকাশের জন্যই আমাদের সৃষ্টি. সুখ সম্পদ ও বিলাসিতার মধ্য দিয়া নহে।

শোক-সংবাদ।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সর্ব্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ৮ যতীন্দ্রনাথ পাল আর ইহ জগতে নাই। গত ২৭শে আশ্বিন মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তান রাখিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের একটী উপাদেয় রত্ন ৮চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় গত ৯ই কার্ত্তিক দেশবাসীকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অধিক সংখ্যক পুস্তক না থাকিলেও তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমর হইয়া থাকিবেন, তাঁহার পুত্র কলত্র নাই বলিয়া আজ আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি।

—:○:—

আলোচনা।

—❋❋❋❋❋❋—

প্লাবনে সোনাগাছি নারী সমিতি — আজ বাঙ্গলার একদিকে শস্য-ভরপুর প্রান্তরের কৃষক গণের আনন্দ ধ্বনি, আর অন্যদিকে দুরন্ত বন্যার হৃত-সর্ব্বস্ব নিস্ব হতভাগ্যগণের আকুল ক্রন্দন! আজ ঘন ঘোর কুয়াসা-চ্ছন্ন রাজনৈতিক-আকাশতলে দাঁড়াইয়া স্বরাজাকাঙ্খী বাঙ্গলার পরীক্ষার দিন পড়িয়াছে! বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া হতাস হইবার কোন কারণ নাই, স্বদেশ সেবকগণ ও বাঙ্গালী মাত্রেই ত কায়িক ও আর্থিক সাহায্য করিতেছেনই; অধিকন্ত সমাজের পতীতা চরিত্রহীনা নারীও আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন বন্যা-পীড়িত দুস্থ বাঙ্গালিদিগের জন্য সহর ছাড়িয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে। প্রচুর বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। যাঁহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্রমতে তাঁহাদের মধ্যে ৩ দলের লোক আছেন। একদল যাঁহারা দুস্থ ভাই ভগ্নিদিগের জন্য সতঃই প্রাণ খুলিয়া দান করিতেছেন। আর একদল ইচ্ছা না থাকিলেও, অপমানের ভয়ে দান করিতেছেন। ৩য় দলের লোক, বাঙ্গলার নারীকেও আজ দুস্থ

দীনের জন্য এত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া দান করিতেছেন। আজ সমাজের এই পতিতা নারীদিগকে দেখিয়া অনেকের কেমন কেমন ঠেকিলেও আজ আমাদের চোখে সত্যই ভাল লাগিয়াছে। আজ এ দৃশ্য দেখিয়া কে বলিবে বাঙ্গলা নির্জ্জিব? কে বলিবে বাঙ্গলা পর মুখাপেক্ষী? আজ কি কবির কথা "না জাগিলে আর ভারত-ললনা; এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।" সফল হইতে চলিল?

জাতীয় শিক্ষা,— মাতৃ ভাষার উপর যে শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হইল সে শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ! নিজের ভিটা ছাড়িয়া পরের ভিটার উপর ইমারত নির্ম্মান করা সমানরূপ মূর্খতার পরিচয়। রাজনৈতিক আন্দোলন সূত্রে আমরা একথা বলিতেছিনা। আমরা অন্য ভাষা শিক্ষা করাকে বা বিদেশীয় ভাষাকে আদৌ নিন্দা করি না; বরং যাঁহারা জাতীয়ভাবে ও জাতীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা নিজ-মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয় ভাষা ও ভাবের ঘোরে ঘুরিতেছেন তাঁহারা হেয়, ঘৃণ্য ও উপেক্ষিত! আমরা বিদেশীয় ভাষাকে ঘৃণা করিব বলিয়া জাতীয় শিক্ষা চাইনা; আমরা এইসূত্রে জাতীয় শিক্ষা চাই, যাহাতে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়; যাহাতে আমরা মানুষ হই।

শ্রীআদিত্য কুমার বাঁকুড়া।

বিবিধ সংবাদ

উত্তর বঙ্গ প্লাবন — এমন সুদূর ব্যাপী বন্যা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সে করুণ প্রাণঘাতী দৃশ্যের কথা মনে হইলে চোখে জল আসে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সাধনা ছাড়িয়া আজ হতভাগ্যগণের জন্ম দেশের নিকট ভিক্ষাপাত্র লইয়া দণ্ডায়মান। দেশের লোক কি নীরব থাকিবেন?

কারামুক্তি,— দেশহিত ব্রতে আত্মনিবেদিত প্রাণ, সুবক্তা কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র মাইতি মহাশয় বিনাসর্ত্তে কারামুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। পুনরায় দ্বিগুন উৎসাহে তিনি দেশমাতৃকার সেবায় নিযুক্ত হউন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

অক্লান্ত কংগ্রেস কর্ম্মী ও অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুত কুমারনারায়ণ জানা মহাশয় বিনাসর্ত্তে কারামুক্ত হইয়াছেন। ইনি জেলে অনসন ব্রত করিয়া স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আবার তিনি দেশের কাজে মনোনিবেশ করুণ ইহাই আমাদের বাসনা।

মেদিনীপুরের অসহযোগী উকিল শ্রীযুত নারায়ণদাস সরকার মহাশয়ও বিনাসর্ত্তে কারামুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কৃষি,— কুচবিহার সমেত বাঙ্গলায় এবৎসর ১২১৮৯০৮ একর জমিতে পাট আবাদ হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর বাঙ্গলায় পাট চাষ কম।

মেদিনীপুরের জলমগ্ন স্থানগুলি বাদ দিলে, অন্যান্য স্থানে ধানের আবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

সভা সমিতি — আগামী ডিসেম্বরে গয়ায় যে জাতীয় মহাসমিতির ৩৭ তম অধিবেশন বসিবে তাহার নাম "স্বরাজ্য পুরী" তাহাতে দর্শনি ফি ২৫ — ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক গণের পক্ষে ১০ টাকা। এবৎসর বহু লোক সমাগম হইবে। সুবিধার জন্য "গয়া ডাইরেকটরী" প্রকাশিত হইতেছে। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। কংগ্রেসে খাদি-প্রদর্শনীও বসিবে। কিরূপ অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট খাদি প্রস্তুত হয় তাহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ১৫০০ হাজার সেচ্ছাসেবক আবশ্যক।

কংগ্রেসের সময় গয়ায় "জাতীয় শিক্ষা সমিতি" নামে জাতীয় শিক্ষার একটী কনফারেন্স বসিবে।

কংগ্রেস অধিবেশন কালে গয়ায় 'নিখিল ভারতীয় হিন্দুসভা, ও 'ভারতীয় গো সেবা মহামণ্ডলের, এক অধিবেশন হইবে। ঐকালে নিখিল ভারতীয় সংবাদ পত্র সেবক সম্মিলনীও বসিবার কথা আছে।

আগামী বড়দিনের বন্দে কলিকাতা গড়ের মাঠে একটী বৃহৎ শিল্প-প্রদর্শনী বসিবে।

নিখিল ভারতীয় খ্রীষ্টান কনফারেন্সের নবম অধিবেশন লক্ষ্ণৌয়ে বসিবে। সভাপতি ডাঃ এস, কে, দত্ত, বিএ, এম, বি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্যাগ— আজ যাট বৎস বয়সেও আচার্য্য দেব-প্লাবিত উত্তর বঙ্গে যুবকের ন্যায় উদ্যমে কার্য্য করিয়া ত্যাগ ধর্ম্মের জলন্ত আদর্শ দেখাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি পালিত রসায়ণ শাস্ত্রাধ্যাপকের বেতন মাসিক ১০০০ টাকা ত্যাগ করিয়া বিনা বেতনে ৫ বৎসর বিজ্ঞান কলেজের সেবা করিবেন। এরূপ ত্যাগ কয়জন দেখাইতে পারেন ?

সম্পাদকীয়

যে মঙ্গল ময় বিশ্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছায় এ শুভ কর্ম্মের প্রেরণা, আমরা সর্ব্বাগ্রেই তাঁহারি শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি। যাঁহাদের সৌজন্যে, যাঁহাদের উৎসাহে, আমরা আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তজ্জন্য আমাদের এ অভিযান হাস্য ব্যঞ্জক বা উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহার প্রেরণায় আজ আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও সুবৃহৎ কার্য্য সম্পাদনে প্রয়াসী, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময়। তাই আমরা আমাদের দুর্ব্বলতার ও অমঙ্গল চিন্তায় উপেক্ষা করিতেছি।

যেদেশে ভাষার-আসরে, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী প্রমুখ মাসিক সাহিত্য সে আসরে শোভনার জন্য এতটুকু স্থান আশা করা নিতান্ত বাতুলতার পরিচয়। নাটকে নায়ক নায়িকা ছাড়িয়া যেমন প্রহসন না দিলে শ্রোতার মনোরঞ্জন হয়না কিম্বা আহার কালে অম্ল ভক্ষণ না করিলে যেমন মুখ-রোচক হয়না; সেরূপ ভাষার রঙ্গমঞ্চে প্রহসনের কার্য্য এবং ভাষা-রস আ-স্বাদনের সময় অম্লের কার্য্য যে আমরা করিতে পারিব তাহা বলিতে পারি।

হে সহৃদয় পাঠক পাঠিকা মণ্ডলি! হে অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ! আজ আমাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা বলিয়া একবিন্দু দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ নূতন,—আমাদের সহকর্ম্মী লেখকগণ অনেকেই নূতন, মুদ্রাযন্ত্র নূতন, মুদ্রাকর নূতন, আমাদের পুরাতন বলিতে কিছুই নাই।

কুপুত্র হইলেও মাতৃ পূজায় সমান অধিকার, তাই আমরা অজ্ঞ হইয়াও মাতৃ-পূজার এ অভিযানে চলিয়াছি। মার সাধকগণ নিয়তই রক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত শতদলে পূজা করিলেও আমাদের কীট-দষ্ট নগন্য বনবেলাটিকে মা কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

"শোভনার নিয়ম"

শোভনার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা তিন আনা। শোভনা প্রতি মাসের শেষে বাহির হয়, কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধানের পর জানাইলে, তাহার বিধান করা হয় অন্যথা নগদ মূল্যে সেই সংখ্যা লইতে হয়।

সকল লেখকের লেখাই সাদরে গৃহীত হইবে। রচনা কাগজের একপার্শ্বে পরিস্কার রূপে লেখা চাই। রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয় না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পৃষ্ঠা	...	৫৲
ঐ অর্দ্ধ ,,	...	২৷৷০
ঐ সিকি ,,	...	১৷৷০
কভার ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা		৭৲
ঐ অর্দ্ধ ,,		৪৲

অপরাপর বিষয় পত্র লিখিয়া অবগত হউন।

টাকা কড়ি চিঠিপত্র নিম্নের ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া
নরসিংহপুর শোভনা-কার্য্যালয়
নন্দিগ্রাম, মেদিনীপুর।

তুমি।

তুমি সুন্দর যেন সন্ধ্যার শান্ত গগন-তারা।
তুমি মধুর যেন মৃদুল মন্দ মূর্চ্ছনা-ধারা॥
তুমি ললিত যেন কোকিল-কণ্ঠে কাকলি তান।
তুমি তরল যেন মনগলান মোহন গান॥
তুমি চিকন যেন উষার উষ্ণ লোহিত রাগ।
তুমি শোভন যেন সোনালী মেঘে বিজলী-দাগ॥
তুমি উজ্জ্বল যেন কজ্জ্বল কোন কিশোরী-চক্ষে।
তুমি চঞ্চল যেন তরঙ্গরাজি তটিনী-বক্ষে॥
তুমি উদাস যেন পরাণ মন পাগল করা।
তুমি দয়াল যেন আতপ-তাপে বরষা-ধারা॥
তুমি সরল যেন উলঙ্গ কোন শিশুর প্রাণ।
তুমি কোমল যেন মদন-করে কুসুম-বান॥
তুমি সুধীর যেন মূর্চ্ছিত বিশ্বে নিশীথ সুপ্ত।
তুমি অমল যেন গোধূলি শান্ত, প্রভাত দীপ্ত॥
তুমি অঙ্কিত যেন তুলিত লতা-পাতায় পুষ্পে।
তুমি রাজিত যেন স্পন্দিত বায়ে জীবন রূপে॥

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

বেদ ও বেদান্তের উৎপত্তি।
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেদের উদ্ভব যে পরমাত্মা হইতে হইয়াছে স্বয়ং বেদই তাহার প্রমাণ। যথা ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের নবম মন্ত্র "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত॥" সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ ও সাম-বেদ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহা হইতে ছন্দঃ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল। অন্যান্য বেদেও এ বিষয় এই প্রকারে সমাম্নাত হইয়াছে। পরমাত্মা হইতে বেদের উদ্ভব সম্বন্ধে কয়েকটী বিপ্রতিপত্তি আছে। উহা এই স্থলে উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য সমাধান করার চেষ্টা করিব। শতপথব্রাহ্মণে সমাম্নাত হইয়াছে যে — "তেভ্যস্তপ্তেভ্য স্ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত অগ্নে ঋগ্বেদো বায়ো যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ।" তপ্ত অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য হইতে এই তিন বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। মনু স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে — "অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং। দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থং ঋক্ যজুঃ সামলক্ষণং॥" যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মা অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ দোহন করিয়া ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।" ইত্যাদি পরমাত্মা সংকল্প দ্বারা আদি কবি ব্রহ্মাকে বেদ জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন। এখানে ঋগ্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শতপথ ব্রাহ্মণ ও মনু-বচনের বিরোধ হইল। এই বিরোধ আপাততঃমাত্র, প্রকৃত পক্ষে নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতির এবং স্মৃতি পুরাণের বিরোধে স্মৃতির প্রামাণ্য হয়। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন বিরোধ হয় নাই। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের সঙ্গতি আছে, কেবল বর্ণনার প্রণালী পৃথক্ হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। ঋগাদি বেদ চতুষ্টয় পরমাত্মা হইতে উদ্ভব হইয়াছে এই কথা পুরুষসূক্তে আম্নাত হইয়াছে। অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতে ঋগাদি বেদত্রয়ের উৎপত্তি শতপথ ব্রাহ্মণ ও মনু স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ একেবারেই উক্ত হয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে বিগ্রহধারী ব্রহ্মা হইতে যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থ ঋগাদি বেদত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ যজ্ঞে আবশ্যক হয়না বলিয়া উহা উক্ত হয় নাই। পরমাত্মা সংকল্প দ্বারা ব্রহ্মাকে বেদ জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা যখন লোকশিক্ষার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিলেন তখন কোন প্রযত্নে ও কোন শারিরীক ধাতুর সংক্ষোভে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইল ইহাই শতপথ ব্রাহ্মণ ও মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের কোন বিরোধ হইল না। এসম্বন্ধে পূজ্য অধ্যাপক ৺ ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

ব্রহ্মার শরীর মধ্যে অগ্নি, বায়ু ও রবি এই ত্রিধাতু আছে। তন্মধ্যে যখন অগ্নি ধাতুকে সংধুক্ষিত করিলেন তখন ঋঙ্মন্ত্র সকল বাহির হইল। ইহার ভাবার্থ অনুভব করিয়া দেখিলে প্রকাশ পাইবে। অন্যথা সাধ্য কি যে লিখিয়া দেখাই। যাঁহারা ছন্দোবদ্ধ ঋঙ্মন্ত্র সকল সর্ব্বদা অধ্যয়ন করেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাঁহাদের ঋঙ্মন্ত্র সকল পাঠে মস্তিষ্কেও আঘাত লাগেনা, প্রাণবায়ুতেও আঘাত লাগেনা কেবল জঠোরাগ্নি উদ্দীপিত হয় কিনা। সুতরাং এখনও ঋগ্বেদের প্রকাশ অগ্নি (জঠরাগ্নি) হইতেই হইতেছে। যজুর্ব্বেদের উচ্চারণ ভয়ানক কঠিন। উচ্চারণ করিতে করিতে হাঁপ লাগে। অর্থাৎ দেহের সকল বায়ু (বিশেষ প্রাণবায়ু) উদ্দীপিত না হইলে যজুর্মন্ত্র-সকল উচ্চারিত হয়না ইহা স্থির। সুতরাং এখন যজুর্মন্ত্রসকল বায়ু-দেবতা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

সামমন্ত্র সকলের উচ্চারণ যজুর্ব্বেদবৎ কঠিন না হউক কিন্তু স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা তান লয়াদি এত দীর্ঘ যে তদ্দ্বারা মস্তিষ্ক সবলে প্রতিঘাতিত বা আঘাতিত হয়। মস্তিষ্কই সূর্য্যের স্থান বা সূর্য্য। সুতরাং সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি এখনও হইতেছে।

বেদের উৎপত্তি ও তৎপ্রসঙ্গে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব।

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। যাহার আদি নাই তাহাই অনাদি; ইহাই "অনাদি" শব্দের অর্থ। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যদি অনাদি হয় তাহাহইলে ইহার জন্ম কিরূপে সম্ভব? প্রবন্ধের শীর্ষ-দেশে আমি কেন "বেদের উৎপত্তি" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, এবং ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তাহা উল্লেখ করিব। "অপৌরুষেয়" শব্দের অর্থে সাধারণতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, যাহা পুরুষ বা মানব কর্তৃক প্রস্তুত হয় নাই। যাহা মানবে কল্পনা-প্রসূত নহে অর্থাৎ যাহা পরমেশ্বরের প্রণীত তাহাই অপৌরুষেয়। বেদ এইজন্য অনাদি ও অপৌরুষেয়। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে যেরূপ বিচার আছে, আমি তাহার উল্লেখ করিব না। কারণ ঐ সকল শাস্ত্র না পড়িলে তাহার সম্যক্ জ্ঞান হইবে না। সাধারণ বুদ্ধির গ্রাহ্য যে সকল প্রমাণ আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ বেদ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং উহা অপৌরুষেয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুরুষকৃত গ্রন্থাদির কর্ত্তা আছে যথা বেদান্তদর্শনের কর্ত্তা মহর্ষিব্যাস, মীমাংসার মহর্ষি জৈমিনি, মহাভাষ্যের মহর্ষি পতঞ্জলি ইত্যাদি। সেইরূপ যদি বেদের কর্ত্তা কোন পুরুষ হইতেন তাহাহইলে অবশ্য তাহার প্রসিদ্ধি থাকিত। কিন্তু তাহাত নাই সুতরাং বেদ পুরুষকৃত নহে।

দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ও লৌকিক বাক্যের লক্ষণ দ্বারা বেদ যে পুরুষকৃত নহে তাহা সহজে ধারণা হইবে। লৌকিক বাক্যের প্রয়োজন পূর্ব্বকত্ব নাই এবং উহা ভ্রমপ্রমাদ যুক্ত। বৈদিক বাক্যের প্রয়োজন-পূর্ব্বকত্ব নাই এবং উহা ভ্রমপ্রমাদ রহিত। প্রয়োজন পূর্ব্বকত্বের অর্থ এই যে অগ্রে বক্তার বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে। পরে

তবেই দুগ্ধ আন এই বাক্য আমি প্রয়োগ করিব। যদি আমার দুগ্ধ পানের প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে দুগ্ধ আন এই বাক্য আমি প্রয়োগ করিব না। এইরূপ প্রয়োজন হইলে লৌকিক বাক্য প্রয়োগ হইবে। অপ্রয়োজন প্রযুক্ত হইবেনা প্রায় সমুদায় লৌকিক বাক্যই এই প্রকার। কিন্তু বৈদিক বাক্য এই প্রকার নহে। উহা প্রয়োগের পূর্ব্বে বক্তার কোন প্রয়োজন হয় নাই। বেদ পাঠ করিলে জানা যায় যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগে বক্তার পূর্ব্বে কোন প্রয়োজন হয় নাই। লোকের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত উহা স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন "স্বর্গকামোযজেত"। যে ব্যক্তি স্বর্গ গমন করিতে ইচ্ছা করে সে যজ্ঞ করুক। এই বাক্য প্রয়োগে বক্তার পূর্ব্বে কোন প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু লোকের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত উহা স্বতঃই প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্য ভ্রমপ্রমাদদুষ্ট অর্থাৎ সন্দিগ্ধ ও অনিশ্চিত। যেমন আমি যদি কোন ব্যক্তিকে বলি আমাকে একটী নারিকেল দাও এবং তিনি বলেন, তুমি নদীতীরে যাও তথা নারিকেল পাইবে। আমি তাহার বাক্য প্রমান নদীতীরে যাইয়া যদি তথায় নারিকেল বৃক্ষ থাকে, তাহা হইলে উহা দেখিতে পাইব অন্যথা নহে। আবার নারিকেল বৃক্ষ দেখিতে পাইলেও হইবে না। যদি সে বৃক্ষে ফল না থাকে তাহাহইলে ঐ বাক্য ব্যর্থ হইবে এবং উহা ভ্রমপ্রমাদদুষ্ট হইবে। কিন্তু বৈদিক বাক্যে এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। উহা অসন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত। বেদবিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া মুনিঋষিগন ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যে মন্ত্রের যে ফল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তৎপরে শৌচব্রতধারী ব্রাহ্মণপরম্পরা বেদবিহিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিয়া ফল পাইয়াছেন এবং অনেক জ্যোতির্দণ্ড প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব বেদের অনুবাদ যে স্মৃতি পুরাণ তাহার ফলও অসন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত। অপুত্রক ব্যক্তি হরিবংশ পারায়ণ করাইয়া পুত্রলাভ করিয়াছেন, ইহা বোধহয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদতীর্থ।

অনুপমা ।

৩য় পরিচ্ছেদ

লেখিকা,— কুমারী অনুপমা মিত্র।

সেদিন রাত্রিটা ছিল চাঁদিনী। পুণ্যের মোহন একটা দৃশ্য বুকে করিয়া গঙ্গা সাগর কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত হইতেছিল। বীচিমালার কলধ্বনি, নাবিকগণের শ্যামা-সঙ্গীত কর্ণ কুহরে মধুর মূর্চ্ছনা ঢালিতে-ছিল। সান্ধ্যগগন উদ্ভাসিত করিয়া জ্যোৎস্না ধারা তটিনিবক্ষে উছলিয়া পড়িতেছিল। অসংখ্য তারকাখচিত সুনিল গগন খানি নদী-বক্ষে বিম্বিত হইতেছিল। দূরে— বহুদূরে— যতদূর দৃষ্টি যাইতেছিল, কেবল নীল আভা যুক্ত রূপালী জ্যোৎস্নার বিকাশ। কেবল তীরের বৃক্ষরাজির মধ্যে কোথাও কোথাও অন্ধকার ঘনাইয়া থাকিতে দেখা যাইতেছিল।

নদীবক্ষে ছোট বড় দুই একটি নৌকা পালভরে চলিতেছিল। সেইসঙ্গে আমার পিতার বজরাখানিও তরঙ্গাঘাতে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। আমরা একখানি বজরা ভাড়া করিয়া দাস দাসী সমভিব্যাহারে আমাদের এক আত্মিয়ের বাটিতে যাইতেছিলাম। আমি ও আমার পিতা বজরার ছাদে বসিয়াছিলাম। বাবা আপন মনে গুন গুন করিয়া একটা গান গাহিতেছিলেন; আর আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া উর্ম্মিমালার খেলা দেখিতেছিলাম। সহসা একটা দমকা বাতাস লাগিয়া আমাদের বজরাখানি একটু কাৎ হইয়া পড়িল। আপন অসাবধানতার ফলে আমি নদীতে পড়িয়া গেলাম। আমার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাবা আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! ওগো কে পার আমার অনুকে বাঁচাও।"

আমাদের বজরার পশ্চাতে একখানি ছোট নৌকা আসিতেছিল, আমার মনে হইল সেই নৌকা হইতে কে যেন নদীতে ঝাঁপ দিল।

সেইসঙ্গে আমাদের বজরার দাঁড়ি মাঝিগণও একে একে "হায় হায়!" করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল। তরঙ্গমালার প্রবল আঘাতে আমি অনেক দূর ভাসিয়া গিয়াছিলাম, আমার চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল; ক্ষণ-কাল পরে আমি কেবল মাত্র অনুভব করিলাম কে যেন আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত সাঁতার দিতেছে। তাহার পর আমার আর কিছুই মনে নাই।

সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে দেখিলাম আমি আমাদের বজরার একপার্শ্বে শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছি, বাবা আমার মাথার নিকট বসিয়া আমার গাত্রে আগুনের তাপ দিতেছেন, একজন ভৃত্য ও মাঝিমাল্লাগণ শুষ্কমুখে আদেশের অপেক্ষায় নিকটে দাঁড়াইয়া আছে; আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কে এক যুবক পলক-হীন নেত্রে আমার পানে তাকাইয়া আছে। দেখিলাম, যুবকের গঠন সুন্দর নিটোল, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, বসন আর্দ্র সিক্ত। তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে একটা স্বর্গীয় জ্যোতি উছলিয়া পড়িতেছিল। বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলাম — কে এই যুবক? কিছুই মনে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তারপর ধীরে ধীরে মনে হইতে লাগিল আমার নদীতে পতনের অব্যবহিত পরেই কে এক ব্যক্তি অপর এক নৌকা হইতে আমার উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, বোধ হয় ইনিই সেই ব্যক্তি। যাহা হউক আমাকে আর অধিক ভাবিতে হইল না,— বাবা সহসা বলিয়া উঠিলেন,

মহাশয় আপনি কাপড় ছাড়ুন। আজ আপনি আমার একমাত্র কন্যার জীবন রক্ষা করে আমাকে আপনার কাছে আমরণ ঋণী করে রাখলেন। আপনারই কৃপায় আজ আমার অনুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। আপনার এ উপকারের কথা আমি কখনও বিস্মৃত হব না।

মৃদু-মধুর বচনে যুবক প্রত্যুত্তর করিল,—

আপনি নিজগুণেই আমার প্রতি অতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন,

আমি আপনার এমন বিশেষ কিছু উপকার করি নাই, যাতে আপনি আমার নিকট আমরণ ঋণী হয়ে থাকবেন । পরের বিপদে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সাহায্য করা কর্ত্তব্য । এটা আমারও কর্ত্তব্য; তাই কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য করে আমি আপনার কন্যার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেছিলুম । এখন আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে যিনি আপনার কন্যার রক্ষার জন্য আমাকে এখানে উপস্থিত করেছেন, তাঁকেই ধন্যবাদ প্রদান করুন । সেই করুণাময়, মঙ্গলময়ই আপনার কন্যার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র । আপনি আমার প্রতি অনর্থক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেই পরম-পিতার অবমাননা করবেন না ।

যুবকের কথা শুনিয়া বাবা উত্তর করিলেন,— আপনি মানুষ না দেবতা ?

আমিও এই যুবকের অদ্ভুত মহত্ব দর্শনে পুলকিত হইলাম । এত বড় স্বার্থত্যাগ, এত বড় মহানুভবতা, আমি আর জীবনে কখনও দেখি নাই । পরের মঙ্গলের জন্য এ সংসারে মানুষ যে হাস্যমুখে নিজ জীবনকে বিপদাপন্ন করিতে পারে তাহা আজ প্রথম দেখিলাম । নিজ অমূল্য জীবনকে অকাতরে অসংখ্য জলজন্তুর মধ্যে ও পর্ব্বতপ্রমাণ উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার অসাড় দেহে প্রাণের একটা চিহ্ন দেখিয়া আশ্বস্ত হইবার আশায় পলকহীন নয়নে আমার পানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার প্রতি আমার মন যুগপৎ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল । মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা করিয়া এই মহাত্মা আমাকে ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, সেই জীবন ইহাঁর পায়ে উৎসর্গ করিয়া এই ঋণ-পাশ হইতে মুক্ত হইব । ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলাম,— প্রভু ! আমার মনে বল দাও, হৃদয়ে শক্তি দাও, যেন এই দেবতার ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইতে পারি ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রী অনিল কুমার রায়ের কথা।

আমি কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি,এ, পড়িতাম। কোন সহধ্যায়ী বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে যাইবার জন্য নৌকাপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি। নির্ম্মল গগণ ও অনুকূল সমীরণ পাইয়া আমরা নৌকা খুলিয়া দিলাম। আমাদের অগ্রে পশ্চাতে ছোট বড় দুই একটী নৌকাও যাইতেছিল। সেইসঙ্গে একখানি বজরাও আমাদের নৌকার অনতিদূরে যাইতেছিল। চন্দ্রালোকে দেখিলাম, বজরার ছাদের উপর বসিয়া একজন পুরুষ ও একটী বালিকা, পুরুষের বয়স অনুমান যষ্ঠি বর্ষের অধিক, আর বালিকাটী একাদশ কি দ্বাদশ, বর্ষীয়া হইবে। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি অঙ্গের উপর পড়িয়াছে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক তাহার অঙ্গে বিহিত হইয়া তাহাকে চিত্রিত আলেখ্যের মত দেখাইতেছিল।

আমি নিস্পলক দৃষ্টিতে বালিকার কমনীয় বদনখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। আ মরি মরি কি সুন্দর পবিত্র বদনপ্রভা। যেন স্বর্গের পরী নারী মূর্ত্তিতে ভূতলে আসীনা। কতক্ষণ মুগ্ধের মত অন্যমনকভাবে সেই দিকে চাহিয়া ছিলাম জানিনা, সহসা সেই বজরাস্থিত ব্যক্তির চীৎকারে চমকিত হইয়া দেখিলাম, বালিকা নদীতে পড়িয়া গিয়াছে কালবিলম্ব না করিয়া আমি নদীতে ঝাঁপ দিলাম। বালিকা তরঙ্গ আবর্ত্তে অনেকদূর ভাসিয়া গিয়াছিল, বহুক্ষণ সাঁতার দিয়া তাহাকে পাইলাম;— বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া অতিকষ্টে সেই বজরার নিকট আসিলাম। একজন দাঁড়ি একটা দড়ি ফেলিয়া দিল, তাহার সাহায্যে বজরায় উঠিলাম। একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

বালিকার পিতা — পূর্ব্ববর্ণিত ব্যক্তি আমার কৃত তাঁহার এই সামান্য উপকারের জন্য আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের সহিত

আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এতদিন আমার দ্বারা জগতের একটী ক্ষুদ্র প্রাণীরও একটু উপকার সাধিত হয় নাই। আমি যে কাহারও চোখের জল মুছিতে পারিব এবং আমার দ্বারা সংসারের যে উপকার সাধিত হইবে ইহাও আমি কখনও ভাবি নাই। তাই আজ একটী বালিকার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছি ভাবিয়া মনে একটা আনন্দ অনুভব করিলাম ও যেই বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য আমাকে উপলক্ষ করিয়া এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাঁহার পায়ে অসংখ্য প্রণাম করিতে লাগিলাম।

সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলাম, বালিকার পিতার নাম নন্দ কিশোর মিত্র, ইনি কলিকাতার একজন ডাক্তার; কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি যাইতেছেন। আরও অবগত হইলাম কিছুদিন পূর্ব্বে, তাঁহার পুত্র ও পত্নী তাঁহার বুকে শেল বিদ্ধ করিয়া চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন তাঁহার এই কন্যাটীই একমাত্র অবলম্বন।

নন্দকিশোর বাবুর সরল, সদয় এবং অকপট ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে আমাকে সে রাত্রি তাঁহাদের বজরায় অবস্থান করিতে হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাদের এত আত্মীয় ও স্নেহের পাত্রে পরিণত হইলাম যে সারাজীবন একব্যক্তি অন্যের সহবাসে তাহার এতটা স্নেহের পাত্রে পরিণত হইতে পারে না। নন্দবাবুর অকৃত্রিম ব্যবহারে আমি মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার কন্যা অনুপমাও পিতার অনুরূপ ব্যবহারের ত্রুটি করে নাই। সে আমাকে প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটী নীরব ভাষায় কৃতজ্ঞতার কতই না উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করিয়া ছিল।

তাঁহাদের যত্ন ও আদরের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া কোন্ দিক দিয়া যে সে রাত্রিটা চলিয়া গেল তাহা আমি ধারণা করিতে পারি নাই। পর-দিন নন্দ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া, অনুপমার নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় সে ধীরে ধীরে আমার পার্শ্বে

আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে জিজ্ঞাসা করিল,—"বন্ধুর বাড়ি থেকে কতদিনে কলকাতায় ফিরবেন?"

"সপ্তাহখানিকের ভিতর ফিরবো। ফিরলে কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা কোরব।"

"আপনার বন্ধুর প্রীতিমাখান মুখখানি, আর আদর যত্ন আমাদের আড়াল করে রাখবে না ত?"

"না অনু, আমি এমন অকৃতজ্ঞ নই যে তোমাদের এত শীঘ্র ভুলে যাব। সত্যই বলছি তোমাদের এই এক দিনের আদর যত্নে আমি যেন আত্মীয়ের মত হয়ে পড়েছি। এখন তোমাদের কাছে বিদায় চাইতে সত্যই আমার কষ্ট হচ্ছে।

আমার কথা শুনিয়া অনুপমার চক্ষু দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল, সে নিতান্ত কিষ্টস্বরে বলিল,—"এমন সুদিন কি আমার কখনও হবে; যেদিন আমি আপনার এই ঋণ হতে—

তাহার অসমাপ্ত বাক্যের উপর আমি বলিলাম,—"আসি তবে অনু?

কথা কয়টী বলিতে বলিতে আমার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিতেছিল, যথাসম্ভব আত্মভাব গোপন করিয়া আমি সেস্থান ত্যাগ করিয়া নিজের নৌকায় আসিয়া বসিলাম। হৃদয়ের ভার লঘু করিবার জন্য অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু মন কিছুতেই সুস্থির হইল না। কুলহারা সুনীল বারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গি, রবি-করোজ্জ্বল সলিল রাশির মধুর দৃশ্য, তীরের বৃক্ষরাজি কিছুই ভাল লাগিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাদের নৌকা ঘাটে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে আমার বন্ধু অভ্যর্থনার জন্য সেখানে একজন লোক পাঠাইয়া ছিলেন। আমি নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেই সে ব্যক্তি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল পায়ে হাঁটিয়া বন্ধুর ভবনে উপস্থিত হইলাম।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেই দিবসের কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমার দিনলিপি খানি খুলিতেই কি একটা উজ্জ্বল

জিনিষ আমার নয়ন পথে পতিত হইল। দেখিলাম সেটা একটা গোলাপী রঙের রুমাল, তাহাতে নীল সূতায় একটী সুন্দর কবিতা লেখা আছে।

তুমি ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিয়ো,
আমি অলির মতন গাহিব গান।
তুমি চাঁদের মতন জোছনা ঢালিয়ো,
আমি চকোর মতন করিব পান।
তুমি বসন্ত মতন জীবনে আসিয়ো,
আমি পাপিয়া মতন তুলিব তান।
তুমি অনল মতন জ্বলিয়া উঠিয়ে,
আমি পতঙ্গ মতন ত্যজিব প্রাণ।

গুনমুগ্ধা অনু।

এই ক্ষুদ্র কবিতা খানি পাইয়া আমার হৃদয় উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে নাচিয়া উঠিল। ঘন ঘন বক্ষবেপন হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। দুকুল ভাসাইয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি বার বার কবিতাটী পড়িতে লাগিলাম। এ কি! আমি স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই, কল্পনাতেও যাহার অস্তিত্ব গঠন করিতে পারি নাই, তাহা কি সত্যেই পরিনত হইল!

বন্ধুর ভবনে প্রায় সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। মেশে পৌঁছিয়া অগ্রে চিঠির ঘরে অনুসন্ধান করায় এক খানি পত্র পাইলাম। লেপাফা খানা ছিঁড়িয়া দেখিলাম,— মা শীঘ্র বাড়ী যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। অনেক দিন অবধি গৃহছাড়া হওয়ায় আমার মনও নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়েছিল, আমি গৃহগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

স্বর্গীয় কবি-প্রতি।

প্রতিভা প্রদীপ্ত নয়নে তোমার বিমল আলোক-রাশি,
এসেছিলে তুমি রবির মতন মুখে নিয়ে মৃদু হাসি।
গেছ কি আলোকে উদ্ভাসিয়া দেশ, কি উজ্জল তাঁর বিভা;
ত্যজিয়া অলস আজীবন তুমি করেছ সাহিত্য-সেবা।
গুরু রাজ-কার্য্যে ধন উপার্জ্জনে থেকেও ভুলনি দেশ,
দিয়েছ বঙ্গ বাণীর চরণে কিবা অর্ঘ হে গুণেশ!
ভীষ্ম, দুর্গাদাস, মেবার পতন, প্রভৃতি নাট্যে কি ছবি।
তোমার মুরতি জাগে নিশি দিন হৃদি মাঝে প্রিয় কবি।
কতকাল আজ গিয়াছে চলিয়া তোমার সে সুর-গীতি —
দেশ-বাসী-হৃদি আজিও ধ্বনিছে, জাগাইছে তব স্মৃতি।
সাধনায় ছিলে যেন তুমি যোগী, প্রণয়ে প্রেমিক বঁধু।
তোমার ভাষায় সংযম, সাধনা, তোমার ভাষায় মধু।
তোমার ভাষায় তূর্য্যনিনাদ, বাঁশরির স্বর ঢালা,
হাসির তুফান, ভাবের গাম্ভীর্য্য, প্রেমের তরঙ্গলীলা।
কি আর বলিব হে দ্বিজেন্দ্র লাল! তব কথা মনে হলে,
ঝরে আঁখিবারি, বঙ্গ-কাব্য-কুঞ্জে মধুকণ্ঠ পিক ছিলে।
নীলাকাশ ভেদি ঊর্দ্ধে, অমরের সেই সে বিহার ভূমি
নন্দন-কাননে বিহরিছ কিগো ফুলে ফুল যথা চুমি?
যথা চির শান্তি, সদা বাজে বীণা, সিন্ধু ঝরণা ঝরে,
মলয় পবন কবিত্ব সৌরভে ভরপুর হৃদি করে।
বীণার স্বরে কি কণ্ঠস্বর সুধা ছড়াইছ গিয়া তথা?
কিম্বা কি গাহিছ দেবতার দেশে এদেশের স্মৃতি গাথা?
যথা রও তুমি, তব শুভ কবি! চাই মোরা বিভু পাশে,
যেন পাই তব সুখ সম্মিলন জন্মে জন্মে ভবাবেশে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

জড়োপাসনা ।

বর্ত্তমান জড়োপাসকগণের নীতিহীন ধনোন্নতি-লিপ্সা আজ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসির সরল পল্লীজীবনে যে বিশ্বাসশূন্য অসাড়তা আনায়ন করিয়াছে, তাহার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। নীতিশূন্য সর্ব্বতোমুখী পার্থিব আকাঙ্খাই তাহাদের এই জড়োপাসনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক! নানা যুক্তি তর্কের বিষম বাগাড়ম্বরে বা কর্ম্মের কঠোর হৃদয়শূন্য অত্যাচারে তাহারা তাহাদের জড়োপাসনা প্রচার করিলেও, তাহারা যে সময়াসময়ে সন্দেহাকুল বা আত্মধিকৃত হয় না, এরূপ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা। জগতে দুঃখদৈন্যের নির্ম্মম শাসন ও বিস্তৃত আধিপত্য দেখিয়া তাহারা ধর্ম্মবিশ্বাসহীন হয় ও নীতিপথ পরিত্যাগ করে। এই কারণেই, বোধ হয়, জগতের ধনকুবের আমেরিকাবাসি রকফেলার ধনার্জ্জনে কোনরূপ নীতিবিচার করেন নাই। ইন্দ্রিয়াভিভূত হইয়া ভগবানের অঙ্গুলিসঙ্কেত বিবেকবাণী শুনিতে পান নাই; তাই হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রদর্শিত পথে আনন্দে বিচরণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

* * * * *

প্রতীচ্য আজ বিগত ধর্ম্মময় সভ্যতার দিকে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে,— চাকচিক্যময় পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে ভারতের লোক যেন সদাই ব্যস্ত;— তাহারা মৃণাল তুলিতে গিয়া কণ্টকবেষ্টিত হইয়া পড়িতেছে। আজ তাহারা সনাতন শাশ্বত ধর্ম্মের প্রাথমিক উপদেশগুলি বিস্মৃত হইয়াছে,— বিশ্ববিশ্রুত ভগবদগীতার চিরাদৃত বাণীকে হৃদয়-মন্দির হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। আজ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে ধর্ম্মের তিরোভাবে জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়; তাই সৃষ্টিরক্ষক ভগবান ধর্ম্মের গ্লানি হইতে জগতকে রক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

* * * * *

হে অবিশ্বাসী হতবিশ্বাসী ভারতবাসীগণ! ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থের সুবর্ণ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া একদেশদর্শী ইন্দ্রিয়ের মুগ্ধ গণ্ডি ত্যাগ করিয়া চিরকল্যানময় ভগবানের অক্ষয় আনন্দময় রাজ্যের সরল নীতিপথ গ্রহণ কর। হৃদয়ে উপলব্ধি কর যে রিপুকুলাক্রান্ত পার্থিব উন্নতি হইতে চিরানন্দ দূরের কথা — পার্থিব সুখও উদ্ভূত না হইতে পারে; কিন্তু নীতিপথ অবলম্বনে পার্থিব তৃপ্তি ও স্বর্গীয় আনন্দের উপভোগ অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিও যে, অমৃতের পুত্র তোমরা — তোমাদের শক্তিমান আত্মাকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কুহকজাল, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন-মরিচিকা আবদ্ধ রাখিতে পারেনা।

শ্রীগোরাচাঁদ গিরি।

মুগ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[৬]

দু তিন মাস গত হইয়া গিয়াছে। এরি মধ্যে ফুটন্ত কুসুমের লোভনীয় সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য আমি কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, কিন্তু যেখানে কুসুম ছিল, সেখানে কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা গেল, যাঁহারা এখানে ছিলেন তাঁহারা সম্প্রতি কোথায় যাত্রা করিয়াছেন। মন বাটীর দিকে টানিলেও স্বাস্থ্যের জন্য আমি পুনরায় পুরিতে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার মনে একটুকু শান্তি নাই। এবার কুসুমের প্রতি নিতান্ত রাগও হইতে লাগিল; এবং তাহার সৌন্দর্য্যের লোভ যেন আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল তবে কি সে বারনারী সাজিয়াছে?

* * * * * *

যতই তাহাকে কলঙ্ক প্রদান করিয়া ভুলিতে প্রয়াস পাই, ততই

যেন মন তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য আকুল হইয়া উঠে। যতই তাহাকে ঘৃণা করিতে যাই ততই যেন মন আহত হইয়া সমবেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। কুসুমের চিন্তা মনকে এমনই একচেটে করিয়া তুলিল যে অন্য সকল চিন্তা — এমনকি আহারনিদ্রার চিন্তা পর্য্যন্ত ভুলিলাম।

চিন্তার পুষ্টপোষক একটী নির্জ্জন গৃহও আমার অভাব হইল না। সেখানে বসিয়া সব জ্বালা জঞ্জাল ভুলিয়া, বিবাহের জন্য মায়ের শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, একমাত্র কুসুমের চিন্তার স্রোতে তীরের ন্যায় বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম;—কতবার আহত হইলাম তাহার স্থিরতা নাই। সেই চিন্তা যেন আমার ইহজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল।

সেদিন ভারি গ্রীষ্ম। দারুণ গ্রীষ্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, আমি সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়াছি। একটু বাতাসও দিয়াছে; ফেনিল জলধি বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তরঙ্গ ভঙ্গে গর্জ্জিত বুবককেও তীরের উপর আছড়াইয়া ফেলিতেছে। আমি অতি কষ্টে একটা ডুব দিয়া বামপার্শ্বে চক্ষু দুটাকে ফিরাইয়া দিলাম; দেখিতে পাইলাম, যে ফুলটী একদিন কাশীর বিশ্বেশ্বরের পায়ে চন্দন চর্চ্চিত নির্ম্মাল্য রূপে দেখিয়াছিলাম, আজ যেন সে ফুলটীকে অতি যত্নে, নীল বারিধি ফেনিল তরঙ্গ কম্পিত হস্তে, পুরীর জগন্নাথের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। আমি মুগ্ধ নয়নে যখন তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, তখন সে আমায় চিনিয়া লইয়াছে। আরও দেখিলাম সে বৃদ্ধটী কুসুমের সঙ্গ ছাড়েনি! সে মিলনে আমার ধুইয়া গিয়াছিল সমস্ত কালিমা, সমূহ সন্দেহ, আর সকল ভুলিবার কথা। কুসুমের সে চাউনি আমার নিকট অতি পবিত্র অতি নির্দ্দোষ, অতি সরল স্নিগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল; আমি যেন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম।

* * * * * *

কুসুমের সহিত পরিচয় হইয়া গিয়াছে। এখন সকলের পরিচয় পাইয়াছি। বাসা হইতে দু তিনটী বাড়ীর পর কুসুমের বাসা। কুসুমের পরিচয় এই — আমরা গৃহত্যাগী হইবার প্রায় দু এক বৎসরের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাবে

গ্রাম একবারে উজাড় হইয়া যায়। সেই সময়ে কুসুমের পিতা, মাতা,ভ্রাতা সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া মহামারীর আহ্বানে অনুসরণ করে। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্রই; কুসুমের বয়সও তখন বেশ হইয়াছিল। গ্রামে তত-দিন থাকিবার সে অনেক স্থানই পাইয়াছিল, যতদিন না বৃদ্ধ মাতামহ দূর হইতে শুনিয়া নাতিনীর খোঁজে আসিয়াছিলেন। এটী সেই বৃদ্ধ। ইনি কাশীতে মাসিক ষাট টাকা বেতনে একটী চাকুরি করেন। নাতিনীকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন, সেজন্য কাশিতে তাহাকে নিজের বাসায় রাখিয়া ছিলেন। বৃদ্ধের থাইসিস, সেজন্য গ্রীষ্মাবকাশে তাঁহারা পুরি আসিয়াছেন। সুন্দর যুবকটী কুসুমের মামা।

অনেক দিন হইল আমি কুসুমদের বাসায় আসি, সেটা কেবল কুসুমের অনুরোধে নয়; অনেকটা তাহার বৃদ্ধ মাতামহের অনুরোধে। এতদিনের মধ্যে মনে এমন সামর্থ আনিতে পারিনি যাহার দ্বারা কুসুমকে জিজ্ঞাসা করি সে আমাকে ভালবাসে কিনা? বা সে বিবাহ করিয়াছে কিনা? আমি এখন বুড়োকে দাদা মশায় বলে ডাকি এবং তার সহিত আমার ঠাট্টা তামসাও চলে বেশ। একদিন নিতান্ত সংযত হইয়া রহস্যের সময় দাদা মশায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম কুসুমের স্বামী-বাড়িটী কোথায়? দন্তবিহীন দাদামশায় কপালে চোখ তুলিয়া হো হো করিয়া একটা বিরাট অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন "এতদিন জাননি সে যে সোনার পুর গ্রামে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ যে আমাদের গ্রাম, কুসুম তবে কাহাকে বিবাহ করিল? মন ভারি গম্ভীর হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল সেকি আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে না? এমন কথা ভাবিতেও আমি নিতান্ত শুম্ভিত হইয়া গেলাম, শত শত বজ্র যেন গর্জ্জন করিতে করিতে আমার মাথার উপর পড়িল। ধরা যেন পায়ের তল হইতে সরিয়া গেল।

দাদামশায় আমার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন কিনা জানিনা তিনি আমার আবভাব দেখিয়া বলিলেন "তোমার ও ভাবনা কর্ত্তে হবেনা দাদা" আমি কি বলিব খুঁজিয়া পাইলাম না, লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল।

[৮]

কুসুমদের সংসর্গে অনেকদিন পুরিতে রহিয়া গেলাম। দাদামশায়ের কাশী রওনা হইতে আর অল্পদিন বাকি; শুনিয়াই যেন প্রাণটা উড়িয়া গেল। মনে ছিল এমনি করিয়া কুসুমের সহবাসে সজীব দিনগুলির মধ্য দিয়া মাথা তুলিব; তখন এমন চিন্তা মনে একবারের জন্যও উঠেনি যে কুসুম আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এতদিন কুসুমের সঙ্গে কত কথা, কতকি গল্প বলিতাম কিন্তু একদিনও ত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, সে আমাকে ভালবাসে কিনা? বা সে কাহাকে বিবাহ হইয়াছে? যদিও বহুরাত্রির সুদীর্ঘ নিদ্রা ব্যয় করিয়া শয্যার উপরে ভাবিতাম, নিশ্চয়ই কাল মনকে দৃঢ় করিয়া দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই পোড়া কালই চিরদিন নূতন কাল হইয়া দিন দিন আমার মনের উপর নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল; শত চেষ্টা করিয়াও এ কালকে পুরাতন করিতে পারিলাম না।

শুনিয়া আসিলাম কালির ভোর দাদামশায় কাশী যাত্রা করিবেন। যতই দিন ঘনাইতে লাগিল, ততই যেন আমার প্রাণটা দেহের ভিতর ছটপট করিতে লাগিল! আমার হাত পা পর্য্যন্তও যেন অবসন্ন হইয়া আসিল! তাঁদের বাসায় মুখ দেখাইতে যেন লজ্জা লজ্জা ঠেকিল; আমি আমার নিজের বাসার ঘরটাতে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, কেমন করিয়া কুসুমের সঙ্গচ্যুত হইয়া ভবিষ্যতের দিনগুলা কাটাইব? দাদামশায়ের সঙ্গে আর কখনও এমন সরস তামসা করিতে পাইব কিনা সন্দেহ। কুসুমের উপর আবার রাগও হইতে লাগিল; ভাবিলাম, সে একটা উল্কার মত আমার জীবন-আকাশে উদিত হইয়া ভবিষ্যতের দিনগুলাকে উলটাইয়া দিতেছে যদি তাহার সহিত আর পুরিতে দেখা না হইত, তবে হয়ত আমি পুনরায় আমার জীবনের ভবিষ্যতকে সুখময় করিয়া তুলিতে পারিতাম।...... কুসুমের নানা চিন্তায় আমি তন্ময় হইয়াছি, এমন সময়ে দাদামশায়ের বৃদ্ধ চাকর রামচরণ আসিয়া বলিল, "আজকে বাবু! কর্ত্তা-বাবুর নিমন্ত্রণ, রাত্রে ওখানে খাওয়া দাওয়া হবে।"

আমি মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া বিছানার উপর দেহটাকে ছড়াইয়া দিয়া কুসুমের কথা ভাবিতেছি — ঘুম আর আসিতেছে না। এমনি করিয়া বিকালটা গিয়াছে; হঠাৎ বেলাশেষে একটু ঘুম পৌঁছিয়াছে। যখন ঘুম ভাঙ্গে দেখি, সূর্য্যদেব ওদিকের উচ্চ উচ্চ গৃহের ওপার হতে তাঁর শেষ কিরণ খানি দিয়া ছোট ছোট ঘর বাড়ীগুলাকে সোনার পাতে মোড়াইয়া দিয়াছেন। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে কুসুমদের বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রাণ যেন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল তবে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল?" দেখিলাম সদা হাস্যমুখ দাদামশায়েরও চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছে! কুসুম দাদা মশায়ের কাছে বসিয়া এটা ওটা নাড়িতেছিল, সেও দাদা মশায়ের এমন ভাব দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

আমাদের গভীর নীরবতার মধ্য দিয়া শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনী করিয়া সন্ধ্যা-দেবী বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বগগণে চন্দ্রদেব তার স্নিগ্ধ-মধুর শুভ্র কিরণ লইয়া পৃথিবীটাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল। মলয়পবন ফুলের গন্ধ চুরি করিয়া ছোট কুঠিটার মধ্যে ঢালিয়া দিতেছিল; দূরস্থ সমুদ্রের ভীম গর্জ্জন যেন একযোগে শত শত শঙ্খ ধ্বনীর ন্যায় সুমধুর স্বর আনিতেছিল। আমার মন কিন্তু ভাবনার তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; আমি বলিলাম,— তবে এখন আসি দাদা?

দাদামশায় মুচকি হাসিয়া বলিলেন "কখন কোথা যাবে দাদা?" কুসুমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জল খাওয়ার যায়গা কর গিয়ে!"

* * * * * * * জল খাওয়া শেষ হইয়াছে; আমি একটা ইজি চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়াছি! দেখি দাদামশায় সজ্জিত কুসুমের সলজ্জ হাত খানি টানিয়া আমার হাতের মধ্যে দিয়া বলিলেন, কুসুম! নির্ম্মলদা কি তোর সাধনার ধন নয়? নির্ম্মলদা তোর কুসুম কি কামনার কুসুম নয়?

আমি সতৃষ্ণ নয়নে কুসুমের সলজ্জ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম; বৃদ্ধের আঁখি বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া দুফোঁটা অশ্রু মাটির উপর পড়িল।

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

অশ্রু

—০:::০—

মূছনা মূছনা তুমি — নয়ন আসার,—
মলিনতা গেছে টুটে
তাইত এসেছ ফুটে
নয়নের প্রান্তে পূত তপ্ত অশ্রুধার !
ভেবনা ভেবনা ইহা দুর্ব্বলের বল !
শুধু ক্ষণিকের তরে
এসেছে নয়ন ভরে
ঢাকিতে হৃদয়ব্যথা — এযে শুধু ছল ।
স্রস্ত বস্ত্র আবরণে ঢাকিওনা মুখ,
ঘুচিয়াছে ভুল ভ্রান্তি
নাহি আর কোন শ্রান্তি,
দেখাও নিখিল বিশ্বে তোমার এ সুখ !
হানিয়া অশনি জোরে — বিদ্যুৎ বিকাশ !
দূরে মেঘ অপসরি—
জোছনা পড়িছে ঝরি;
দীপ্ত তব হবে হৃদি— নির্ম্মল আকাশ।
যে ফল্গু হৃদয় মাঝে গুপ্ত কলরোল,
উঠি ধীরে দিবানিশি
পুনঃ বক্ষে যায় মিশি
তাহারি এ ক্ষীণ ধারা পবিত্র হিল্লোল ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের আধুনিক অবস্থা ।

সমাজ ও তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সমাজকে ১টী বৃক্ষরূপে কল্পনা করিতে হইবে; নতুবা তাহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না । স্মরণাতীত কাল হইতে এই বিশাল সমাজ-বিটপী বহুধা বিভক্ত -- শাখা, প্রশাখা পল্লবাদি প্রসারিত করিয়া বিশ্বের অসীমক্ষেত্রে দণ্ডায়মান । যদি সমাজকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা যায়, তবে তাহার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা এবং পল্লবাদিরও পরিচয় দেওয়া অবশ্যক ।

সমাজ-বিটপীর মূল বিশ্বসমাজ; কাণ্ড— মানবসমাজ শাখা;- হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি; প্রশাখা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, পল্লব— গৌড়াদ্য বৈদিক, রাঢ়ি, বারেন্দ্র ইত্যাদি । এই সমাজ-বনস্পতি কোথা হইতে কি প্রকারে খাদ্য গ্রহণ করতঃ যুগে যুগে সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন । বৃক্ষের মূল স্বভাবতঃ যে রস গ্রহণ করে, তাহা কাণ্ড-মধ্য দিয়া প্রথমতঃ পত্রে আনীত হয় এবং পত্রে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, পরে সেই বিশুদ্ধ রস, বৃক্ষের অন্যান্য অংশে বাহিত হইয়া যেমন বৃক্ষটীকে বাঁচাইয়া রাখে, সেইরূপ সংসারক্ষেত্র হইতে বিশ্বমূলের সাহায্যে, জ্ঞান, ধর্ম্মাদিরূপ যে রসধারা, মানব-কাণ্ড দিয়া ব্রাহ্মণ-পল্লবে বাহিত ও পরিপক্ক হয়, তাহা ক্রমে অন্যান্য শাখা প্রশাখায় নীত হইয়া সমাজবৃক্ষটীকেও রক্ষা করিয়া আসিতেছে । বলা বাহুল্য, যেমন পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলেই, সমূহ দেহের অশান্তি;— এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়, তদ্রূপ সমাজ-বৃক্ষের পরিপাক যন্ত্রের অর্থাৎ পল্লব-সমাজের বা ব্রাহ্মণ-সমাজের বৈরূপ ঘটিলে, ক্রমে শাখা-প্রশাখা সমাজের— অবশেষে বিশ্ব সমাজেরও ধ্বংশ সাধিত হইতে পারে ।

শাখ প্রশাখা পল্লবাদি ভেদে এ সংসারে যত সমাজ বিদ্যমান, সেই সমূহ সমাজের কথা, সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপি সমালোচনায়ও ফুরায় না । তাই

. . . .

সমালোচনা কালে, অংশানুঅংশের অর্থাৎ এক একটী বর্ণ বা বর্ণের অন্তর্গত শ্রেণী-সমাজের আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এস্থলে যে গৌড়াদ্য-বৈদিক-সমাজের কথা বলা হইবে, তাহা ও ব্রাহ্মণ-বর্ণের একটী শ্রেণী মাত্র।

পুরাকালে ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা যে অতিশয় উন্নত ছিল এবং তৎকালে ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহিত যে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, ... ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ধার্ম্মিক কর্ত্তব্যের বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। তৎকালে তাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায়, অহিংসা সত্যনিষ্ঠা, দয়া, সরলতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ঈশ্বর-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির নিমিত্ত, জন-সমাজে যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের সকল চিন্তা ও যত্ন জনসাধারণের উপকারেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পর্ণ-কুটীরবাসী দরিদ্র হইতে সসাগরা ধরিত্রীর একছত্র সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেই, ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পথে চলিতেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের ও সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ক্ষমতাই ব্রাহ্মণের উপর ছিল। তাঁহারা কখনও ক্ষমতার অব্যবহার করেন নাই।

পুরাবৃত্ত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, এক সময়ে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ হলায়ুধ, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণও নানাবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এক সময়ে চানক্য প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মন্ত্রণায় মাহিষ্য রাজগণ, বঙ্গের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডিন করিয়াছিলেন। এক সময়ে ন্যায় দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার গৌরবে ও নিঃস্পৃহতায় ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ, নবদ্বীপের হিন্দুরাজ সভায়, সর্ব্বাপেক্ষা বরিষ্ঠ ছিলেন এবং রাজদরবারে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের পরামর্শদাতা ও সমুহ সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। কোন কার্য্য তাঁহাদের অমতে সম্পন্ন হইত না এবং কোন নিয়ম তাঁহাদের বিনানুমতিতে বিধিবদ্ধ হইত না। তাঁহাদের প্রতি সাধারণের সবিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহারা কেবল শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্র প্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন।

বিষয়-নিস্পৃহ স্বার্থত্যাগী হইয়া, তাঁহারা জ্ঞানধর্ম্মের আলোকে সমুদায় বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়! সেই পবিত্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আধুনিক ব্রাহ্মণগণের সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি, সে ব্রহ্মচর্য্য, সে সুদ্ধচারিতা, সে শিক্ষোন্নতি, সে সাত্ত্বিকতা আজ কোথায়? সবই কি কালের কুটিল আবর্ত্তে ভাসিয়া গিয়াছে?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ব্যাপিয়া ইহাঁদের সমাজ যাহা ছিল এই কলিকালে তাহার অভাব হইয়েছে; আর যাহা ছিল না, তাহার আবির্ভাব হইয়েছে। বহুকাল হইতে পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথে চলিয়া ছিলেন, এখন তাঁহারা সেই পথ ছাড়িয়া ক্রমশঃ অন্যপথে অগ্রসর হইতেছেন! এই নিমিত্ত আজ তাঁহাদের এতাদৃশ দুর্গতি! এই নিমিত্ত আজ সমাজের এতাদৃশ অবনতি!! অবনতির প্রধান কারণ বেদাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের শিক্ষার অভাব। সামাজিক উন্নতিই হউক আর আধ্যাত্মিক উন্নতিই হউক, সকলের মূল সেই একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত কোনও সমাজ কোন কালে উন্নত হয়না — হইবে না — হইতেও পারে না! ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি যে সুদূরবাসীগণের যশঃসৌরভে ও কীর্ত্তিতে আজ দিগদিগন্ত পরিপূরিত, তাঁহাদেরই এই শিক্ষা একমাত্র মূলমন্ত্র। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও যে, একসময়ে সমাজের অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শত শত রাজমুকুটও যে সসম্মানে তাঁহাদের পদপ্রান্তে অবনত হইত, তাহাও একমাত্র শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে! বাস্তবিক একমাত্র শিক্ষা হইতে সদগুণ নিচয় লাভ করা যায়; তাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥"

কিন্তু হায়! আজ তাঁহারা এমন বিদ্যাধন বিসর্জ্জন দিয়া প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য ঋষিগণের বিধি ব্যবস্থা ভুলিয়া, এমন চক্ষু থাকিতেও অন্ধ সাজিয়া বসিয়াছেন! জ্ঞান ধর্ম্মাদি সদ্গুণের পরিবর্ত্তে বাহ্যাড়ম্বর ও বাগাড়ম্বর মাত্র সার করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের অধিকাংশেরই উপাধি

ব্যতীত নাম স্বাক্ষর চলেনা ! পেটে বিছু না থাকিলেও তবু টাইটেল চাই। বোধহয় আজকালকার টাইটেলের অবস্থা দেখিয়া কোন লেখক এক সময়ে "টাইটেল চাই বা টাইটেল চাই" শীর্ষক একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। আবার ১৩২৩ সালের ১২ই শ্রাবনের হিতবাদী পত্রিকায় "উপাধি সঙ্কট" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন;—...... এখন কোন উপাধির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে উপাধি তোষা-মদ করিয়া লাভ করিতে হয়, আর যে উপাধি তোষামদ করিয়া দেওয়া হয়, উভয়ের মূল্যই প্রায় একরূপ। উপাধি দিয়া তোষামদ করার প্রথাটা পুরাকালে ছিলনা। সংপ্রতি তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ এই প্রথার প্রবর্ত্তক। ...... আজ কাল হাটে বাজারে বহু সাহিত্য-বিশারদ, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ, কবিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় ইহাদের অনেকেরই হস্ত নখ প্রকরণটার সহিত সাক্ষাৎ নাই। অনেক উপাধিগ্রাহের চিঠিপত্র আমরা পাইয়া থাকি, তাহাতে তাহাদের বর্ণজ্ঞানের পরিচয় পাইতে আমাদের বিলম্ব হয় না যাহাদিগের প্রতি বিদ্যা-শামুক, বিদ্যা-ঝিনুক, বিদ্যা-ডোবা প্রভৃতি উপাধি প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ, সেই সকল নামের পার্শ্বে বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি উপাধি প্রয়োগ কি নিতান্তই বিড়ম্বনা নয় ? .... যাঁহারা হিতবাদীর উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে একবার আদ্যন্ত পড়িতে অনুরোধ করি।

৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা সাহিত্যসমাজ পত্রিকায় এবং সৌম্য গৌড়াদ্য-বৈদিক সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধে (১৪৪পৃঃ,২৩পঃ) লেখা আছে;—

"দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ গৌড়াদ্য-বৈদিক সমাজে অনেক বিদ্যানিধি, তর্কনিধি, তর্কের জাহাজ, বিদ্যার কুম্ভীর আছেন, যাঁহারা গজ শব্দের ১মার এক বচনে গজম বলিয়াও লজ্জাবোধ করেন না। ......

[আগামীবারে সমাপ্য]

শ্রীপ্রজাপতি জানা।

সতী ও সয়তান।

—০*******০—

(ক)

আরব দেশ — সেথায় থাকেনা জল, জন্মেনা তরু, মিলেনা ছায়া, ফুটেনা ফুল। সেথায় প্রকৃতি নীর্জ্জিবতার একটা ভয়াল দৃশ্য বুকে করিয়া বিরাজিত। তার বক্ষে নাই বুকজুড়ান কোকিল-কাকলী, নাই মন-মাতান পক্ষীকুজন, নাই তটিনীর পাগলকরা কলধ্বনি। সেথায় আছে — কেবল সাগর প্রমাণ উত্তপ্ত বালুকারাশি, কেবল গাত্রদাহী জ্বালা, কেবল তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা।

এই আরবের অন্তর্গত ক্ষুদ্র এক পল্লীতে ইরাণী নামে এক দরিদ্রা বালিকা বাস করিত। বালিকা দরিদ্রা হইলেও তাহার মাধুরী ছিল মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায়। সে হাসিলে ফুল ফুটিত, কথা কহিলে বীণা বাজিত। সে পরীর দেহ লইয়া জন্মিয়াছিল।

বালিকার বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে ফেলিয়া ইহধাম ত্যাগ করে। তাহার ভাই ভগ্নী আর কেহই ছিলনা; সুতরাং পিতামাতার মৃত্যুতে সে অকুল সাগরে ভাসিল,— এ সংসারে তাহার আপন বলিতে কেহ থাকিল না।

মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া ইরাণী পিতার সেই পর্ণকুটীরে বাস করিত, শরীর খাটাইয়া কষ্টেশিষ্টে কালাতিপাত করিত। সহসা একদিন তাহার জ্বর দেখা দিল,— সে শয্যাশায়িতা হইল। পথ্য ও শুশ্রূষার অভাবে সে ক্রমে উত্থানশক্তি রহিতা ঘোর পীড়াগ্রস্থা হইল।

* * * * * * যে পল্লীতে ইরাণী বাস করিত, তাহার এক প্রান্তে একজন ধনবান যুবক বাস করিতেন, নাম তাঁহার রহমন। পরদুঃখকাতর রহমন যেদিন ইরাণীর মাতৃ-পিতৃবিয়োগের কথা শুনিয়াছিলেন সে দিন তাঁহার করুণ প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল, তিনি ইরাণীকে সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করিতেন। এক্ষণে তাহার পীড়ার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। আবার তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি

খোদার প্রেরিত স্বর্গীয় দূতের ন্যায় তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

(খ)

সপ্তম দিবসে ইরাণী যখন প্রথম চক্ষু উন্মিলন করিল, তখন সে দেখিল;— সে এক সুরম্য কক্ষে এক সুখময় শয্যায় শায়িতা, আর তার শিয়রে বসিয়া এক সুকুমার কান্তি যুবক। ইরাণী বিস্মিত-নেত্রে সেই কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "আমি কোথায়?" প্রত্যুত্তরে যুবক কহিলেন,— তুমি উত্তম স্থানেই আছ। হকিম সাহেব বলিয়াছেন, অধিক কথা বলিওনা। নিদ্রা যাইবার চেষ্টা কর। ইরাণী অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিল "কে আপনি স্বর্গীয় দূত?" "আমার নাম রহমন।" ধীরকণ্ঠে যুবক কহিলেন।

* * * * * হকিমের ঔষধের গুণে আর রহমনের শুশ্রূষায় ইরাণী অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল।

(গ)

রহমনের এক ভ্রাতা ছিল, নাম তার সয়ীদুল্লা। সয়ীদুল্লার হৃদয় নরকের উপাদানে গঠিত, সে শয়তানের প্রাণ লইয়া জন্মিয়াছিল। ইরাণীকে দেখিয়া অবধি শয়তান উন্মাদের মত হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে করতলগত করিতে পারিল না। কারণ ইরাণী রহমনের প্রতি অনুরক্তা, আর রহমনও ইরাণীকে ভালবাসেন। শয়তান তখন এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিল। সে স্থির করিল ইরাণী ও রহমনের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে পারিলে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। সে একদিন রাত্রে ইরাণীর সহিত সাক্ষ্যাৎ প্রার্থনা করিল। ইরাণী তাহার দুরভিসন্ধির কথা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই, সুতরাং সরলহৃদয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিল। এদিকে পাপিষ্ঠ পূর্ব্ব হইতে রহমনকে জানাইয়া রাখিয়াছিল যে, ইরাণী নিশাকালে কাহার সহিত মিলিত হয়। সরলহৃদয় রহমনও শয়তানের কথায় ভুলিলেন। তিনি যথার্থই দেখিলেন ইরাণীর কক্ষে কে এক ব্যক্তি অবস্থান করিতেছে। তিনি ইহার সত্যাসত্য

কোন প্রমাণ লইলেন না। যে ইরাণীকে আসমানের দেবী জ্ঞানে তিনি হৃদয় পুরের প্রেমাসনে বসাইয়া ছিলেন, তাহারই এই কুৎসিৎ আচরণে সমগ্র নারীজাতিটার উপর তাঁহার একটা ঘৃণা জন্মিল। সংসারের প্রতি তাঁহার বীতরাগ জন্মিল, বন্ধন-হীন তিনি তদবধি গৃহত্যাগী হইলেন।

শয়তান মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই যে এত শীঘ্র তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। সে ভাবিয়াছিল উভয়ের মধ্যে একটা বিরাগ জন্মাইয়া ধীরে ধীরে ইরাণীকে স্বীয় আয়ত্বাধীনে আনিবে।

এইবার পাপাত্মার পাশবিক অত্যাচারের সুযোগ উপস্থিত হইল। সে চলিতে চলিতে ইরাণী যে কক্ষে রহমনের অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া স্বীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইল। এত-রাত্রে সয়ীদুল্লাকে মাতালের ন্যায় স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসিল,— কে ও সৈয়দ, তুমি এত রাত্রে যে ? সৈয়দ ইরাণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সহাস্যমুখে কহিল,—"বিবি ! আমারই ষড়যন্ত্রে তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তোমার রহমন তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তোমায় সহজে না পাইয়া এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। এখন আমিই তোমার।" এই বলিয়া শয়তান তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেল। ইরাণী কাতরকণ্ঠে কহিল,— খোদা দীনদুনিয়ার মালেক ! রক্ষা কর !

এমন সময় বাহির হইতে কাহারা প্রবলবেগে দরজায় আঘাত করিল। সে আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া গেল,— সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় সবলকায় ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সয়ীদুল্লা সবিস্ময়ে দেখিল,— সে বেদুইন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

(ঘ)

আরব দেশে এক জাতি ভ্রমণশীল লোক ছিল। ইহারা বেদুইন নামে অভিহিত হইত। ইহারা পর্ব্বতে ও মরুপ্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, সুবিধা পাইলে পথিক ও বনিকগণের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত এবং সময়ে সময়ে পল্লীতে উপস্থিত হইয়া স্ত্রী পুরুষ যাহাকে পাইত ধরিয়া লইয়া

দাসদাসীরূপে বিক্রয় করিত।

ইহারা হটাৎ একদিন রহমন খাঁর গৃহ আক্রমন করিয়া সমীদুল্লা ও ইরাণীকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল।

সমীদুল্লা ও ইরাণীকে লইয়া বেদুইনগণ বড়ই বিপদে পড়িল, তাহাদের মরুভূমি পারাপারের একমাত্র অবলম্বন— উষ্ট্র সহসা প্রাণত্যাগ করিল। অগত্যা তাহাদিগকে পদব্রজে চলিতে হইল। ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল — সূর্য্যের রশ্মি ততই প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে লাগিল, তাহারা ততই শ্রান্ত হইতে লাগিল। উত্তপ্ত বালুকাকনা তাহাদের পদপ্রান্ত দগ্ধ করিতে লাগিল। পথশ্রমে তাহাদের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। তাহারা এক ওয়েশিস্ বা মরুদ্যানের নিকট উপস্থিত হইয়া সেইখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সলিলান্বেষণে যাইতে মনস্থ করিল। মরুস্থানে অবস্থান কালে বেদুইনগণের নেত্রপথে এক মনোরম জলাশয় পতিত হইল। আশার আলোকে তাহাদের মন উদ্দীপ্ত হইল, তাহারা দ্রুতপদে সেই জলাশয়ের দিকে ছুটিল। দুঃসহ পথশ্রমে, দারুণ পিপাসায় ইরাণী মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সেই চলচ্ছক্তি রহিতা হতভাগিনী একাকিনী তথায় পড়িয়া রহিল, কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না।

সমীদুল্লা ও বেদুইনগণ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই যেন সে সরসী মায়াবলে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণে মরুভূমিতে যে মায়ামরীচিকা সৃষ্ট হইয়া থাকে, সে কথা তখন তাহাদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তাহারা সেই মায়ামরীচিকার অনুসরণ করিতে-করিতে জীবন হারাইল।

(৬)

পথশ্রমে ও তৃষ্ণাজনিত অবসন্নতায় ইরাণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেই মরুদ্যানে পড়িয়াছিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যা হইল, যখন সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীর তাহার গাত্রে লাগিল, তখন সে ধীরে ধীরে নবজীবন লাভ করিতে লাগিল। সে তাহার জীবনের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাগুলি আলোচনা

করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * * * যামিনী নীরব। মেদিনী সুপ্ত। এই নিশীথ রাত্রে একজন দরবেশ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। ইরাণী ঘুমের ঘোরে কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল,— সে সহসা বলিয়া উঠিল, " রহমন আমার।" কথাকয়টী দরবেশের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বেগে ধাবিত হইয়া দেখিলেন, একটী রমণীর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূতলে পড়িয়া আছে। তিনি চন্দ্রালোকে রমণীর মুখ খানি দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, " ইয়ে খোদা মেহেরবান! এযে ইরাণী! দরবেশের চীৎকারে ইরাণী জাগ্রত হইয়া দেখিল,— দরবেশবেসে তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার জীবনদাতা রহমন।

* * * রহমন ইরাণীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া দুঃখে গৃহত্যাগী হন, সংসারের প্রতি তাঁহার বীতরাগ জন্মে; তিনি এক নির্জ্জন পর্ব্বত-উপত্যকায় বাস করতঃ খোদার উপাসনায় রত হন। এই নিশীথে জনহীন মরুপ্রান্তরে উপাসনা করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, পথে ইরাণীর সহিত সাক্ষ্যাৎ হয়। তিনি ইরাণীর মুখে সয়ীদুল্লার চক্রান্ত হইতে বেদুইন কর্ত্তৃক আক্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ইরাণীর পবিত্র চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে হৃদয়ে লইলেন।

শ্রীপরেশ নাথ চক্রবর্ত্তী।

" তোমারেই শুধু চাইহে "

আমি — তোমারেই শুধু চাইহে!
তুমি আছ যার কি ভয় তাহার,
মহিমা তোমার গাইহে।
সখা তোমারেই শুধু চাইহে।

যেদিকে তাকাই তব দয়া হাসি
সারাটি বিশ্বে উঠিছে বিকাসি
তব নামে ছুটে সুষমার রাশি,
তোমা বিনা কেহ নাইহে
আমি তোমারেই শুধু চাইহে।
মুখরিত ধরা তব গুণগানে,
হাসে দিবা তব রূপের কিরণে,
তোমা বিনা সখা কি ফল জীবনে?
কেমনে তোমারে পাইহে?
আমি তোমারেই শুধু চাইহে।
তোমারি আদেশে রবি,শশি,তারা
দেখা দেয় আসি; পড়ে বারিধারা।
তব নামে ভব হয় আত্মহারা
তোমার তুলনা নাইহে।
আমি তেমারেই শুধু চাইহে।
আকাশে বাতাসে তোমারি মহিমা,
স্বরগে মরতে তোমারি গরিমা
জীবনে মরণে তুমিই সাধনা,
তোমা বিনা গতি নাইহে।
আমি তোমরেই শুধু চাইহে।
লতায় পাতায় তব নাম লেখা
বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি সখা,
গাহিলে তোমার নাম সুধামাখা,
সব কিছু ভুলে যাইহে।
আমি তোমারেই শুধু চাইহে।

—০—০—০—

সেখ্ মহিমুদ্দিন হোসেন্

রত্নকণা।

নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা বিবেকবাণীর অনুসরণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুচ্ছ নহ, অন্ধ নহ—তোমার মধ্যে ভগবানের অংশ বিরাজিত। (মহাত্মা গান্ধী)

* * * * *

তোমরা মানুষ, তোমাদের স্পর্দ্ধিত শির নমিত হইবে না কাহারও কাছে। তোমরা মানুষ, তোমাদের অমিত শক্তি কাহারও কাছে পরাজয়ের ম্লান অগৌরবে ফিরিয়া আসিবেনা। (স্বামী স্বরূপানন্দ)

আলোচনা।

চরখা— চরখার দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে কিনা তাহা আমাদের অভিজ্ঞতায় না থাকিলেও এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, চরখার দ্বারা দেশের দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার অনেকটা থামিবে — দেশ স্বাবলম্বী হইবে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। বিদেশী বস্ত্রের জন্য আজ দেশের লক্ষ লক্ষ মুদ্রার স্রোত চলিতেছে, যাহাকে শত চেষ্টা করিয়াও থামাইতে পারা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা কেবলমাত্র এই চরখার দ্বারা যাদু-বিদ্যার মত একদিনে থামিয়া যাইতে পারে। চরখা আজ আমাদিগকে কঠিন সমস্যার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে!—এত পরিশ্রম, এত সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া যে বস্ত্র পাইব তাহা বিদেশী বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা অধিক বচন খরচ করিতে রাজি নই। দয়া করিয়া চরখা ধরুন, দেখিবেন, আপনার হস্ত-বসন-কাপড় ত বিনাব্যয়ে হইবেই; অধিকন্তু আলস্য ও অসৎ চিন্তা হইতে অনেকটা রেহাই পাইবেন। আমরা জানি, সচ্ছল গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা আলস্যে অনেক সময় ব্যয় করেন। যদি তাঁহারা দিনান্তে অন্ততঃ দু ঘণ্টা করিয়া চরখায় হাত দেন তবে দেশের ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আপনারা যাঁহারাই হউন, সর্ব্বদা মনে রাখিবেন নির্ম্মল সুখ, আপাত মধুর বিলাসময় জীবনের মধ্য দিয়া নয়,—কঠোর কর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়া!

খদ্দর — কেবল গায়ে খদ্দর জড়াইয়া রাখিলে আমরা তাঁহাকে স্বদেশ সেবক বলিয়া মানিব না। আমরা যখন দেখিব তাঁহার আত্মা স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত, তখন আমরা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিব এবং মাথা পাতিয়া তাঁহাকে স্বদেশ-সেবক বলিয়া মানিয়া লইব। আমাদের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, এই খদ্দর অনেক স্থলে মানুষ ঠকাইতেছে। স্বদেশ সেবক সাজা যত সহজ,— হওয়া তত সহজ নয়!

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

বিবিধ সংবাদ।

শোক সংবাদ— এ মাসে আমাদিগকে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, দুইজন সাহিত্যিক — যাঁহারা ভবিষ্যতের আশা, তরুণ বালকগণের নিকটও পরিচিত; তাঁহারা গত অগ্রহায়ণে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের একজন সর্ব্বজন-পরিচিত ৺ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আর একজন নবীনা সাহিত্যিকা "ছেলেদের বঙ্কিম" প্রভৃতি রচয়িত্রী ৺ ভক্তিলতা ঘোষ। আমরা ইহাঁদের পরিজন বর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ জেডলাপ নামক এক আমেরিকান কোম্পানির ম্যানেজার মিঃ গ্রেয়েল দাতন হইতে গোপীবল্লভপুর এবং নবীগ্রাম হইতে পলাশমুণ্ডি পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের প্রায় ৭০ মাইল ব্যাপী ১টী রাস্তার সংস্কার করিবার জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

আসামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কল্পনা চলিতেছে।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে গৌহাটীতে ১টী কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী বসিবে।

বরোদার মহারাণী নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন শিক্ষা ব্যাপারে বরোদারাজ ভারতের রাজাদের আদর্শস্থানীয়

অধ্যক্ষ নিয়োগ লইয়া, মেদিনীপুর কলেজের গভর্নমেণ্ট সাহায্য বন্ধ হইয়াছে।

[প্রথম বর্ষ] ১৩২৯ শোভনা [তৃতীয় সংখ্যা] মাঘ

ত্যাগী

চাহে না ত সে বিলাস ভবন
নন্দন-কুসুম-বন,
পারিজাত-হার, সুষমার ধার,
নাহি তার প্রয়োজন।
চাহেনা ত সে চন্দ্র-কিরণ,
সুনীল গগন— রমা,
ভুলায় না মন কোকিল-কুজন,
প্রকৃতির মধুরিমা।
অলকা, নন্দন, গোলক, ত্যজি সে
শ্মশানে বেঁধেছে গেহ;

কৌস্তভ, কুঙ্কুম, ত্যজিয়া সে যেগো
ভস্মে ঢেকেছে দেহ।
রতন ভূষণ নাহিক তাহার
নাহি শিরে মুক্তা, মণি;
শার্দ্দূল-অজিন পরিধান তার,
শির 'পরে শত ফণী।
সাগর মন্থনে অমৃত ত্যজিয়া
করেছে গরল পান,
যুগ যুগ ধরি অবনী তাহার
ঘোষিছে ত্যাগের গান।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

বেদ ও বেদান্তের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত চণ্ডীপাঠে দুরারোগ্য ব্যাধিও আরোগ্য হইতে আমি নিজেই দেখিয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহারা আমার এই কথার সারবত্তা অনুভব করিবেন। যাঁহাদের বিশ্বাস নাই তাঁহারা হয়ত আমার এই কথা উপেক্ষা করিবেন। আমিও একথা তাঁহাদিগকে বলিতেছি না। যিনি হিন্দু নহেন অথবা হিন্দু হইলেও যাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা নাই তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অবিষয়। ঐ শাস্ত্রে তাঁহার কোন ফল হইবেনা। শাস্ত্রের বক্তা ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ও দেবতায় বড় পার্থক্য নাই। বেদেই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে আম্নাত হইয়াছে যে — "যাবতীর্বৈ দেবতা তাঃ সর্ব্বা বেদাবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্বেদবিদ্ভো ব্রাহ্মণেভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যাৎ নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ এতাএব দেবতা প্রীণাতি ॥"

যত দেবতা আছেন তাঁহারা সকলেই বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শরীরে বাস করেন। তন্নিমিত্ত বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন অভিবাদন করিবে। অশ্লীল কীর্ত্তন করিবেনা। তাহা হইলে ঐ সকল দেবতা তৃপ্ত হইবেন। এই শ্রুতিমূলক স্মৃতি এই যে — "তুষ্টিতমা ব্রহ্মণা যদ্বদন্তি তদ্দেবতা কর্ম্মভিরাচরন্তি তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেষু পরক্ষদেবাঃ ॥"

ব্রাহ্মণেরা অতিশয় সন্তোষ হইয়া যাহা মুখে বলিবেন, দেবতারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দিবেন। প্রত্যক্ষদেবতা ব্রাহ্মণ সন্তোষ হইলে পরোক্ষ দেবতাও সতত প্রসন্ন হইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে এইরূপ শৌচব্রতী বেদবিৎ ব্রাহ্মণ দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। আমাদের বাল্যকাল হইতে যে সকল মহাপুরুষ স্বরূপ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াছি বা দেখিয়াছি সেরূপ তেজঃপুঞ্জ অথচ সৌম্যমূর্ত্তির ব্রাহ্মণ অতি বিরল। উপনয়নের পরে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদপাঠে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয় এবং তেজঃ বৃদ্ধি হয়। এই প্রকারে বেদাধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে যোগাভ্যাস করিতে হয় এবং যোগসিদ্ধি হইলে দেবত্ব লাভ হয়। এরূপ যোগীর অসাধ্য কিছুই থাকেনা। কিন্তু

উপনয়নের পরে বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্তশাস্ত্র অর্থাৎ দর্শন জ্যোতিষাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে এরূপ দেবত্ব লাভ করা যায় না। এই নিমিত্ত মনু বলিয়াছেন— " যোহনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রমাশু গচ্ছতি স্বান্বয়ঃ ॥ " যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ না করিয়া অন্ত শাস্ত্রে পরিশ্রম করেন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই স্ববংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব অগ্রে বেদপাঠ না করিয়া অন্ত শাস্ত্র পাঠ করিলে দেবত্ব লাভে বাধা হয় এজন্য মনুর এত কঠোর শাসন।

মহর্ষি কপিল সগর সন্তানকে ভস্ম করিয়াছিলেন ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। তেজঃপুঞ্জ মহর্ষির ক্রোধদীপ্ত নয়ন বহ্নি হইতে যে তাঁহারা দগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা ইহাতে কিছুই অসম্ভব দেখিনা। আগ্নেয়প্রাবা রৌদ্রে ধরিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। ঐ প্রস্তরে যে অগ্নি আছে রৌদ্র তাহার উত্তেজক। তাদৃশ ক্রোধ ঐ মহর্ষির তেজোরাশির উদ্দীপক হইয়াছিল। গুণাকর তানসেন সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে তিনি দীপকরাগ গান করিয়া দগ্ধ হইয়াছিলেন। সূর্য্যের নেত্র হইতে দীপক রাগের উদ্ভব। সুতরাং ঐ রাগ আগ্নেয়। গান্ধার স্বর উহার গৃহ। ঐ স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি। দীপক রাগ আলাপ করিতে হইলে গান্ধার স্বর পুনঃ পুনঃ যোজনা করিতে হয়। বারম্বার গান্ধার স্বর যোজনায় অগ্নি উৎপন্ন হয়। ঐরূপে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা গুণাকর দগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে অসম্ভাব্য কিছুই নাই। এইহেতু তাঁহার সময় হইতে অদ্যাবধি গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই দীপক রাগ গান করেন না। তৎপরিবর্তে ঐ রাগের প্রধান ৩ সন্তান নট কানড়া বারোঁয়া গান করিয়া থাকেন। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।

বর্তমান সময়ে তাদৃশ ব্রাহ্মণের অভাব ও দ্রব্যের অবিশুদ্ধি নিমিত্তক বেদোক্ত ক্রিয়া সম্যক ফলবতী হইতেছে না। কিন্তু তাহা বলিয়া বেদবাক্য ভ্রমপ্রমাদ-দুষ্ট হইতে পারেনা। শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াতে পঞ্চশুদ্ধির আবশ্যক। আত্মশুদ্ধি, পত্নীশুদ্ধি, ঋত্বিক্‌শুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও

দেশশুদ্ধি। এই পঞ্চশুদ্ধির অভাবে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা সম্যকরূপে অভিষ্টসিদ্ধি না হইলেও কিছুনা কিছু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রিয়া একেবারে বিফল হয়না। কুলপতি মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন।

নিষ্কৃতির্নহি বেদানাং মন্ত্রাণাং কলিদোষতঃ।
কলিদোষ নিবৃত্ত্যর্থং গায়ত্রীমাশ্রয়ে দ্বিজঃ॥
গায়ত্রীমন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং গায়ত্রীং ত্র্যযুতং জপেৎ।
সর্ব্বেষাং বেদমন্ত্রাণাং সিদ্ধ্যর্থং লক্ষকং জপেৎ॥
গায়ত্রীং ন্যাস পূর্ব্বাঞ্চ সপ্তব্যাহৃতি সম্পুটাম্।
ত্র্যযুতন্তু জপেৎ পূর্ব্বং গায়ত্রী সিদ্ধিদা ততঃ॥
ত্রিমধুবৈ ত্রিসাহস্রম্ গায়ত্র্যা জুহুয়াদথ।
ভূসুরাণাং সুরাণাঞ্চ ভেদো নাস্তি জগত্রয়ে॥
প্রথমং লক্ষ গায়ত্রীং সপ্তব্যাহৃতি সম্পুটাম্।
ততঃ সর্বৈ বেদমন্ত্রৈঃ সর্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥

কলিদোষ হইতে বেদমন্ত্রও নিষ্কৃতি পান নাই। কলিদোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীকে আশ্রয় করিবেন। প্রথমতঃ ন্যাস করিয়া সপ্তব্যাহৃতি-পুটিত গায়ত্রী ত্র্যযুত জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে গায়ত্রী সিদ্ধিদা হইবেন। তৎপরে ত্রিমধু দ্বারা গায়ত্রীমন্ত্রে ত্রিসহস্র হোম করিতে হইবে। পরে সপ্তব্যাহৃতি-সম্পুটিত লক্ষ গায়ত্রী জপ করিতে হইবে তাহা হইলে বেদমন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হইবে। এই ক্রমানুসারে ঋগবিধানোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ফলপ্রাপ্তি হইবে। এখন প্রায়শঃ বিধি ও পঞ্চশুদ্ধি বিরহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং সম্যক ফল প্রত্যক্ষ হয় না। তথাপিও কর্ম্ম একবারে বিফল হয় না। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে কলিকালে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়না "তত্তু কলে স্বভাবাৎ" সেটী কেবল কলির স্বভাব হেতুক। কলির স্বভাবই ক্রিয়া ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। তাহা হইলে ক্রিয়ার্থক শাস্ত্রের কোনমতে অপ্রামাণ্য হয় না অথবা ভ্রমপ্রমাদ-দুষ্ট তাহাও বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদতীর্থ।

অনুপমা।

— × × —

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুপমা মিত্রের কথা।

আজ প্রায় এক সপ্তাহের উপর হইল আমরা বাড়ী ফিরিয়াছি। অনিল বাবু বাড়ী গিয়া ইতিমধ্যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানির প্রতি ছত্রে যেন অমিয় ঢালা, তাহা আমার হৃদয়ে নব জীবন সঞ্চার করে। পত্রখানির প্রতি অক্ষর অনুরাগের একটা ম্লান ছবি আঁকিয়া দেয়। তাঁহার পত্র পাইয়া আমি আমার পড়ার ঘরে বসিয়া প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলাম;—

"প্রিয়, অনিল বাবু!

আপনার প্রীতিপূর্ণ লিপি-বাণী আমার বিরহ-বেদনা-জড়িত প্রাণে অমিয় সিঞ্চন করে। মাঝে মাঝে এইরূপ সুধাধারা ঢালিয়া আমার তপ্ত প্রাণ শীতল করিবেন। বলিতে কি, আপনি আমার হৃদয়ের শূন্য স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাতে আর কাহারও স্থান হইবেনা জানিবেন। এই উত্তাল তরঙ্গময় অনন্ত ভবসাগরে আপনাকে ধ্রুবতারা করিয়া আমি আমার জীবন-তরণী খানি বাহিব। মানস-মন্দিরে আপনার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নীরবে অর্চ্চনা করিয়া জীবন কাটাইব। আমার যে জীবন রক্ষা করিয়া আপান আমাকে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ক্ষুদ্র জীবনখানি আপনার চরণে অর্পণ করিয়া আমি ঋণ মুক্ত হইব। আমি আপনার মিলন চাইনা। কেবল আমাকে ওই চরণে একটু স্থান দিয়া ঋণমুক্ত করুন। অনেক লিখিয়া ফেলিলাম, চোখের সম্মুখে রহিলে বোধহয় এত কথা বলিতে পারিতাম না। প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন! আমরা আজ এক সপ্তাহের উপর হইল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছি। কলিকাতায় পৌঁছিলেই দয়া করিয়া একবার আমাদের সহিত দেখা করিয়া যাইবেন। আমি ভাল আছি, বাবাও। তিনি এক-বার আপনাকে এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আশা-

করি, আপনি কুশলে আছেন। ইতি—

অনু—”

ঝির হাতে চিঠিখানা লেটার বক্সে ফেলিতে দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম; কিন্তু কিছুতেই তন্দ্রা আসিল না। একটির পর একটি করিয়া মনে কত কি চিন্তা জাগিয়া প্রাণটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। হায়! পিতার অজ্ঞাতসারে একজনকে ভালবাসিয়া এ কি করিলাম? পিতা যদি এ বিবাহে সম্মত না হন তবে উপায়? কয়েক মূহুর্ত্তের চিত্তসংযমের অভাবে এ কি করিয়া বসিলাম? হায়! সেদিন যদি একবার ভাবিয়া দেখিতাম, আমি যে পথে যাইতেছি সে পথ হইতে আর ফিরা যায় না, আমি যাহা করিতেছি তাহার আর ব্যতিক্রম হয় না। বোধহয় আজিকার মত সেদিন আমার ভাবিবার অবসর ছিলনা অথবা শক্তিও ছিলনা। পরমূহুর্ত্তে আবার ভাবিতে লাগিলাম, যাহাকে একবার ভালবাসার চক্ষে দেখিয়াছি তাহার ছবি আমার চক্ষে কখনও ম্লান হইবে না। যাহার মূর্ত্তি এক মূহুর্ত্তের জন্যও মানষ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছি তাহাকে কখনও বিস্মৃত হইব না। যদি আমাকে শত ঝঞ্ঝার ঘাত প্রতিঘাত সহিতে হয় তাহাও সহিব, শত কশাঘাত সহিতে হয়, তাহাও সহিব, শত বিপদ বরণ করিতে হয় তাহাও বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তক পাতিয়া লইব, তথাপি ধর্ম্মতঃ স্বামীরূপে যাহাকে গ্রহন করিয়াছি তাহাকে কখনও ভুলিব না।

এইরূপ নানা চিন্তা ও ভাবনার মধ্য দিয়া একটা মাস কাটিয়া গেল। অনিল বাবু প্রায় দুই সপ্তাহ হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি দুই তিন বার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এখন তিনি এম, এ, পড়েন। আমিও পূর্ব্বের মত রোজ বেথুন স্কুলে গিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এবার আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে পারি নাই। যতীন দাদা বলে— আমি নাকি আমাদের আত্মীয়ের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি পড়ায় তেমন মন দিই নাই, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতাম। তিনি নাকি অনেক সময় আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া

আমার পাঠাগারের দরজা হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কথাটা যে সম্পূর্ণ অলীক তাহা আমি স্বীকার করিতে পারিনা, তবে কতকটা অতিরঞ্জিত।

ফেল হইলেও আমার পড়া বন্ধ হইল না। আমি প্রত্যহ স্কুলে যাইতাম। একদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমাদের বাড়ীর সম্মুখের গলিতে একখানি ব্রুহাম গাড়ি অবস্থান করিতেছে। ভাবিলাম, বোধহয় কোন ধনবান কিম্বা উচ্চ পদস্থ রোগী চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাবার বন্ধু ধীরেন বাবু আর যতীন দাদা অবস্থান করিতেছেন, বাবা তাঁহাদের সহিত কথোপ-কথন করিতেছেন। ধীরেন বাবু আমাদের বাড়ীতে খুব কমই আসিতেন, তারপর দাদার মৃত্যুর পর হইতে আদৌ আসেন নাই। দাদাকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তাঁহার শোকে তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "একটা গান শোনাও ত মা, অনেক দিন অবধি তোমার মুখের গান শুনি নাই।" আমি সলজ্জভাবে কিছুক্ষণ নতমুখে বসিয়া থাকিলাম, শেষে তাঁহার নিতান্ত অনুরোধে আমাকে গাহিতে হইল। তিনি নিজেই হারমোনিয়মটা টানিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। আমি গাহিলাম—

আমি গাহিব তাঁহারি কারণ—
জলদের তরে তৃষিত চাতক গেয়ে থাকে গান যেমন।
ফুলবাস তরে বায়ু গায় যথা,
মধু আহরণে গায় যথা গাথা
ভ্রমর তুলিয়া গুঞ্জন।
আদরে চকোর যথা চাঁদ তরে,
বসন্তে বরিতে যথা পিকবরে
কাননে করেরে কুজন।

গান ফুরাইলে বাবার আদেশে একজন চাকর দুই পেয়ালা চা ও দুই খানি রেকাবে করিয়া কতকগুলি ফল ও কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। ধীরেন বাবু বাবার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এ সব আবার কি ?" হাস্যমুখে বাবা কহিলেন "একটু চা আর গোটাকতক ফল মাত্র, বেশী কিছু নয়।" তারপর তাঁহারা উভয়ে সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। [illegible]

জলযোগের পর ধীরেন বাবু বাবার দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—আমাদের সে প্রতিশ্রুতি তোমার স্মরণ আছে ত ?

বাবা কহিলেন,—হাঁ নিশ্চয়ই স্মরণ আছে।

প্রত্যুত্তরে ধীরেন বাবু কহিলেন,—তবে এস, আগামী মাসে যতীনের সঙ্গে অনুর বিয়ে দিই। শুভ কাজে আর দেরী করাও ভাল নয়, তা' ছাড়া আমরা এখন বার্দ্ধক্য দশায় এসেছি বলে বলতে কখন চলে যাব তার স্থির নাই।

কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। হায় ভগবান! শেষে আমার অদৃষ্টে এই ছিল। হায়! প্রিয়তম, জানিনা—এ কথা শুনিলে তুমি স্থির থাকিতে পারিবে কি না ?

বাবা কি উত্তর দেন শুনিবার জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলাম; সর্ব্বাঙ্গ আমার কম্পিত হইতে লাগিল।

বাবা কহিলেন,—তাই এতদিন যখন অপেক্ষা করেছি, আরও কিছুদিন করে আগামী বছরে ওদের বিয়ে দিয়ে দিব।

আর একমুহূর্ত্তও আমি সে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, [illegible] হউক, আমি সেই মুহূর্তে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। তারপর আর কি কথাবার্ত্তা হইল জানিনা। আমি শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দারুণ মর্ম্মব্যথায় আমি ছটফট করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে গত হইয়াছিল স্মরণ নাই, [illegible] তাকে জাগিলাম, দেখি সেখানে কেহই নাই। [illegible] সমাপন করিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রিতে

ভাল ঘুম হইল না। অস্থিরতা ও চিন্তার মধ্য দিয়া রাত্রিটা কাটিয়া
গেল। পরদিন বাবা এক রোগীর বাড়ী গিয়াছেন, আমি একটা চেয়ারে
বসিয়া কার্পেট বুনিতেছি, এমন সময় বারান্দায় বুটের মস্ মস্ শব্দ
শুনিতে পাইলাম। দেখি, যতীন দাদা আসিতেছেন। আমি চেয়ার
ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি অপর একটা চেয়ারে উপবেশন
করিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন,— "অনুপমা, শোন!" "কি বলুন" বলিয়া
আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—
অনুপমা, কালকের ঘটনা তোমার কাছে কিছুই অবিদিত নাই, সে বিষয়
বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। এখন আমি মাত্র জানতে চাই এ বিবাহে
তুমি সুখী কিনা?
আমি সকল শক্তি এক কেন্দ্রে আহরণ করিয়া বলিলাম,— যদি বলি যে
এ বিবাহে আমি অসুখী?
তিনি বোধহয় আমার নিকট এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, তাই
সাশ্চর্যে কহিলেন,— সেকি অনু, তুমি কি তোমার পিতার প্রতিশ্রুতি
লঙ্ঘন করবে? ভেবে দেখ যদি তোমায় শেষে বাধ্য হতে হয়?
তাঁহার কথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইতেছিল, আমি মুখখানা বিকৃত
করিয়া কহিলাম,— তাই বুঝি আমায় সতর্ক কর্ত্তে এসেছেন আপনি?
তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন,— রাগ কোরনা অনু,
আমার ও তোমার পিতা অতি শৈশব থেকেই এ সম্বন্ধ স্থির করে রেখেছেন
আজ যে তাঁরা এতে অনুমত করবেন, এমন আমার বিশ্বাস হয় না। আজ
হউক কি দুদিন পরেই হউক, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ আমাদিগকে
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে। তখন হতে তোমাকে আমার সুখ
দুঃখের, জীবন মরণের সহভাগিনী হতে হবে। আজ যদি তুমি আমায়
ভাল না বাস, তাহলে তখন আমাকে নিয়ে সংসার পাতবে কি করে?
তখন তোমার চোখে আমি একটা ধূমকেতুর মত ভেসে উঠে, তোমার
শান্তিময় জীবনকে জ্বালাময় করে তুলবো; আর তুমি, আমার চোখে
একটা অভিসম্পাতের মত জেগে উঠে, আমার শান্তির সংসারে অশান্তির

হলাহল ঢেলে দিবে। তাই জানতে চেয়েছিলাম অনু, এ বিবাহে তুমি সুখী কিনা ?

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তাঁহার মুখখানা কেমন ম্লান হইয়া উঠিল। তিনি আত্মভাব গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু তাঁহার এই ভাবান্তর আমার দৃষ্টি এড়াইল না। আমি তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিলাম, — আজ আমায় মাপ করুন, সময়ান্তরে এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

তিনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন কিনা জানিনা, তবে শুষ্ক একটা হাসি হাসিয়া সে দিনকার মত বিদায় হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

কেমনে ভুলিব ?

মৌন সন্ধ্যায় কভু তার স্বর যেনগো আকুলি তুলে,
নীরব নিশিথে সে আসি নীরবে যেনগো অশ্রু ফেলে।
তার দান স্নেহ পুতুলি এযেন তাহার মূরতি আঁকা,
কেমনে ভুলিব ? আছে তার লিপি অনুরাগ-অশ্রুমাখা।

মোর প্রতীক্ষায় না জানি এবে সে কোন দূর সুরপুরে,
না জানি তাহার বারবার কত রেখেছে মরম পুরে।
ভোজনে শয়নে তার মুখখানি জাগে এ হিয়ার পর,
কেমনে ভুলিব ? তার সেবা প্রেম মনে পড়ে নিরন্তর।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের আধুনিক অবস্থা।

হায় ! যে জাতি— যে সমাজ একদিন মানব শক্তির চরম শিখরে ও সাধনার শেষ সীমারেখায় উঠিয়াছিলেন, আজ আবার সেই পবিত্র জাতি— সেই পবিত্র সমাজ' অস্তাচলচূড়াবলম্বী তপনের মত, একটা বিরাট শক্তির লুপ্তপ্রায় ছায়ার মত, বিলীন হইতে বসিয়াছেন। শিক্ষার অভাবে আজ তাঁহারা আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইয়াছেন. পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যস্মৃতি চিরদিনের জন্য কুসংস্কার স্রোতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যদি কেহ বলেন,— আমাদের সমাজে কি পরম জ্ঞানী ও পাণ্ডিক কেহ নাই ? তদুত্তরে বলিতেছি— আছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা আশানুরূপ নহে। আজকাল আমরা বয়সে প্রবীন না হইলে, তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক। কেহ কেহ বলেন "আমরা মাথার চুল পাকাইয়া একজন বালকের উপদেশ গ্রহণ করিব?" কিন্তু এই হিসাবে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং ॥
(মনু ২। ২৩৯)

অর্থাৎ অমৃত বিষযুক্ত হইলে, বিষের অপসারণ করিয়া অমৃত গ্রহণ করিবে, বালকের নিকট হইতেও হিতজনক বচন গ্রহণ করিবে; শত্রু হইতেও সদনুষ্ঠান গ্রহণ করিবে এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ করিবে।

তাই বলি, বালকই হউক আর ক্ষুদ্রই হউক, যদি তাহাদিগের নিকট হইতে সৎশিক্ষা, সদুপদেশ পাওয়া যায়, তবে তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা, দোষ বা বিরক্তির বিন্দুমাত্রও কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ উৎকোচ গ্রহণ;— আজকাল শুধু গৌড়াদ্য-বৈদিক কেন, প্রায় সকল স্থানে সকল বর্ণের মধ্যেই উৎকোচ গ্রহণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এমনকি শাস্ত্রচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান ৺ কাশীধামের

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও যে এই পন্থাবলম্বী তাহা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা "সমাজ" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যটি পাঠ করিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই সংখ্যার ৪৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।—"* * * * * সেই দিনও কলিকাতার ব্রাহ্মণ সভায় জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন,—'আমরা ফাঁক রাখিয়া ব্যবস্থা পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকি। বেগতিক দেখিলে ঐ ফাঁকে পা দিয়া পলায়ন করি। * * * * * *" হায়! ইহাও কি তাঁহাদের অধঃপতনের পূর্ব্ব-লক্ষণ নহে? ব্রাহ্মণ না সমাজের রাজা? ব্রাহ্মণের হস্তেই না— হিন্দু-সমাজের বিধি ব্যবস্থা পরিচালিত? সমাজের সকল বর্ণেই না— ব্রাহ্মণকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে? ছিঃ তাঁহারা যদি উৎকোচের বশীভূত হইয়া, মিথ্যা জল্পনা, কল্পনার ছদ্মমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও অযৌক্তিক উক্তির অবতারণা করেন, তবে সমাজ আর কাহার হস্ত ধরিয়া চলিবে— বুঝিতে অক্ষম।

তৃতীয়তঃ স্বেচ্ছাচারিতা;— নিজের ইচ্ছামত যে চলে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহে এবং সে সমাজদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হয়। যে সমাজ অতকাল বিধি ব্যবস্থা ও সুযুক্ত পরামর্শ দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, জ্ঞান-ধর্ম্ম ও মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা সে শক্তির অভাবে একমাত্র স্বেচ্ছাচারিতা প্রভাবেই যাবতীয় অসাধ্য সাধন করিতেছেন। অভাবগ্রস্থ হইলে মানব স্বতঃই স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে—স্বীকার করি; কিন্তু অভাব হইলে যে স্বভাব নষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন কারন নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্মে যদি জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তবে সেই আপৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৃত্তি এবং তাহাতেও না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। এই কালযুক্তিতে তাহার অভাব নাই। অধুনা অধিক ব্রাহ্মণই চিকিৎসা, বাণিজ্য ও পশুপালনাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু বৈশ্যবৃত্তিতেও জীবন যাত্রা না চলিলে যে স্বেচ্ছাচারী হইয়া শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে — ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়

আর কি হইতে পারে।

চতুর্থতঃ অযোগ্যতার দাবী;— যথার্থ যোগ্য হইলে তাহার দাবী আছে বটে, কিন্তু অযোগ্যতার দাবী কোথায়? আজকাল সমাজের অনেক ব্রাহ্মণ ছচারি পাতা ব্যাকরণ পড়িয়া, কেহবা নিজে লেখাপড়া না শিখিয়াও পিতার যোগ্যতায় আপনাকে পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক সমকক্ষ প্রাপ্যের দাবী করিয়া বসেন। ইহা নিতান্ত অন্যায় নহে কি? যথোচিত গুণ না থাকিলে পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত, ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার, ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে ইহা কোন শাস্ত্রে আছে? যথোপযুক্ত হইতে না পারিলে, একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্রকে সামান্য কেরাণী গিরিতে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তাঁহারা এখন অযোগ্য আছেন. কিন্তু যখন যোগ্য হইবেন, তখন যোগ্যতার সম্মান ও পুরস্কার আপনা আপনিই আসিয়া জুটিবে। আমি বড় ছিলাম,— একথা বলিলেই আমাকে কেহ বড় বলিবেনা—বড় করিবেও না।

পঞ্চমতঃ সমাজপতিগণের * দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা,— মানবের শিক্ষাই পরম শক্তি। কেবল একমাত্র শিক্ষা হইতে জ্ঞান-বল, ধর্ম্ম-বল, অর্থ-বল প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিই লাভ করা যায়। কিন্তু মূলবস্তু হারাইলে অন্য শক্তির প্রভাব কোথায়? তাই অন্যান্য শক্তি থাকা সত্ত্বেও একমাত্র শিক্ষার অভাবে মানব, সমাজে দুর্ব্বলের ন্যায় অবস্থান করে। ইহাঁদের আধুনিক সমাজপতিগণের মধ্যে অধিকাংশকেই এই দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিয়াছে, তাহার উপর সামাজিক যাবতীয় কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন। রাজা যেমন প্রজার শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রগঠন প্রভৃতির উন্নতি ও পাপীর দণ্ড বিধান, পণ্ডিতের সম্মান— সতত রক্ষা করিতে যত্নবান হয়েন,

* আমাদের স্থানীয় কেবল ৮। ১০খানি পরগনার গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "মালিকান" কথাটির প্রচলন দেখা যায়। মালিকান শব্দের অর্থ কি সমাজপতি? সবিশেষ বুঝিতে না পারিয়া, মালিকানের পরিবর্ত্তে সমাজপতি উল্লেখ করিলাম।

সেইরূপ সমাজের উন্নতিকল্পে, সমাজপতিগণেরও সর্ব্বদা চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সমাজ ক্রমশঃ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি এই কারণগুলি সমাজোন্নতির ঘোর অন্তরায় স্বরূপ। অতএব সত্যই যদি সমাজের উন্নতি এবং দেশের উন্নতি বাসনা থাকে, তবে আবার সেই প্রাচীন আচার পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের সহিত বেদ ও বেদানুগত স্মৃতি-সংহিতা ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইতে হইবে। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের ক্রিয়া-কলাপ এবং বিধি-নিষেধের যথারীতি পালন ও ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া উৎকোচ গ্রহণ, স্বেচ্ছাচারিতা, অযোগ্যতার দাবী প্রভৃতি সমাজের বর্ত্তমান দোষাবলীর বিসর্জ্জন এবং সামাজিক অপরাধীর যথা-রীতি দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। আর এক কথা সম্প্রতি প্রায়ই দেখা যায় যে, সমাজপতির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিক্ষিতই হউক; আর অশিক্ষিতই হউক তিনিই পিতার সমাজপতিত্বে ভার গ্রহণ করেন। যদি তিনি শিক্ষিত হয়েন, তবে কাহারও কিছুই বলিবার থাকেনা; আর যদি অশিক্ষিতই ভার গ্রহণ করেন, তবে তাহা দ্বারা সমাজের যে কিরূপ অশান্তি ঘটিয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপিচ যিনি সমাজপতি তাঁহার আত্মপর ভাবিয়া কার্য্য করিলে সমাজরক্ষা চলেনা। এ আমার ভাই, এ আমার জামাই,— অবশ্য ইহাদের দক্ষিণার মাত্রাটা কিছু বেশী হওয়া চাই; রেকাবীর পরিবর্ত্তে ঘটী ঘড়াটা দেওয়া চাই— ইত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্য করা কখনও উচিৎ নহে। আর সমাজের নেতা হইয়া, "আমি যাহা বলিব (অন্যায় হইলেও) তাহাই হইবে—" ইত্যাদি দাম্ভিকতায় সেই সমাজপতির উপর কাহারও বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে কি? তাই বলি সমাজের নেতৃত্ব পদটী বংশপরম্পরাগত না হইয়া, যদি জ্ঞানধর্ম্মাদি গুণানুগত হয়, তবে সমাজের অতদূর অবনতি কখনও সম্ভবে না।

সমাজই হউক আর ধর্ম্মই হইক সংসারে কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান থাকেনা। দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন, সুখের পর দুঃখ,

সৃষ্টির পরপ্রলয়, উন্নতির পর অবনতি ইত্যাদি প্রকৃতির নিয়ম। এই-রূপে সমাজধর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ চক্রের ন্যায় মানবের ভাগ্যপথে আবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু আবর্ত্তনের ফলে, লোকের ভাগ্যে যখন চক্রের শীর্ষস্থান অধিকার করে, তখন যদি চক্রের আবর্ত্তন বন্ধ করা যায়, তবে তাহার গতি ঘূর্ণীয়মান না হইয়া সচল হইবে এবং যত-দিন এরূপ অবস্থায় রাখিবে, ততদিন উন্নতির একটানা স্রোতে বহিয়া যাইবে। তাহা করিতে হইলে, সেই একটানা স্রোত অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে, বিশ্বপাতা ভগবানের করুণা লাভের জন্য আধ্যাত্মিক উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এখনও যদি ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শানুযায়ী চরিত্র গঠন করেন, সমাজের কুসংস্কারগুলি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি করিতে পারেন, সমাজ দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই আবার তাঁহাদের সুদিন আসিবে; আবার মঙ্গল বাদ্য গভীর নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিবে. আবারমন্দাকিনীর পূর্ণপ্রবাহে কলুষ কালিমা চিরদিনের জন্য বিধৌত হইয়া যাইবে। তবে আর কেন ? "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

শ্রীপ্রজাপতি জানা।

—০:*:*:*:*:*:*:*:০—

পতিতা না পতিত ?

—*****—

[১]

ছি বিধাতা কেনই বা নারী হয়ে জন্মেছিলুম ! যদি নারী হয়ে ছিলুম, তবে বাঙলার এমন কঠোর অত্যাচারী পল্লীর মাঝে কেন পড়ে ছিলুম ! জানিনা ভগবান, কোন পাপে পল্লীর নারীজাতি এত নিষ্পে-ষিত ও পদদলিত হচ্ছে !

ভগবানের আর একটা অভিসম্পাত আমার উপর ছিল, আমাকে ধরাতলে এমন পিতার গৃহে পাঠিয়েছিলেন, যাঁর উপর দিনান্তে না হলেও দারিদ্র্যের উৎপীড়ন ছিলনা এমন বলতে পারি না।

আমার বাল্য জীবনের স্মৃতি নাইবা লিখিলাম? একজন সাধারণ গৃহস্থের কন্যা যেমন করিয়া কালাতিপাত করে, আমিও ঠিক তেমিভাবে হাসিয়া খেলিয়া বাল্য অতিক্রম করলাম। ভবিষ্যতের এমন দুঃখ, এমন শোকের জন্য আমি ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। কেবল ধূলার ভাত তরকারী রাঁধিয়া ভাই-ভগ্নিগুলিকে খাওয়াইতাম। উঃ! তাতে কি আনন্দ! বাস্তব ভাততরকারী রাঁধিলে আরও না কত আনন্দ পাইব সে জন্য যেন হাঁপাইয়া উঠতাম। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় যবনিকা তুলিয়া কেহ আমার জীবন-আলেখ্য দেখাইতে প্রয়াস পায় নি!

আমি সুশ্রী ছিলাম কিনা, যদিও কোন দিন তার বিন্দু বিসর্গ জানতে পারিনি, কিন্তু শুনতাম আমি নাকি খুব রূপবতী। এই পোড়া রূপই আমার জীবনটাকে মাটি করেছিল। হা! বিধাতা রূপ দিয়েছিলে ও পিতার সামর্থ দাওনি কেন,— সর্ব্বসন্তাপহারী অর্থ দাওনি কেন?

বাল্যে আর ভাবিনি, শীঘ্রই একটা নূতন জীবন সুরু হবে। হা! বিধাতা যদি জানতে এমন একটা ব্যথাময় জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তবে হাস্যময় বাল্যজীবন দিয়েছিলে কেন? — দিয়েই বা ছিনিয়ে নিলে কেন? হাসিকি আমার ভাগ্যে নাই?

[২]

কৈশর শেষে যৌবন প্রতীক্ষা করে বসে আছি, শুনলুম গোবিন্দ-পুরের বাট বছরের জমিদার দ্বিতীয়পক্ষে নাকি আমায় গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শুনেই শিউরে উঠলুম, এমন লোককে কেমন করে বা স্বামী বলে গ্রহণ করব? ও বাড়ীর বৌদির কাছে শুনেছিলুম, "ভগবান নাকি সমানে সমানে মিলিয়ে দেন।" হায়! এ কেমন সমান? বাট আর দশ! এর একজনের প্রতি তবে ভগবান কি বাদ সাদেন?

হায় ! আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলুম, তারি প্রায়শ্চিত্ত এম্নি করে কর্ত্তে হবে ?

রাত্রদিন ভাবি কেমন করে এ বিবাহ হবে ? মনে আর এতটুকু সুখশান্তি নাই। একদিন শুনলুম বাবা নাকি তাতে অমত প্রকাশ করেছেন। শুনেই যেন নূতন জীবন পেয়ে গেলুম। ভক্তিতে যেন বাবার পায়ে আমার মাথা নুয়ে পড়ল। বুঝলুম বাবা নিঃস্ব হলেও তাঁর মন ছোট নয়।

শুনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নাকি বিধাতার লিখন। তাই বুঝি পিতার অদম্য শক্তিকে নুয়ে পড়তে হল। আর আমাকে বৃদ্ধ জমিদারের হাত ধরতে হল।

অর্থ কি মানুষকে এতই পিশাচ সাজায় ! অর্থ কি মানুষকে এতই অন্ধকারে রাখে যে, পরপারের পথটুকু পর্য্যন্ত দেখতে দেয় নি ! অর্থ কি মানুষের মনুষ্যত্বকে ঘাড়ে ধরে তাড়িয়ে দেয় ? সে পিশাচ জমিদার,— না না পিশাচ বলব না; একদিন হলেও আমি তাঁকে স্বামীর আসনে বসিয়েছিলুম, পতি পরম গুরু বলে তাঁর পদধূলি মাথায় পরেছিলুম।

* * * * * পিতার সমস্ত গ্রামই বুড়োর বাধ্য হয়ে গেল। সমস্ত গ্রাম বলি কেন ? যাঁরা বাধ্য হলেন তাঁরা গ্রামের সমাজপতি; তাঁরা নাকি গ্রামকে সামাজিক বন্ধন হতে একচুলও নড়তে দেন না। সমাজের এতটুকু দোষ পর্য্যন্ত দেখলে চীৎকার করে উঠেন,— এ্যা হলো কি ?

[৩]

শক্তিধর স্মৃতিরত্ন আসিয়া পিতাকে বুঝাইতেছেন, "এতে তোমার আমার কথা নয় বাপু; বিধির বিধান বি—বা—হ ! যেখানে যার লিখন তা হবেই হবে। আর দুঃখ করে কি হবে বলত ? তুমি কন্যার জন্ম দিয়েছ কিন্তু ভাগ্য দাওনি। দুঃখও বলি কিসে ? ইনি মস্ত বড় জমিদার। খাওয়ার কষ্ট না পরার কষ্ট ! হাঁ তবে একটু বয়স হয়েছে এই না; আরে বাপু ও রকম বয়স হয়।" বাবা একটুও কথা পর্য্যন্ত বলতে পারছেন না;

কেবল তাঁর চোখের জল বাঁধা না মেনে মাটী ভিজাচ্ছে! বাবার কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেললুম!
শুনলুম আমি যে ওবাড়ীর বৌদির কাছে বলেছিলুম "এমন পিতার ঘরে আমি জন্মিনি, যে আমাকে এমন মৃতবৎ বৃদ্ধের হাতে সঁপে দিবে!" তারি জন্ম নাকি পিতা আর কিছু বলতে পারেন নি; তাঁর মাথার উপর দিয়ে শত অত্যাচার, নিষ্পেষণ এক একটা দমকা বাতাসের মত চলে যাচ্ছে; আর তিনি মাথা পেতে সয়ে নিচ্ছেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না।

ছোটবেলা একদিন বাবার মুখে শুনেছিলুম কোনখানে নাকি এক জন বালিকা ক্রসিনে কাপড় ডুবিয়ে পুড়ে মরে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমিও ওরূপ মরে যাই, কিন্তু আবার ভাবলুম আমি চলে গেলে নাজানি নিরীহ পিতার উপর আরও কত অত্যাচার হয়! পিতার সুখময় পল্লী-জীবনকে, সদাহাস্যময় সাজান বাগান খানিকে, নাজানি বা বিপর্য্যস্ত করে দি! হায় আমিই পিতার গলগ্রহ; আমিই সব অনর্থের মূল।
পিতার কাছে বলে পাঠালুম, আমিই তাঁকে বিয়ে করব পিতা মত দিলেন; বিবাহের আয়োজন চলতে লাগল।

[৪]

সানায়ের তান কানে বিষ ঢাললেও মনকে কঠিন করে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। বিবাহের দিনের সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দ যেন আমার নিকট বিধাতার উপহাস বলে বোধ হতে লাগল।
নানা আড়ম্বরের সহিত বর পৌঁচেছেন। অতিরিক্ত আড়ম্বরে তাঁর বয়স চাপা পড়তেছিল। কেহ বলতেছেন, এমন বয়সে সকলের বিয়ে হয়, আবার কেহ বলতেছেন এ আবার কি বয়স? অনেকের মন বরের দিকে চলিয়া পড়িলেও আমার কিন্তু তাঁর উপর রাগ হচ্ছিল।
বিয়ের সব আয়োজন ঠিক, এমনকি আমিও পর্য্যন্ত বিধিশালে নীত হয়েছি। বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতকুলের নানা কূট তর্কে মজলিস

পাকিয়া উঠেছিল। নস্যাধার হতে নস্য যে বেশ খরচ হচ্ছিল তা পাণ্ডবগণের উচ্চ উচ্চ হাঁচিতে ঘোষিত হচ্ছিল।

লোলচর্ম্ম বুড়োর হাড়ময় হাতখানা যখন আমার হাতের উপর দিয়া পুরুৎ ঠাকুর বেঁধে দিলেন, তখন আমার প্রাণটা ছোঁৎ করে উঠল! পলে পলে বোধ হতে লাগল, কত যেন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সংযত হয়ে থাকতে গিয়ে কত যেন আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলুম।

যখন "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হয়ে জমিদারের অট্টালিকায় ঢুকে পড়লুম, তখন তার বিচিত্র কারুকার্য্য ও নূতন নূতন আসবাবপত্র দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেলুম! তারপর ক্রমে সেই চিন্তা, সেই শোক, সেই দুঃখ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বুড়োর অতিরিক্ত আদর যত্ন, চর্ব্বিত চর্ব্বণ প্রেমালাপ আমার নিকট কেমন কেমন ঠেকিল! আমার হতভাগিনী সতীন দুজনার উপর বুড়োর একটা অস্বাভাবিক ক্রোধ ও কেমন কেমন ভাব দেখে আমি জ্বলে উঠতুম। কিন্তু মুখফুটে কোন দিন তার কোন প্রতিবাদ করতে পারি নি, অনেক সময় নিজেই চম্‌কে উঠতাম না জানি আমিও তদ্রূপ ঘৃণ্য ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ি।

ও বিধাতা যাঁকে মাত্র একদিন সর্ব্বজন সমক্ষে পতি বলে মেনে নিলাম, তাঁকে ত ঠিকে পূজা করবার অবসর কুলিয়ে উঠল না। বাসর ঘরে তিনি কতই কথা না বললেন কত আদর যত্নই না করলেন; কিন্তু কোত্থেকে পোড়া লজ্জা এসে আমায় চেপে ধরল। আমি মাথাটা পর্য্যন্ত নেড়ে একটা কথার জবাব দিতে পারলুম না। গুড়িশুড়ি মেরে এক কোণে বসেই রইলুম।

* * * * * * * * *

ওঃ সে কি দৃশ্য! যখন বুড়োর থাইসিস তাঁকে মুড়ে আন্‌ল। বাণবিদ্ধ পাখীটির মত মৃত্যুর তোরণের নিম্নে তিনি ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। আমি কেবল ঘরের কোণ হতে উঁকি মেরে দেখতুম, আর

ভবিষ্যত জীবনের কথা ভেবে শিউরে উঠতুম। মনে হত, বুড়োর পায়ে ধরে বলি "ওগো আমি কোথায় কার কাছে থাকব!"

যেদিন বিধাতা আমার প্রাণকে শক্ত করে নিয়ে বুড়োর পায়ের নীচে এনে ফেলালেন, সেদিন বুড়োর কথা বলবার শক্তি ছিল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলুম; লজ্জা ছেড়ে চীৎকার করে কত কথাই না বল্লুম। কিন্তু হায় বিধাতা একটীরও উত্তর পেলুম না! ডাক্তার কবিরাজগণের সব সন্ধান ব্যর্থ করে; জানিনা তিনি আবার কাহার সন্ধানে মহাপ্রস্থান করলেন!

[৫]

ভাদরের ভরা গাঙের মত আমার যৌবন উছলিয়া উঠিল! উঃ সে কি অদম্য শক্তি, সে কি উদ্দাম প্রবৃত্তি, সেকি মিলনের তীব্র আকাঙ্খা আর প্রাণের গভীর বেদনা! এমন সুকৃতি করে উঠতে পার নি, শীর্ণ হক, বৃদ্ধ হক, স্বামীর পায়ে যৌবন উৎসর্গ করে দি! হায় বিধাতা যদি এমন যৌবন দিলে, তবে স্বামীকে ছিনিয়ে নিলে কেন? যুবক যুবতী-গণের প্রেমালাপ,— এমনকি বৃদ্ধ বৃদ্ধারও কৌতুক ব্যঙ্গ দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠতুম। গোটা পুরুষজাতটার উপর আমার মস্ত রাগ হত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"র ছুতা লইয়া লোলদন্ত, মৃতপ্রায়, বৃদ্ধ তৃতীয় চতুর্থ পক্ষ গ্রহণ করুক; আর হতভাগিনী রমণীগণ, একটা উপভোগের একটা বিলাসের দ্রব্য হইয়া পর পর উপেক্ষিত ঘৃণ্য হউক!

একদিন বাবার কাছে শুনেছিলুম বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি নাকি "বিধবা বিবাহ"। বিবাহ-বাসরই আমার স্বামীর সহিত মিলনের প্রথম এবং শেষ দিন! এমন বালবিধবার বিবাহ বাবা দিতেন কিনা তা ভগবান আমায় জানতে দেননি। বুড়োর হাতে সঁপে দিয়ে নিজের অকৃত-কার্য্যের জন্যই হউক আর আমার কষ্ট দেখতে পারবেন না বলেই হউক, অকালে তিনি কোন এক অজনা অচেনা রাজ্যে ছুটে পালালেন।

ও বাড়ীর রমেশঠাকুরপোর কাছে শুনেছিলুম সমাজ সংস্কার

সমিতির পক্ষ থেকে এক বিরাট সভা হয়ে গিয়েছে! তাতে নানা বাদ প্রতিবাদের পর স্থির হয়েছে "বাল বিধবাগনের নাকি বিবাহ হওয়া, এবং তাহাদিগকে নাকি বিবাহ করা উচিত!" পল্লীগ্রামের সভা কিনা; তাতে কোন ভদ্রমহিলা উপস্থিত হতে সাহস করেন নি। সেজন্য সভাপতি বীরেন বাবু নাকি সকাইকে অনুরোধ করেছেন, "যাতে একথাগুলা স্ত্রীলোকেরা— অন্ততঃ বাল বিধবাগণ শুন্‌তে পান!" আর যাঁরা বিধবাগনকে বিবাহ করতে রাজী আছেন তাঁদের একটা ছাপান তালিকাও বিতরিত হয়েছে দেখেলুম!

তাঁদিগকে যেন আমার দেবতা বলে মনে হতে লাগল; তাঁদের পায়ের নিচে গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা গেল! আর মনে হতে লাগল এদেশেরি মানুষ, এদেশেরি সমাজ একটার পর একটা স্ত্রীগ্রহন করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন না। তারপর একটার পর একটা উপভোগের পর ঘৃনা করে; উপেক্ষা করে, পাদিয়ে দলিয়ে চলে যায়! আর একদল মানুষ তাঁরা তোমাদের অত্যচারী এ সমাজের ভিতরেই হউন আর বাইরেই হউন এইখানেই সমাজের উপেক্ষিতা বাল বিধবাগণকে বুকে তুলে অভয় দেন!

[৬]

বিধবা গ্রহনেচ্ছু মহিন বাবুকে আমি আমার দুঃখ জানিয়ে পত্র দিলুম! শুনলুম মহিনবাবু বহরমপুর থেকে বিএ পড়েন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; ওঃ সেকি সৌম্যমূর্ত্তি, প্রতিভামণ্ডিত বদনমণ্ডল! মনে হল চাকচিক্যময় বিদেশী শিক্ষাসভ্যতা যেন তাঁর প্রতিভাকে ঢেকে রাখ্‌তে পারেনি। অত্যাচারী সমাজের মাঝখান থেকে আমার তাঁকে মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না; মনে হচ্ছল তিনি দেবতা! দেবতার কাছে লাজ লজ্জা ছেড়ে প্রাণের সব কথা খুলে বল্লুম।

শুনলুম আমি নাকি সমাজের বাইরে এসে পড়েছি। বিধবা মা কাঁদছেন; আর দয়াল ঠাকুর মাকে বুঝাচ্ছে! তার শেষ কথাটুকু বাতাস চুরি করে আমার কানে এনে দিল,"ঘোর কলি, মেলেচ্ছ; মেলেচ্ছ!"

আমার পুনরায় বিবাহ হবে শুনেগ্রাম্য সমাজপতিগণ নাকি রেগেই আগুন। হয়ত আমাকে তাঁরা এজগৎ থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিতেন, যদিনা মহিম বাবু পুলিসে জানিয়ে রাখতেন। যখন তাঁরা শুনলেন এটা নাকি একটা আইন তখন তাদের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপিত হল।— ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ।

সমাজ সংস্কার সমিতির ব্রাহ্মণ এসে আমাদের বিবাহ সেরে দিলেন। আমি দ্বিতীয় স্বামীর হাত ধরে আবার একটা নূতন সংসার পাতবার আশায় একটা অভিযান সুরু করে দিলুম। আমি তাঁকে এ জীবনটা দান করেছিলুম, কেবল স্বামী বলে নয়— অনেকটা দেবতা বলেও।

* * * * * * * *

মার কঠিন অসুখের সংবাদ শুনে ছুটে এলুম। হায় বিধাতা! এসেই দেখি মার কণ্ঠরোধ। মার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম। দেখলুম মা কেবল আমার দিকেই চেয়ে রইলেন, তাঁর আকুল চাউনি যেন আমাকে কত কি আশীর্ব্বাদ করতে চায়! মার কণ্ঠায় একটু জল দিবার জন্য গেলুম ও হায় সে কি চীৎকার, সে কি গণ্ডগোল। সবাই হাত তুলে নাক সেঁটকায়ে বল্লেন " না না দিওনা। " আমি সকলের মানা সত্ত্বেও পিপাসিতার জন্য জলের পাত্রটা ছুঁয়ে ফেলেছিলুম বলে সেটা বিসর্জ্জিত হল! শুনলুম আমি নাকি পতিতা। ওগো নিষ্ঠুর সমাজ, ওগো অত্যাচারী সমাজ আমায় বুঝিয়ে দাও, আমি দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ করেছি বলেই পতীতা, আর তুমি শত শত ভ্রূণহত্যা করে, বালবিধবাগণকে শত প্রকারে নিষ্পেষণ করে তাদের দীর্ঘ নিশ্বাসেও পতিত হওনি।

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁবুড়া।

—***—

রত্ন কণা।

সংযমশিক্ষা দ্বারা আপনার চিত্তবৃত্তিকে বশীভূত করিতে পারিলে সকল কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। (মহাত্মা গান্ধী)

অনুভূতি।

১

প্রভাত যখন সোহাগেতে চায় শতেক নয়ন তুলি,
বিশ্ব যখন আপনা হারায় দুঃখ আঁধার ভুলি;
কর্ম্ম আসে ছুটিয়া হেথায় আলোক রথের টানে,
তখন কাহার স্মিত হাস্য জাগে আমার প্রাণে।

২

মধ্যাহ্নে যবে ধরার বক্ষে আর্ত্ত রবির কর,
কিএক ধূসর স্বপন-জাল অলস আঁখির পর;
প্রমত্ত বায়ু ভ্রূকুটি হানে রুদ্ধ কক্ষ দ্বারে,
ঝঙ্কারে কার সুমধুর স্বর আমার হৃদয়-তারে।

৩

সায়াহ্নে যবে দিবসব্যাপী শ্রান্ত কোলাহল!
তটিনীবক্ষে তরঙ্গলীলা রাঙা আকাশতল;
একটু সোহাগ সুরভি খুঁজিয়া মৃদুল মলয় বয়,
কিএক মধুর আবেশে মুদে আমার নয়নদ্বয়।

৪

নিশীথে যখন বিহ্বল ধরা স্তব্ধ নীরবতায়,
মুদিত কোরক অধর চুম্বি আকুল মলয় বায়
লুটাইয়া পড়ে স্বপ্নের ঘোরে শ্রান্ত ক্লান্ত হিয়া,
কাহার মধুর মৃদুল শ্বাস যায় হৃদি পরশিয়া।

৫

তিনিযে আমার নয়ত কেবল সারা বিশ্বের ধন!
কবে যে আসিয়া দাঁড়াবে দ্বারে, রুদ্ধ নয়ন মন—
খুলে যাবে মোর দেখিব তাঁহার শুভ্র কর খানি,
জুড়াইয়া দিতে সব জ্বালা শীতল বক্ষে টানি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস।

ভক্তের আদর্শ।

ভক্তবৃন্দ! তোমাদের আজ সমাজে স্থান কোথায়? অসম্মানিত—অনাদৃত—ঘৃণিত তোমরা, একবারও চিন্তা করিয়াছ কি—কেন চির-পূজ্য তোমরা সমাজ-নিন্দিত? বিদ্রূপের নিদাঘ-বার্ত্তা কেন আজ তোমাদের উন্নত মস্তক আনত, সৌম্যমূর্ত্তি বিষাদ-ক্লিষ্ট করিয়াছে? অবিশ্বাসের জলদ-জাল কেন বিশ্বাসের শেষ রশ্মিটুকু সমাচ্ছন্ন করিয়াছে? জড়োপাসনার তরঙ্গাঘাতে মজ্জনোন্মুখ প্রেমতরণীর কর্ণধার তোমরা—তোমাদের কি এই পরিণাম?

যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বদেশ তোমাদের ধর্ম্মকেতন সগৌরবে বহন করিয়াছিল, সে আদর্শ অন্তরে উপলব্ধি না করিয়া কেবল কি বাহ্যাড়ম্বরে সমাজকে নতশীর্ষ, মন্ত্রমুগ্ধ করিতে চাও? তোমাদের আদর্শহীন আদর্শ, অন্তঃসারহীন আড়ম্বর কি তোমাদের অন্ধত্বের পরিচায়ক নহে? বিমুক্তভূপহোমুখ তোমরা,—তোমাদের অন্তর-দুর্নীতি-বিষ সমাজদেহে যে অবিশ্বাস-ব্যথা আনিয়াছে, তাতে কি তোমরা ঘৃণা, উপহাস ও অত্যাচার ছাড়া অন্য কিছু আশা কর? এই অধঃপতনের দিনে সমাজ অনুসন্ধান করিবেই; তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি কোন পথে?

যে প্রেমভরা পুলকে—যে চিন্তাহীন প্রশান্তিতে—যে নির্লোভ সেবায়—যে পরমার্থজ্ঞানে ভ্রান্তদেহের সর্বজাতি—পূর্ব্বপরিচিত জগৎ তোমাদের পদচুম্বন করিত, সে সৎ গুণরাজি আজ কোথায়? শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধ-চৈতন্যের ভক্ত তোমরা—নিষ্কাম কর্ম্ম, ত্যাগ ও প্রেমের সাধক তোমরা—লোভের স্রোতমুখী তরণীর দ্রুত নিম্নগতির প্রতি অবাক নির্নিমেষ নেত্রে কি অবেক্ষণ করিতেছ? তোমরা কি ভুলিয়াছ যে দুর্গম স্রোতের বিপক্ষে পাড়ি দিয়া, শত বিপদের মধ্য দিয়া তোমাদিগকে তোমাদের গন্তব্য—স্থির অচঞ্চল চিরানন্দময় মানস সরোবরে পৌঁছিতে হইবে? তোমরা বুঝি আশা করিয়াছ যে লোভের তরণীতে সমাসীন হইয়া সমাজ-নিন্দার ভয়ে উন্মুখী হইলেই সমাজ তোমাদিগকে ভক্তি করিবে? যদি নির্লোভ আদর্শ গ্রহণ করিতে তোমাদের মনে সন্দিগ্ধতা আসে, তবে আর কপটতার

গৈরিক বেশে সমাজ তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে না। কপটতা ত্যজিয়া নিজ স্বরূপ প্রকাশ কর, নচেৎ যে আদর্শ-মার্গগামী বলিয়া তোমরা পরিচয় দাও, তাহার সরল নির্ভীক যাত্রী হও, যাত্রার পথে স্থির অচঞ্চল হও। সমাজভুক্ত স্বার্থপ্রয়াসী ধনলিপ্সু ভক্তনামধেয় ব্যক্তিগণকে আদর্শ না করিয়া জ্ঞানচালিত বিবেকসম্মত ধর্মপোষিত পথে ভক্তি-নত মনে আরাধ্যের অনুসন্ধান করিতে থাক,— সমাজ তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদিগকে শ্রদ্ধায় শিরে তুলিয়া লইবে, তোমাদের সহযাত্রীগণ অস্থির মধ্যপথ হইতে হঠাৎ ফিরিতে পারে, তোমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইওনা; মনে রাখিও দুঃখবীণায় যে ঝঙ্কার উঠে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর— দুর্গম পথের যাত্রী যে সে সর্ব্বাপেক্ষা বীর।

শ্রীগোরাচাঁদ গিরি।

—*************—

বঙ্গজননী।

পুণ্য প্রভাতে বিমল আলোকে সাজায়ে বরণ ডালা।
স্নিগ্ধ আভায় ঝলসি দ্যুলোকে কানন করেছ আলা।
দূরে, অদূরে, সুদূর প্রান্তরে মহিমা সুষমা তব।
ভাবে, জগতে বিতরি করুণা রচিছ সাহিত্য নব,
নিত্য নূতন বিজ্ঞান আলোকে সমুজ্জ্বলা বঙ্গ-জননী।
বীর প্রসূতী অতীত প্রতিভা স্নেহের শুভ্র নবনী॥
অঙ্কে তোমার রবীন্দ্র বঙ্কিম রচিছে অমিয় বাণী।
আর্য্য গরিমা মহিমা মরি-মা এখন রয়েছে রাণী॥
বীর্য্য তোমার পলাশী-প্রান্তরে, শিক্ষা তোমার কুটীরে,
পুণ্য অর্জ্জিত বিগত শোভাটী দিয়েছ বঙ্গ-বাণীরে।
বিত্ত তোমার বিতরি জগতে আপনি হয়েছ নিঃস্ব।
শুষ্ক আননে হেরিয়ে এখন, অবাক, অধীর বিশ্ব॥

ব্যাধি ব্যারাম অভাব রাক্ষস গ্রাসিল সন্তানে আজ।
পল্লী প্রাঙ্গনে রোদিছ নীরবে পরিয়ে মলিন সাজ ॥
দেবী আমার চিত্তর অন্তরে, চিন্ময়ীরূপে ব্রতী।
অশ্রুবিধৌত স্মৃতির কুসুম, ভকতিপূর্ণ প্রণতি ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বেরা।

"মাতৃ-আহ্বান।"

মাতৃত্ব বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলেও "মা" নামের মধুরতায় প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। গভীর দুঃখের মাঝেও মা নামের মধুরতা আমাদিগকে তুলিয়া ধরে, দুঃখের কৃষ্ণ মেঘকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দেয়। আজ চতুর্দ্দিক মাতৃ-আহ্বানে মুখরিত,— কত কবি, কবিত্ব-সৌরভে মার আহ্বানে রত; কত পণ্ডিত বেদের সামনিনাদে ও গভীর ঝঙ্কারে মার বন্দনায় নিরত! তারি মাঝে মায়ের কুসন্তান আমরা, ভাষারস-বর্জ্জিত আমরা, কবিত্ব-পাণ্ডিত্যহীন আমরা মার আহ্বানে চলিয়াছি।

* * * *

এস বিদ্যাদেবি, তোমার রক্ত-রাগ-রঞ্জিত চরণস্পর্শে এ নগণ্য সাধনাটী রঙিন হইয়া উঠুক। তোমার চরণরেণুতে পল্লীর হাহাকার, দুঃখ, দৈন্য দূর হউক! এস শ্বেতবরণি, আঁধার জগৎ তোমার শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক! সেই শুভ্র আলোকে আমরা যেন তোমাকে চিনিয়া লই!

এস বিদ্যাদায়িনি! বেদ, বিজ্ঞান, দর্শনাদি বিদ্যাদান করিয়া অন্ধ, বিভ্রান্ত বঙ্গবাসীকে উন্নতির উচ্চতম শিখর দেখাইয়া দাও। বাঙ্গালীর সাহিত্যে, এত সম্পদ, এত ধনরত্ন ও এত ভাবরাজি আনিয়া দাও যে, সে চতুর্দ্দিকে তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উত্তোলন করুক।

এস বীণাপাণি, তোমার তান-লয়-মান-সম্বলিত বীণার মধুর ধ্বনিতে বাঙ্গালীর অসাড় প্রাণে কর্ম্মপ্রবণতা জাগিয়া উঠুক! প্রাণের ছিন্ন তার-গুলি আবার বাজিয়া উঠুক। সুপ্ত আত্মা আবার আনন্দে নৃত্য করুক। এস বাগ্‌দেবি, পল্লীর কণ্ঠে বোল, সে সত্যকথা বলিতে শিখুক। তাহার প্রাণের কথা মুখে ফুটিয়া উঠুক! সে তাহার অভাব অভিযোগের কথা

স্বাধীন মুক্তকণ্ঠে বলুক। আর সেই সত্যকথায়, সত্যানুসরণে পল্লী সজীব ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠুক।

এস সরস্বতি, শত সহস্র ভাবসম্পদে পল্লীর মুখোজ্জ্বল কর। আমাদের সাধনা সহস্রমুখী নয়; আমাদের সাধনার দুই দিক, কর্ম্মের ও ভাবের। আবার ভাবের মধ্য দিয়াই কর্ম্মের সাফল্য। এস মা, আজ মুক্তির কর্ম্মী-সঙ্ঘকে অতুল ভাবসম্পদে সত্যের সুন্দর পথ দেখাইয়া দাও। এস বাণি, তোমার অমৃত বাণী শুনিবার জন্য অনশন-ক্লিষ্ট, রোগশোক-জীর্ণ পল্লী-বাসী তোমার চরণতলে মিলিত হউক।

এস অবিদ্যানাশিনী, তোমার বিদ্যার বিমল কিরণে অবিদ্যার ঘন কুয়াষা দূরিভূত হউক। বাঙ্গলা তোমার শুভ্র বিদ্যালোকে তার মুক্তির পথ খুঁজিয়া লউক! আজ স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, আত্মম্ভরিতাদি তোমার পুণ্য কর-স্পর্শে দয়া, সৌজন্য, বিনয়াদিতে পরিবর্ত্তিত হউক।

এস সারদা, তোমার শুভ্র হস্তে আমাদিগকে আজ জীবনের সারত্ব প্রদান কর! রিপুর দাসত্ব হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। তোমার সন্তান হইয়া আর কতদিন এমন হয়ে ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়া থাকি! এস মা, আজ আমাদিগকে এমন বর দিতে হবে, যাতে আমরা মানুষ হই। মানুষের শ্রেষ্ঠতম অধিকার হতে যেন দূরে না থাকি।

এস মরাল-বাহিনি, নারদ-বীণা-কীর্ত্তন-মুখরিত, স্বাদু মন্দাকিনী-নীর-ধারা-বিধৌত স্বর্গ হইতে তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তানগণকে উদ্ধার করিতে প্লাবনে হৃতসর্ব্বস্ব সদা প্রবল অত্যাচার-জর্জ্জরিত, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর পীড়নে মৃতপ্রায়, নিষ্ঠুর কলের ভীষণাবর্ত্তে নিষ্পেষিত বাঙ্গলায়; হংস-পৃষ্ঠে অবতরণ কর। আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, তোমার শুভ্র বিমল আশীর্ব্বাদ ছড়াইয়া দাও।

এস শতদলবাসিনী, তোমার অকৃতি অক্ষম সন্তানগণের অশ্রুসিক্ত হৃদয়াসনে। এ হৃদয়াসন স্তব-স্তুতিহীন নির্গন্ধ কিংশুক সদৃশ হইলেও কেবল মা, তোমার পূণ্য চরণরেণু স্পর্শে শতদলের ন্যায় সুন্দর সুস্নিগ্ধ ও সুগন্ধময় হইয়া উঠিবে।

এস মা, এ আহ্বান মরণের পূর্ব্বের দুঃখপূর্ণ মিনতি নয়— এ ঘোর ঘুমের পর জাগরণের পূর্ব্ব অনুতাপ! বিকট চিৎকারে তোমার কান বধির হইবে না — কেবল অনুতাপের নীরব নিঝুম তপ্ত অশ্রুতে তোমার অলক্ত-রঞ্জিত রাজিব চরণযুগলের অলক্তরাগ ধুইয়া যাইবে। এস মা, আজ তব অকৃতি সন্তানগণকে নব সাজে সাজাইয়া দাও! তাহাদের কণ্ঠে অভয়বাণী, হস্তে বিজয়-পতাকা আর তাহাদের হৃদয়ে তোমার রঞ্জিত চরণযুগল দাও! তাহারা নির্ভয়ে তোমার বিজয় গান চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করুক।

মা, আমরা চাহিনা মহাজনের ন্যায় দিগন্ত-বিস্তৃত যশঃসৌরভ, রাজার ন্যায় অতুল বিভব এবং পাণ্ডবের ন্যায় দিগ্বিজয়ী মান, যদি তোমার ওই দুটী রাজাব চরণকমলে স্থান পাই।

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

আলোচনা।

বাঙ্গলার জল-প্লাবন— একদিন ইংরাজ শাসক বঙ্গ ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গলার প্রাণের সন্ধান লইয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গলা তার পরীক্ষা দিয়াছিল। গুণ-গ্রাহী সম্রাটকে বাঙ্গলায় আসিয়া পুনরায় তাকে জোড়া করিয়া দিতে হইয়াছিল। এমনি করিয়া জগতের প্রত্যেক সৎকর্ম্মের ও কর্ম্মী সঙ্ঘের পরীক্ষা গ্রহণ করা প্রাকৃতিক রীতি। আমাদের মনে হয়, আজ উৎকুণ্ঠিত পাগলপারা এ বাঙ্গলাকে ভগবান পরীক্ষা করিবার জন্ত এমন হাহাকারময় প্লাবন দিয়াছিলেন! আমরা অবোধ, অজ্ঞ, তাই চমকে উঠেছিলাম; না জানি বাঙ্গলার নাম ডুবে যায়।

আমাদের কানে প্লাবনের হাহাকার পৌঁছাতে না পৌঁছাতে, প্রথমে পৌঁছেছিল নব্য বাঙ্গলার কর্ম্মগুরু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কানে আর নবীন পথের তরুণ যাত্রী স্বেচ্ছাসেবকগণের কানে। এমন গভীর দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে দেখিলে, এমন বিভীষিকাময় প্লাবনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দেখিলে কাহার মন না আনন্দে নাচিয়া উঠে? যখন আমরা ভাবি তাঁরা যে আমাদেরি দেশের লোক, তখন আমাদের মন কি এক বিমল

আনন্দরসে আপ্লুত হয় না ?

একদিন আচার্য্যদেব স্বেচ্ছাসেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"এসময় তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ কিনা ?" তার উত্তরে স্বেচ্ছাসেবক দল বলিয়াছিল, কি ?—" আমরা ইহাঁদিগকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে পারবনা।" স্বেচ্ছাসেবকগনের শক্তি সামর্থ আপনাদের উপর নির্ভর করিলেও তাঁহাদের মন কেমন উচ্চ দেখুন ! এমনি উচ্চ মনেতে আপনাদিগকে দান করা চাই ! হে অর্থশালীগণ ! হে ব্যবসাদারগণ ! আজ এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আপনাদের অর্থের সদ্ব্যবহার করুন। সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহারেই নির্ম্মল সুখ বিমল শান্তি।

ছাত্র সম্মিলনী— গয়ার এবৎসর নিখিল ভারত ছাত্র সম্মিলনীতে (১) অস্পৃশ্যতা নিবারণ, (২) বরপন নিবারণ, (৩) মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন, (৪) বালিকা বিধবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, (৫) খদ্দর উৎপাদন ও প্রচার, (৬) কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা, (৭) জাতীকে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী করা, এইগুলি গৃহীত হইয়াছে। দেশের এই সন্ধিক্ষণে এগুলি সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ভবিষ্যতের আশা ছাত্রমণ্ডলীকে ও সর্ব্বসাধারণকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি ! বিশেষতঃ ছাত্রমণ্ডলী যদি প্রথম চারটি ও সর্ব্বসাধারণ যদি ৫ম ৬ষ্ঠ টী গ্রহণ করেন তবে নিশ্চয়ই দেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, অভিশপ্ত দেশ— দুর্ব্বল জাতি স্বাবলম্বী হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গৃহীত হইল। তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অন্য কোন উপায় না থাকায় প্রজাগণের উপর নূতন কর ধার্য্য হইবার কথা হইতেছে।

চৌরা চৌরীর মামলায় যে ১৭২জনের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল তাহারা হাইকোর্টে আপিল করিয়াছে।

আগামী ৩রা ও ৪ঠা মাঘ কাশীতে উত্তর ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

হইবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

হাড়িয়া থানার পোড়াচিংড়ি গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে পুলিষ অনুসন্ধান চলিতেছে।

শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতিকল্পে স্থানীয় "তমলুক সেবক সঙ্ঘ" এই পরগণার একটি বিশিষ্ট বালিকা ও একটী নৈশ বিদ্যালয়কে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিবেন ও শ্রেষ্ঠ তন্তুবায়, ফ্লাইলুম পরিচালক ও উৎকৃষ্ট সূত্রোৎপাদককে তিনটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন!

ফ্রান্স গর্জিয়া উঠিয়াছেন। আবার বা ফ্রান্স জার্ম্মানে যুদ্ধ বাধে!

ভারতে জাতীয় বিদ্যালয় সংখ্যা ও তাহাদের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১১৮৯ ও ৭৮৪৯২; তন্মধ্যে বাঙ্গলায় ১১৬টী জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১০২২৬।

১৯২১।২২ সালে ডাক ও টেলিগ্রাম বিভাগের আয় গত বৎসর অপেক্ষা কমিয়াছে।

তমলুকের পাদরী মহাত্মারা বৌ চুরির দায়ে পড়িয়াছেন, তদন্ত চলিতেছে!

শোক-সংবাদ।

গত ১৯শে পৌষ ৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী মাত্র ৫৪বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি ধর্ম্মের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় মুখরিত এবং তাঁহার উপন্যাসগুলি মনতত্ত্বের ও ধর্ম্মের ধারায় অভিষিক্ত। তাঁহার অভাবে বঙ্গ সাহিত্যের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য। আমরা নিজেই সন্তপ্ত, কি বলিয়া শান্তনা দিব?

কবিন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ২৫শে পৌষ পর-পারের যাত্রী হইলেন। তিনি একজন উচ্চাঙ্গের লেখক ছিলেন। ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার পূণ্য আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

শৈশব-সহচরী প্রভৃতি প্রণেতা উপন্যাস সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। আমরা তাঁহার সন্তপ্ত পরিজনের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি।

"শোভনা"

[প্রথম বর্ষ] [চতুর্থ সংখ্যা]

১৩২৯ ফাল্গুন

এ কি শিক্ষা ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা শিখাল তোমায়
জ্ঞানদাতা গুরু-ঋণ
শোধ অর্থে— শিক্ষাদীন
যবে শিষ্য, নষ্টমান প্রনমিলে তাঁয়।
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা মোহিনী মায়ায়
ভুলাইল পিতামাতা,
ভুলাইল ভগ্নিভ্রাতা,
বসাল সবার ঊর্দ্ধে ক্ষুদ্র বালিকায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা শিল্প, ব্যবসায়
বিশ্বপ্রাণ— কৃষিধর্ম্মে
দিল ঘৃণা মর্ম্মে মর্ম্মে,
দিল পরপদলেহী দাসত্ব-দীক্ষায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা আত্ম প্রতিষ্ঠায়
নিল প্রাণ গণ্ডী মাঝে,
প্রতিভায় প্রতিকাজে,
দিল দীন ভাব— হীন দৃষ্টি গরিমায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা যেই শিক্ষা দিল দূরে, হায় !
দয়া ধর্ম্ম মায়া. ওরে
মানুষে পিশাচ করে
গড়িল রঞ্জিল বক্ষ ঘন কালিমায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা দিল জ্ঞান,হায় !
সে রাজনীতিজ্ঞ মস্ত
যে অসত্য বাকে্ দোস্ত,
রাজনীতি ! কি দুর্গতি তোমার ব্যাখ্যায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা এমনি তোমায়
গড়িল— বধির, অন্ধ,
মুখে লেপে পরছন্দ,
দেশের যা কিছু— মন্দ, স্বার্থ — সমুদায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?

এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা, হে ভ্রাতঃ ! তোমায়
রুমাল— সাহেব ঘাড়ে,
চেয়ারে, লেখনী করে,
ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান নিয়ে— গোলাম খানায় !
এ কি শিক্ষা ? কিবা ফল এহেন শিক্ষায় ?
এ কি শিক্ষা ? যেই শিক্ষা পরিলাম হায় !
উচ্চপদ— অহঙ্কার,
শুনিতেই যা— চমৎকার !
তাও চূর্ণ ইঙ্গক্ষেপে ইরম্মদ যায় !
এ কি শিক্ষা ? কিম্বা ফল এহেন শিক্ষায় ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস ।

বেদ ও বেদান্তের উৎপত্তি ।

—০************০—

তৃতীয়তঃ । ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত কার্য্যের বিচার করিয়া দেখিলে বেদ অপৌরুষেয় তাহা প্রতিপন্ন হইবে । যেমন পরমেশ্বর উদ্যানস্বরূপ এই ক্ষিতি । ইহাতে সকল প্রকারের উদ্ভিদ স্বতঃই উৎপন্ন হইতেছে । কতকগুলি অপুষ্প ও অফল । পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি সুগন্ধ কতক-গুলি দুর্গন্ধ এবং কতকগুলি নির্গন্ধ । ফলের মধ্যে কতক মধুর কতক তিক্ত কতক কটু, কতক কষায় এবং কতক বিষবৎ । বৃক্ষ গুল্ম লতাদির মধ্যে কতক কণ্টকযুক্ত কতক অকণ্টক কতক ওষধি ও কতক ওষধির মধ্যে কতক শরীর পোষক কতক অপোষক ইত্যাদি অসংখ্য পদার্থ সততই পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে । কিন্তু কোন অবস্থায় কি প্রকারে ব্যবহার কিম্বা পরিবর্জ্জন করিতে হইবে তাহার পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে । বেদেও সেই প্রকার ভাল মন্দ সমস্ত বিষয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । উহার কোনটী কিরূপ ব্যবহার্য্য এবং কোনটী পরিত্যজ্য তাহার ব্যবস্থা পৃথক । ক্ষিত্যাদি পদার্থ সম্বন্ধে যেমন অব্যবস্থা পূর্ব্বক কোন পদার্থই গৃহীত হয় না তাদৃশ বেদেও

ব্যবস্থা বিরহিত হইয়া কোন বিষয়েরই গ্রহণ করা হয় না। ইহাদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বেদ মনুষ্যকৃত নহে। পৌরুষেয় হইলে এপ্রকার হইত না। মনুষ্যকৃত উদ্যানে কেবল কর্ত্তার অভিপ্সিত শোভন পত্রপুষ্প-তরুলতাদি অথবা সুরসরসালাদি বৃক্ষ থাকিবে। কিন্তু সকল লোকের কিম্বা সকল প্রাণীর ঈপ্সিত সকল পদার্থ থাকিবেনা। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম কার্য্যের এই প্রভেদ।

চতুর্থতঃ। বেদে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ঐসকল শব্দের অন্বয়-মুখে যেরূপ যোজনা আছে তাদৃশ শব্দ ব্যবহার কিম্বা তাদৃশ শব্দার্থ-সম্বন্ধে অন্বয়-মুখে যোজনা করিবার শক্তি কোন মনুষ্যের নাই।

বর্ত্তমান কল্পের বেদোৎপত্তিকাল ১৯৬০৮৫২৯৭৬ বৎসর। এই বিপুল কালের মধ্যে কোন মহর্ষি বা কোন অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি বেদমন্ত্রের ন্যায় একটী মন্ত্রওরচনা করিতে পারেন নাই ইহার বেদের অপৌরুষেয়ত্বের দৃঢ় প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে।

বেদ পরমেশ্বরের জ্ঞানস্থ সুতরাং উহা নিত্য। পরমেশ্বর নিত্য তাঁহার জ্ঞান নিত্য কাজে কাজেই তজ্জ্ঞানস্থ শব্দরাশি স্বরূপ বেদও নিত্য। এইরূপ লক্ষণে যে বিপ্রতিপত্তি এই শব্দ অনিত্য প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে লয়। তাহাহইলে শব্দের অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয় নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু এটী হেত্বাভাস প্রকৃত হেতু নহে। শব্দের উচ্চারণ-পর্য্যায় লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু নিত্যত্ব সম্বন্ধে নহে। যথা "গৌঃ" শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ গ কারের উৎপত্তি-স্থিত ও লয় পরে ঔকারের উৎপত্তি-স্থিতি লয় তৎপরে বিসর্জনীয়ের উৎপত্তি-স্থিতি ও লয় হইবে। এই পর্য্যায়ে সমুহ শব্দই উচ্চারিত হইবে। এই উচ্চারণ প্রকারের সহিত নিত্যত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ "গৌঃ" শব্দ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা-হইলে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। যে নষ্ট হইয়া যায় সেত বোধ জন্মাইতে পারে না। এই নিমিত্ত কোন শব্দই নষ্ট হইতে পারে না! সমস্ত শব্দই অখণ্ড ও একরস বাহী। উচ্চারণ কালে অভিব্যক্ত হয় অনুচ্চারণ কালে

হয় না। "গৌ" শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে অগ্রে বুদ্ধিতে তাহার ভাণ হয়, পরে মুখ নাশিকাদির অভিঘাত জন্য তাহার অভিব্যক্তি হয়। যদি শব্দ অনিত্য হইত তাহাহইলে বুদ্ধিতে উহার ভাণ হইত না বা উহাদ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা অথবা আবাহমান কাল হইতে এক শব্দ, এক প্রকারে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইত না অবশ্যই পৃথক হইত। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে পরমেশ্বরের জ্ঞানস্থ শব্দ নিত্য ও সনাতন এবং আমাদিগের জ্ঞানস্থ শব্দ অনিত্য কারণ সদাকালে তাহার ভাণ হয়না। কিন্তু শব্দই অখণ্ড সনাতন ও একরসবাহী।

অতএব যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। পরমেশ্বরের শক্তি ও গুণ তাঁহার সহিত নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বর বা পরমেশ্বর "স্বয়ম্ভু" সুতরাং তাঁহার আদি, অন্ত, জন্ম, বা ক্ষয় নাই। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বত্রবিদ্যমানত্ব, দয়া, ন্যায়, নিরপেক্ষতা, এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহাতে অনাদিভাবে নিত্য বর্ত্তমান। বেদশাস্ত্র ভগবানের জ্ঞানের বিকাশ মাত্র। তিনি জগতে কল্যান কামনায় লোকশিক্ষার নিমিত্ত যে জ্ঞানমহিমা প্রকটিত করিয়াছেন তাহারই সমষ্টি মাত্র বেদশাস্ত্র। পরমেশ্বরকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাঁহার জ্ঞানকেও অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। বাক্যগুলি জ্ঞানের প্রকাশজনক শব্দ মাত্র। ব্রহ্মবাক্য ও সুতরাং অনাদি। তাহাহইলেই বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য অনাদি বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং বেদে যাহা আছে তাহা মানব কল্পিত বলিয়া উল্লেখ করিতে সাহসী হইতে পারে।

—*********—

শ্রীগিরশচন্দ্র বেদতীর্থ।

কৃত কর্ম্মের পুরস্কার।

গোপন কর্‌লে পরের মন্দ
কোথা হতে বেরিয়ে পড়ে,
শুভ্র নামে পড়ে কালি,
স্বভাব পরে যায় বিগড়ে।
ধন দেখিয়ে করলে দম্ভ
নিজে খর্ব্ব করা হয়,
মিত্রও তাতে উঠে রুখে,
তাও কখনো শুভের নয়?
অন্যের গায়ে একটু ধুলো
দেখে বিদ্রূপ করতে গেলে
নিজের গায়ের মুখের মলা
উপহাসাস্পদ করে তুলে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

— ০ —

আত্মারাম।

প্রভু! মুখে তোমায় ডাকি বটে,
ডাকি নাকো ডাকার মত।
তুমি আগে পাছে সদাই থাক
দেখেও তবু চিনিনা ত॥
প্রভু! কোন রূপেই বা চিনবো তোমায়,
তুমিই জানো তোমার স্বরূপ।
তুমিই হয়ত তোমার ধ্যানে,
মগ্ন থাকছে বিশ্বরূপ!
সকল জীবের অধিকারী,
তুমিইত হে আত্মারাম!
তুমি অভেদ, নাই ভেদাভেদ,
কালী-কৃষ্ণ শিব-রাম।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

অনুপমা।

—******—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রী অনিলকুমার রায়ের কথা।

প্রায় মাসাধিক কাল হইল নন্দকিশোর বাবুর বাড়ীতে যাই নাই, তাই আজ কলেজ হইতে আসিয়া একবার তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্ত বাহির হইয়া পড়িলাম। এক ঘন্টার পথ পায়ে হাঁটিয়া যখন প্রায় তাঁহাদের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিলাম, তখন দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে; রাস্তার দুই পার্শ্বে গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নন্দকিশোর বাবুর বহির্বাটিতে আসিয়া দেখিলাম তাঁহাদের অফিস রুমে ধীরেন বাবু উপবিষ্ট আছেন, নিকটে নন্দ বাবু অন্ত একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেছেন।

রুমখানি ছোট হইলেও পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে সজ্জিত। রুমটীর মধ্যস্থলে একখানি বড় টেবিল ও চতুর্দ্দিকে কয়েকখানি গদি আঁটা কৌচ ও চেয়ার। দেওয়ালে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর অয়েল-পেণ্টিং ও ওয়াটার-পেণ্টিং ছবি এবং একটী বড় ঘড়ি আবদ্ধ রহিয়াছে। রুমখানির জানালা ও দরজায় রঞ্জিন পর্দ্দা ঝুলান। কতকগুলি আলমারীতে সুন্দর বাঁধান পুস্তক শোভা পাইতেছে, আর কতকগুলি আলমারী ঔষধ ও যন্ত্রাদিতে পূর্ণ রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে একটী বৈদ্যুতিক পাখা ও একটি বৈদ্যুতিক আলো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

গৃহমধ্যে ঢুকিয়াই আমি নন্দ বাবু ও ধীরেন বাবুকে প্রণাম করিলাম। তারপর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। নন্দ বাবু সহসা গৃহমধ্যে উঠিয়া গেলেন। ক্ষণপরে আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আসুন আপনারা একবার ভিতরে, সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা করেছি মাত্র।"

আমরা তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না, অগত্যা উঠিতে হইল। আমরা তাঁহার সহিত তাঁহাদের গৃহের এক অংশে প্রবেশ

করিয়া দেখিলাম, মেজের উপর কয়েকখানি রেকাবে প্রচুর আহার্য্য রহিয়াছে। আমরা কিছু কিছু গ্রহণ করিলাম। আহারান্তে আমরা অফিস রুমে আসিয়া বসিলাম। তারপর সামাজিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নানা বিষয়ের আলোচনায় রাত্রি অধিক হওয়ায়, ধীরেন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও গাত্রোত্থান করিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া নন্দ বাবু কহিলেন, "অনিল, বাবা একটু বোস, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি আমার হাত দুইখানি ধরিয়া কহিলেন, "বাবা, এ মাসে যতীনের সঙ্গে অনুর বিয়ে দিব স্থির করেছি। তুমি জান ছেলেটী খুব বিনয়ী ও চরিত্রবান। তুমি যদি আত্মীয়ভাবে এ বিবাহের সমস্ত আয়োজন কর তা'হলে বড় সুখী হই। দেখ বাবা, তোমরা ভিন্ন আমার আর আপনার বলতে কেউ নাই।"

এই অপ্রত্যাশিত বাণী শ্রবন করিয়া আমার হৃদয়-গ্রন্থি টুটিয়া গেল। এতদিন যে সন্দেহকে ভিত্তিহীন বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা বদ্ধমূল হইল। বহুদিনের বর্দ্ধিত আশালতাখানি হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া তাঁহার প্রশ্নের বহুকষ্টে একটা উত্তর দিলাম। তখন যেন আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া আসিতেছিল। আমার বুকের ভিতর একটা দারুণ ব্যথার পাহাড় স্তূপীকৃত হইয়া আসিতেছিল। চোখের সম্মুখে বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। আমি ত্বরিৎ পদে সেস্থান ত্যাগ করিলাম। বারান্দা পার হইয়া দেখি, অনুপমা আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেই সে আমার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল "অনিল বাবু আমার ত কোন দোষ নাই।"

দোষাদোষ বিচার করিবার শক্তি বোধ হয় তখন আমার আদৌ ছিলনা। আমি সযোরে আমার হাত ছিনাইয়া লইলাম। সে কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। কহিলাম, কাঁদো! সংসারে কাঁদো

এইত সবে ক্রন্দনের স্থচনা! কে জানে কোথায় এর সমাপ্তি।
আর দাঁড়াইলাম না। দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। একটা অদৃশ্য শক্তি নিৰ্জ্জীব পুত্তলিকার স্থায় আমাকে চালিত করিতে লাগিল। একটা আকস্মিক উত্তেজনা ও মানষিক চঞ্চলতায় দগ্ধ হইতে হইতে আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলাম। যখন চেতনা হইল দেখিলাম আমি আমার মেশ পারাইয়া প্রায় তিনক্রোশ দূরে পৌঁছিয়াছি। রাজপথে জনস্রোত একবারে বন্ধ হইয়াগিয়াছে। পাহারাওয়ালা স্বস্ব স্থানে দাঁড়াইয়া ঢুলিতেছে। গ্যাসের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিতে একটু অধিক বেলা হইল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া রোমিও জুলিয়েট খুলিয়া বসিলাম, কিন্তু তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। সম্মুখে টেবিলের উপর "ভারতভ্রমণ" খানা পড়িয়াছিল, সেইখানা টানিয়া লইয়া দেখিতেছি, এমন সময় পিওন আসিয়া আমার হাতে একখানি চিঠি দিল। পড়িয়া দেখিলাম, মা বাড়ী যাইবার জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন। ভাবিলাম একবার বাড়ী যাইব, পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মনকে যদি কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতে পারি!

পরদিন সাতটার সময় শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছিয়া থার্ড ক্লাশের একখানা টিকিট কিনিলাম। সেদিন গাড়িতে ভয়ানক ভিড়। অনেক কষ্টে একটা কামরায় ঢুকিয়া খানিকটা যায়গা দখল করিয়া লইলাম। ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বাষ্পীয় শকট আমাদিগকে বহন করিয়া উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আগরপাড়া ষ্টেসনে থামিল। কেহ কেহ নামিয়া গেল। আবার কেহ কেহ তাহাদের স্থান পূরণ করিতে লাগিল। তারপর গার্ড আবার হুইসিল দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। বেঞ্চের এক পাশে শুইয়া পড়িতেই কখন ঘুম ধরিয়া গিয়াছিল জানিনা। যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখিলাম, গাড়ী থামিয়াছে। কুলী হাঁকিয়া যাইতেছে,— নৈহাটী। কয়েক মিনিট গাড়ী

নৈহাটী ষ্টেসনে থামিয়া আবার ধীরে ধীরে প্লাটফরম ত্যাগ করিতে লাগিল। আমি আবার শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। পূর্ব্ব দিনের ঘটনাগুলা প্রাণের মাঝে জাগিয়া প্রাণটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমি ব্যাগ হইতে একখানা বই বাহির করিয়া খুলিয়া বসিলাম। কিন্তু সেই বিগত রজনীর জালাময় ঘটনাটা মনের মাঝে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল যে ছাপার অক্ষরগুলা আমার চোখে ধোঁয়ার মত দেখা যাইতে লাগিল। আমি বইখানা মুদিয়া রাখিলাম। তারপর হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনকে কেবল এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিলাম।— মন! এমন দুরাশা ত্যাগ কর। তুমি যে পক্ষহীন, তোমার আকাশে উড়া অসম্ভব। নন্দন কাননে তোমার কোন অধিকার নাই, তুমি পারিজাত-কুসুম চাও কেমন করিয়া? তুমি যখন সর্পের দংশন সহিতে পার না, তখন তাহার ফণীর মণি আশা কর কেমন করিয়া? তুমি মর্ত্তের জীব, স্বর্গের চাঁদ ধরা যে তোমার পক্ষে অসম্ভব। না,— আর মুহূর্ত্তকালও এমন দুরাশাকে হৃদয়ে পোষণ করিও না।

ঠিক এমন সময় ট্রেন রাণাঘাটে পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলাম। টিকিট কলেক্টর আসিয়া টিকিটের জন্য হাত বাড়াইল। আমার টিকিটখানি প্রদান করিলাম। তারপর একজন মুটে ডাকিয়া তাহার মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলিয়া দিলাম।

বেলা চারিটার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইলাম। সংসারে মা ভিন্ন আমার আর কেহই ছিলনা। আজ দশ বৎসর হইল পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। আমাদের সংসারে একজন চাকর, একজন চাকরাণী আর আমার লক্ষ্মী-স্বরূপিনী মা থাকেন।

মায়ের স্নেহ, আদর এবং যত্নের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া বেশ শান্তিতে একটা মাস কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম অনুপমার স্মৃতি মনের মাঝে জাগিয়া হৃৎপিণ্ডটা দলিয়া পিষিয়া যাইত, ক্রমে যতই দিনগুলা চলিয়া

যাইতে লাগিল, ততই তাহার স্মৃতি ম্লান হইতে লাগিল। ক্রমে আমি তাহাকে ভুলিতে লাগিলাম।

এক মাস কাল বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। একদিন মেশে বসিয়া একখানা বাঙ্গলা সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতে, শোক-সংবাদ এর কলমে দেখিতে পাইলাম,—

"ধার্ম্মিক, বিনয়ী ও দরিদ্র-বন্ধু ৮নন্দকিশোর মিত্র মহাশয় গত ৬ই আষাঢ় শুক্রবার দিবস, অমরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বাল্য-জীবনী বড়ই দুঃখপূর্ণ। অতি শৈশবে মাতৃপিতৃ-হীন হইয়া তিনি তাঁহার এক সহধ্যায়ী বন্ধুর সাহায্যে অধ্যয়ন করিতে থাকেন, ক্রমে স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল, এম, এস, উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার শোক-সন্তপ্ত একমাত্র কন্যাকে শান্তনা প্রদান করুন!"

নন্দকিশোর-বাবু আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার এই মৃত্যু সংবাদে আমি প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইলাম। পরদিন তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, বাড়ী বহির্দ্দিক হইতে তালাবদ্ধ!

আমি অপলক নেত্রে সেই চিরপরিচিত বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অতীত দিনের কতই সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এই সেই বাড়ী— এইখানেই অনুপমা তার কলকণ্ঠের সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা ঢালিয়া আমার শ্রবন জুড়াইত! এইখানেই কতদিন নির্জ্জনে অনুপমাকে প্রাণের ব্যথা জানাইয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের একটা মধুর ঘটনা মনে পড়িল। একদিন নীরব সন্ধ্যায় আমি অনুপমার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া আবেগপূর্ণস্বরে কহিয়াছিলাম, "সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস অনু?" প্রত্যুত্তরে সে সোহাগভরে আমার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িয়া চোখের জলে আমার বুক ভাসাইয়াছিল। প্রেমের প্রবল বন্যা সেদিন আমারও প্রাণের বাঁধ ভাসাইয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

তুমি !

তুমি প্রভাতের অরুণ-কিরণ,
উষার স্নিগ্ধ ছবি,
তুমি দুপুরের তপ্ত সমীর,
সন্ধ্যা-করুণ রবি;
তুমি বরষার জলদ-জালে
আকাশ কর কালো;
তুমি শরতের বিমল ছটায়
জগৎ কর আলো,
তুমি বসন্তের তরু লতায়
দেখাও তোমার শোভা,
তুমি কুসুমের কোমল প্রাণে—
ফোটাও তোমার বিভা;
তুমি বিতরিয়া রজত কিরণ—
সাজাও শারদ-শশী,
তুমি ঢেকে দাও সন্ধ্যা বধূর—
আকাশ-ভরা হাসি;
তাই নেহারিয়া সদা তব—
বিশ্ব রঙ্গের খেলা,
শুধু মনে জাগে- তুমিই প্রভো !
ভব-পারের ভেলা;
তাই হৃদিমাঝে জাগিয়েছি গো,
তোমার স্মৃতি খানি,
শুধু পাব বলে প্রভো ! তোমার—
চরণ-পরশ-মণি !

——

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী সিংহ।

কৃপণের পরিণাম।

—০*******০—

স্বামী কোন খাতকের বাড়ী যাইবেন বলিয়া সকাল সকাল স্নানে গিয়াছেন, কারণ তখন রৌদ্রের দিন— একটু ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়াই ভাল; কি জানি আসিতে যদি অধিক বেলা হয়! এই অবসরে ফুল্লরা স্বামীর জন্য কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন। স্বামী মাধব চন্দ্র রায় স্নান সমাপন করিয়া আসিলে ফুল্লরা আহার্য্য আনিয়া সম্মুখে ধরিল। অসময়ে সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া রায় মহাশয় একবারে চটিয়া লাল হইয়া গেলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

ইস্ এত খাবার! তোরা দেখ্‌ছি আমায় একদিনে ফকির করবি! এই রাত্রিতে খেয়েছি, তারপর এখন ধোর এক ঘণ্টা বেলা হয়েছে, এরি মধ্যে আবার এত খাবার! আমি শালা খাতকদের কাছে একটা আধ পয়সার জন্য সারাদিন মাথা ব্যথা করি, আর ওঁরা কিনা পয়সা-গুলো দেদার জলের মত উড়ান! যা,— যা,— ওসব এখন নিয়ে যা। আজ আর রান্না টান্না করে কাজ নেই, ওতেই এবেলা চলে যাবে।

ফুল্লরা— তুমি না হরিপুর গ্রামের একজন জমিদার? একবারের বেশী দুবার খেলে তোমার জমিদারী উড়ে যাবে? এই আমি নাকে কানে খত দিচ্ছি, আর কখনও এমন কাজ করব না।

না গিন্নি রাগ কোরনা, আমি যে এত টানাটানি করি সে সব কার জন্য? এ সব তোমাদেরই জন্য। এই দেখনা ছেলেটার জন্য কি না কি কর্‌ছি, যে যা বলছে তাই কর্‌ছি। ডাক্তার কবিরাজ বৈদ্য কত কত পয়সাই না মেরে নিয়ে গেল। তবু ছেলেটা যেইকে সেই। আজ মাথাধরা, কাল পেটের অসুখ, এই করেই জ্বালালে। আর পারিনা বাবা, পয়সা ত গাছে ফলেনা, যে পেড়ে আনলেই হল!

ও আমার পোড়া কপাল! দুটো নয়, দশটা নয়, সবে মাত্র একটা ছেলে, তার জন্য কিছু খরচ কর্ত্তেও এত কাতর!

এই বলিয়া গিন্নি রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রায় মহাশয়ও আপদটা দূরে গেল ভাবিয়া, দুর্গানাম করিতে করিতে খাতকের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

(খ)

বেলা দশটার সময় মৃগেন বাবু, পুলিন বাবু, নৃপেন বাবু ও গ্রামের আরও কয়েকজন শিক্ষিত যুবক একত্র মিলিত হইয়াছেন। ইহাঁরা সম্প্রতি "স্বদেশ-সেবক-সম্মিলনী" নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন; সমিতির কার্য্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ও সেই অর্থ দেশের কার্য্যে ব্যয় করা।

সকলে সমবেত হইলে নৃপেন বাবু কহিলেন,—
আজ একবার দুর্গাপুর গ্রামে চাঁদা সংগ্রহে গেলে হয় না?
মৃগেন — না, আজ আর চাঁদা সংগ্রহে কাজ নাই। এ সপ্তাহে যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহা কি কি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে আজ তাহার একটা যুক্তি করা হউক।

তখন সকলে মিলিয়া দেশের যে যে অভাবগুলি সর্ব্বাগ্রে পূরণ না করিলে চলিবেনা তাহাই দেখিলেন! তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিলেন ১১৩২ ৮৵ জমা আছে, পরন্তু আবশ্যকীয় অভাবগুলি পূরণ করিতে হইলে অনুমান ১৫০০্ টাকা প্রয়োজন। সুতরাং এক্ষণে অবশিষ্ট টাকা তুলিতে হইতেছে। তখন পুলিন বাবু কহিলেন—
আচ্ছা, হরিপুর গ্রামের মাধব চন্দ্র রায়ের কাছে আর একবার চলুন না।
মৃগেন— আপনারা যান মশায়, আমি আর সেখানে যেতে পারবো না। বেটা কতবারই না ফিরাল। তারপর যদিও দেখা দিল, বলে কিনা— এক পয়সাও দোব না। আর আমরা নাকি এই পয়সা নিয়ে ভোগ করব। না দেওয়ারই ফন্দি যত সব।
পুলিন— তাইত নৃপেন বাবু, লোকটা কি কৃপণ বলুন ত? একটা পয়সা দেশের কাজে ছোঁয়াল না; অথচ টাকা বস্তাবন্দি করে রেখেছে।
নৃপেন— লোকটা যেরূপ চামার তাতে দেখ্‌ছি ওর কাছে ভাল মানুষের মত কিছু চাইলে পাবার যোটী নাই। আমি বলি, অন্য কোন উপায়

খাটালে কিছু বাগান যেত।

পুলিন— হাঁ সে একরকম মন্দ যুক্তি নয়। তবে কি উপায় করা যায় বলুন দেখি!

নৃপেন— সে উপায় আমি অনেকদিন থেকে করে রেখেছি।

সকলে সাগ্রহে সমস্বরে কহিলেন,—

আচ্ছা, কি উপায় ঠাওরেছেন বলুন ত?

নৃপেন— না, এখন সে কথা আপনাদের শোনে কাজ নেই। আগেত কার্য্যোদ্ধার হোক, তারপর শুনবেন।

(গ)

একদিন হরিপুর গ্রামের রায় মহাশয়ের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী দেখা দিলেন। সন্ন্যাসীর মাথায় জটাজাল, পরিধানে রক্তবস্ত্র। ললাটে দীর্ঘ তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষ, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপিত। এক হস্তে কমণ্ডলু, অন্য হস্তে লৌহ-নির্ম্মিত চিমটা। এই সন্ন্যাসী আজ ৫।৬ দিন নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া হরিপুর গ্রামের জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইনি ভূত গণনা করেন, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাধি আরোগ্য করেন ও দৈব ঔষধাদি প্রদান করেন! ইহাঁর আশ্চর্য্য শক্তির কথা রায় মহাশয়ের কানে গেল। তিনি একমাত্র পুত্র (যাহার বারমাস জ্বর, জাড়, মাথাধরা ইত্যাদি লাগিয়া আছে) মণিভূষণকে এই সন্ন্যাসীর দ্বারা চিকিৎসা করিতে মনস্থ করিলেন। কারণ সন্ন্যাসীকে এক পয়সাও দিতে হয়না। কেবল হরিঠাকুরের জন্য একটা শুপারী আর ৫ টা পয়সা মাত্র তুলিয়া রাখিতে হয়। তাও আবার ব্যারাম ভাল হইলে দিতে হয়। এমন সুবর্ণ সুযোগ রায় মহাশয় ছাড়িলেন না। স্বয়ং সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া (কারণ তাঁহার চাকর নফর ইত্যাদি কেহই ছিলনা) তাঁহাকে আজ গৃহে আনিয়াছেন।

সন্ন্যাসী মণিভূষণের হাত দেখিয়া কহিলেন,—

এই বালকের ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর। এক্ষণে হোম না করিলে ইহাতে কি করা কর্ত্তব্য আমি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

হোম দ্বারা মহাদেবের আহ্বান করিলে তিনি প্রত্যাদেশ করিবেন।

রায় মহাশয় দেখিলেন পাঁচ পয়সার যায়গায় শ পাঁচ আনা লাগিতেছে। কি করিবেন, গৃহিনীর জ্বালায় অগত্যা সম্মত হইলেন।

শুভক্ষণে হোম আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী যথারীতি দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া হোম সমাপন করিলেন। হোম সমাপিত হইলে তিনি স্বীয় উত্তরীয়ের মধ্য হইতে একখণ্ড সাদা কাগজ বাহির করিয়া তাহা রায় মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিলেন,—

দেখুন ইহার উভয় পৃষ্ঠা সাদা কি না?

রায় মহাশয় দেখিলেন, কাগজটী যথার্থই সাদা,— তাহার কোন পৃষ্ঠায় কিছুই লিখা নাই। তারপর সন্ন্যাসী সেই কাগজটী হোম-শিখার উত্তাপে ধরিতেই দেখা গেল তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখা আছে—

"যদি এই বালকের কোন অবিভাবক দেশের কার্য্যে দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন. তাহাহইলে এই বালক নিরোগ হইতে পারে। নতুবা এই কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রে এই বালকের মৃত্যু অনিবার্য্য।"

সন্ন্যাসী রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

এই দেখুন, দেবাদিদেব মহাদেব হোমে তুষ্ট হইয়া আপনার পুত্রের আরোগ্যের উপায় নির্দ্ধারন করিয়া দিয়াছেন।

রায় মহাশয় কাগজখানি দেখিয়া প্রথমতঃ স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তারপর সন্ন্যাসীর অদ্ভূত ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষনাৎ "স্বদেশ-সেবক সম্মিলনী"র সভ্যগণকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের হস্তে নগদ দুই হাজার টাকা গনিয়া দিয়া কহিলেন,—

দেখো বাবারা, আমার এই টাকাগুলি যেন শুধু দেশের কাজেই খরচ করা হয়।

(ঘ)

পুলিন— বলিহারী আপনার বুদ্ধিকে, নৃপেন বাবু! আপনি আজথেকে

গোয়েন্দাগিরিই করুন। বেশ পারবেন আপনি। এই দেখুন না, সেদিন মাধব রায়ের বাড়ীতে কেমন খাসা এক সন্ন্যাস সেজে দেখা দিলেন। অপরে ত দূরের কথা, আমরাই আপনায় চিন্‌তে পারিনি।

মৃগেন— হাঁ নৃপেন বাবু, আপনি যদি ছদ্মবেশে এই হরি গোয়ালাটার খুনের একটা কিনারা করতে পারতেন, তাহলে গরীব বেচারী বেঁচে যেত। দারোগা মশায়কে ত আর ঘুস যোগাতে পারেনা! বাস্তবাড়ীটী পর্য্যন্ত বিক্রি করে তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করেছে, তবুও কাজের কিছু হোল্‌না। সে যা হোক আপনার সেদিনকার সে সাদা কাগজটা আগুনে ধরতে তাতে এতগুলো লেখা দেখা গেল কি করে?

নৃপেন— এ অতি সামান্য কথা। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আমি পূর্ব্ব হতেই সাদা কাগজে গোড়া নেবুর রস দিয়া ঐ কথাগুলা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ রসে সাদা কাগজে কিছু লিখিয়া দেখিলে কিছু দেখা যায়না, কিন্তু কাগজটী অগ্নির উত্তাপে ধরিলেই অক্ষরগুলা স্পষ্ট দেখা যায়! ইহা আমার জানা ছিল, তাই এই উপায়েই কার্য্যোদ্ধার করিয়াছি।

তখন সকলে নৃপেন বাবুর ভূয়সী প্রসংসা করিতে লাগিলেন।

* * * * * এমন সময় রায় মহাশয় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয় যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দেশের কার্য্যে ব্যয় করা হইল কি না জানিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বারান্দায় আসিয়া শুনিলেন, ভিতরে তাঁহারই বিষয় আলোচিত হইতেছে তিনি স্থিরকর্ণে কথাবার্ত্তা সমস্ত শ্রবণ করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, এ ভণ্ড সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তখন তিনি বেগে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

হায়! কৃপণের পরিণাম এইরূপই বটে!

তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ভূতলে পতিত হইল।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

দোল পূর্ণিমা।

ফাল্গুন পূর্ণিমা পুনঃ এল কিরে ফিরে ?
যেদিন শ্যামের বাঁশী
পঞ্চম তানেতে মিশি
বাজিত মধুর স্বরে যমুনার তীরে !
ফাল্গুন পূর্ণিমা পুনঃ এল কিরে ফিরে ?

যে দিনে মলয় বায়
আবির মাখিয়া গায়,
নির্ম্মল শ্যামকায় চুমিতরে ধীরে।
ফাল্গুন পূর্ণিমা পুনঃ এল কিরে ফিরে ?

কোকিল সোহাগ ভরে,
ভ্রমর প্রসূন পরে,
গাহিত যে দোল-লীলা মধুর ঝঙ্কারে।
ফাল্গুন পূর্ণিমা পুনঃ এল কিরে ফিরে ?

কি সুন্দর শিখিচূড়া
শ্যামকায় পিতধড়া
কৌস্তুভ রতনমালা রঞ্জিত আবিরে।
ফাল্গুন পূর্ণিমা পুনঃ এল কিরে ফিরে ?

কভু বা আপনি হরি
করে লয়ে পিচকারী
রাখাল বালক সনে খেলিত আদরে।
ফাল্গুন পূর্ণিমা পুনঃ এল কিরে ফিরে ?

শ্রীভূদেবচন্দ্র পণ্ডা।

নিভৃত চিন্তা।

সংসার-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া নীরবে, নির্জ্জনে বসিয়া, প্রাণের দ্বার খুলিয়া যখন আমি তোমারি বিষয় চিন্তা করি — তখন আমি আত্মহারা হইয়া যাই। অসীম অতল চিন্তা-জলধীর প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এক মধুর কল্পনার রাজ্যে উপস্থিত হই। সেখানে তোমার কত মহান কীর্ত্তি অবলোকন করি। প্রত্যেক বস্তুতে তোমারি রূপের মাধুরী নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। তোমারি পূর্ণ জ্যোতি শত কোটী চন্দ্র সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মির উপর বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ... ... এক বিন্দু জলের উপর যেমন বিরাট সূর্য্যের বিশ্ব-ব্যাপী আলোক প্রতিফলিত হয়, তেমনি— আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপর তোমারি জ্যোতির বিকাশ হয়। ভাবিতে পারিনা, পৃথিবী হইতে কত দূরে স্থানলাভ করি! হে মহিমাময় জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ! আমি চিরদিন তোমার ওই রূপের সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই। প্রাণ আমার তোমারই নামে মোহিত হইতে চায়। হে করুণাময়! কেন তুমি আমার এ সংসারের কোলাহলে রাখিতে চাও, পাপের স্রোতে ভাসাইতে চাও, সংসার-মরুভূমে আমার জীবন-তরু দগ্ধ করিতে চাও? করুণাময়! আমার হৃদয়-মরুভূমিতে তোমার শান্ত শীতল প্রেমসুধা বর্ষণ করিয়া সুশীতল করিয়া দাও। হে আমার হৃদয়ের বল, প্রাণের সাধনা, সংসারের কামনা, আমাকে তোমাময় করিয়া রাখ!

শেখ মহিউদ্দিন আহম্মদ।

কৃষি।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রধান জীবিকা কৃষি, কিন্তু আজকাল সকল সমাজেই কৃষি যেন একটা ঘৃণার কাজ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজেই এইরূপ হইয়াছে। যে শস্য শ্যামলা বাঙ্গলা কৃষির জন্য সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে বাঙ্গলা আজ কত নিম্নে! আমরা যদি কৃষির প্রতি পর পর এইরূপ অবহেলা করি, তাহাহইলে বাঙ্গলায় কৃষি আরও যে কত নিম্ন স্তরে আসিয়া পড়িবে তাহা ভাবিতে কষ্ট বোধ হয়। আজকাল আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে এরূপ কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাহারা চাষের কার্য্য করে তাহারা নীচ লোক বা ছোট লোক; আর যদি কোন উচ্চজাতির লোক ঐকাজ করে, তাহা হইলে সে সমাজে ঘৃণ্য ও পতিত হয়। কৃষি সম্বন্ধে যে দেশের ধারনা এইরূপ সে দেশের কৃষির অবনতির আর বাকি কি? এরূপ স্থলে আমরা বলিতে চাই যে, যিনি নিজের পরিশ্রমের দ্বারা নিজের জীবিকা চালাইবেন, তাঁহাকে আমরা প্রকৃত কর্ম্মী ও মানুষ বলিয়া স্বীকার করিব; আর যিনি পরের সঞ্চিত বা উপার্জ্জিত ধনে নিজে কেবল বসিয়া বসিয়া খাইবেন তিনি শিক্ষিত হউন বা মূর্খ হউন, আর ধনি হউন অথবা দরিদ্র হউন, আমরা তাহাকে ঘৃণা করিব! আজকাল এই কঠিন অন্ন সমাস্যার দিনে সকলের মনে ধারণা হইয়াছে যে, ছেলেকে বি, এ, এম, এ, পাশ করাইব, আর ছেলে চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে। এই কথা যদি প্রত্যেক লোকেরই ধারণা হইয়া থাকে, তবে এত চাকুরী জুটে কোথা হইতে? কত বি,এ, এম,এ পাশকরা লোক চাকুরীর জন্য "হাঃ অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু হায়! তাহারা কৃষি শিল্প বা বানিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে? কেরাণীর সংখ্যা আমাদের দেশে এতই বাড়িয়া চলিতেছে যে, ত্রিশ বত্রিশ টাকা বেতনে অনেক কেরাণী মিলে; কিন্তু চাষের সময় পনের ষোল টাকা বেতনেও

একজন লোক পাওয়া যায়না। আজকাল বাঙ্গলায় এরূপ দুর্ভিক্ষ হাহা-কারের রোল উঠিয়াছে, ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ কৃষির অবনতি। তবে অনেকে বলিবেন, পূর্ব্বতন বাঙ্গালায় এরূপ দুর্ভিক্ষ কি হইতনা, তার উত্তরে বলিতেছি যে পূর্ব্বে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে ২। ৩টী দুর্ভিক্ষ বা মহামারি হইত, কিন্তু আজকাল প্রতি বৎসর বাঙ্গলার কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী তাহার করাল কবল বিস্তার করিয়া বিদ্যমান আছেন। আমাদের দেশে কয়জন লোক বা পেট পুরিয়া আহার করিয়া থাকে? সেজন্য আমাদের দেশের লোকের কর্ম্মশক্তি পর পর হ্রাস পাইতেছে। অন্যান্য দেশের শ্রমজীবিরা এক-দিনে যে কাজ করে, সেই কাজ সম্পন্ন করিতে আমাদের দেশের শ্রমজীবির চার দিন লাগিবে।

আমাদের দেশের কৃষিকে উন্নত করিতেই হইবে। তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। কৃষির প্রতি আমাদের যে সকল কুসংস্কার আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। দেশের সমস্ত লোককে মনে করিতে হইবে, আমাদিগকে কৃষির উন্নতি করিতে হইবেই হইবে। যে কোন প্রকারের উন্নতি হউক না কেন, তাহা কোন জাতি বা দেশের উপর ন্যস্ত হইতে পারেনা। সমস্ত জাতি বা দেশের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়া চাই। উন্নতি কেবলমাত্র একটী সংগ্রাম, সংগ্রাম শব্দের অর্থ মনের আত্মবিকাশের চেষ্টা, অর্থাৎ মনের স্বাধীনতার বিকাশ; আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকেরই মনে যদি জাগে যে, আমাদের কৃষির অবনতি হইয়াছে; আর যদি তাহার সাড়া প্রকৃতই প্রাণের কন্দরে পৌঁছিয়া থাকে, তাহাহইলে সে চেষ্টা আত্মবিকাশের প্রয়াস পাইবেই পাইবে। আবার আমাদের কৃষি উন্নতিশীল হইবে, আবার বাঙ্গলার ক্ষেত শস্য শ্যামলা হইয়া উঠিবে, আবার বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে জাগিবে—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

শ্রীপ্রজাপতি জানা।

সেথায় ও হেথায়।

—০*০—

সেথায় নন্দন মাঝে
 পারিজাত ফুটে রয়,
হেথায় কণ্টক বনে
 গন্ধহীন ফুল হয়।
সেথায় আলোক জ্বালে
 ধাতার মুকুট-মণি,
হেথায় আঁধার নাশে
 কলঙ্কিত চাঁদখানি।
সেথা বয় মন্দাকিনী—
 নীর তার সুধাময়,
হেথা মরতের বুকে
 লবনাক্ত সিন্ধু বয়।
সেথা নারদের বীণা
 গায় সদা বিভু গান,
হেথা তুলে ক্ষুদ্র বাঁশি
 ছলনা-মাখান তান।
সেথায় অপ্সরা বালা
 উজল লাবণ্য ঢালে
হেথায় গগন তলে
 ক্ষীণপ্রভ তারা জ্বলে।
সেথা বায়ু শীত-স্নিগ্ধ
 মন্দার-সুরভি বয়,
হেথা নভঃ, ধরাতল
 গাত্রদাহী জ্বালাময়।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী

নরদেব।

—০*****০—

দেবতাকে ভক্তি করা উচিৎ, কিন্তু দেবতা কোথায় যে তাঁহাকে ভক্তি করিব? আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বর কোথায় যে তাঁহার উপাসনা করিব?

মনে মনে ঈশ্বরের দর্শন লাভের চেষ্টা করা যাউক। কই, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা মিলেনা। মিলিবেই বা কিরূপে? আমরা ঈশ্বর বলিলে যতদূর ধারণা করিতে পারি তদপেক্ষা তিনি অনেক উচ্চে?

শুনিতে পাই তিনি সর্ব্বশক্তিমান। বেশ, এক একটী শক্তি লইয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করা যাউক :—

ঈশ্বর পরম দয়ালু :— জীবের দুঃখ-দারিদ্র্য দর্শনে আমাদের একটু দয়ার উদ্রেকও হয় না! আমাদের মত লোকে আর দয়ার কতদূর ধারণা করিতে পারে?

ঈশ্বর ক্ষমার বিগ্রহ :— কোন লোক যদি আমার দু আনা দামের একটা জিনিষ চুরি করে আমি অমনি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাকে জেলে দিবার জন্য ব্যগ্র। আমাদের আর ক্ষমার উচ্চতম ধারণা কতদূর?

তিনি অশেষ শক্তিসম্পন্ন :— আমার সম্মুখে যদি অপর কেহ আমার শত্রুকে পরাজিত করে আমরা আনন্দ অনুভব করি। শত্রুতা ভুলিয়া শত্রুকে মিত্র জ্ঞানে বিপদে সাহায্য করিতে ছুটিয়া যাইতে পারি না। সামর্থ্যের ধারণা আমাদের আর কত উচ্চাঙ্গের হইতে পারে?

এইরূপে আমরা যাহা নিজে কখনও উপলব্ধি করি নাই তৎসম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান সম্বন্ধে ধারণা করিতে যতদূর চেষ্টা করিনা কেন প্রতিপদেই তৎসমুদায় বিফল হইবে।

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়া আমরা গোলকের ব্যবহার করি। আর উহাই ক্ষুদ্রাকারে পৃথিবীর স্বরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকি।

নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারনা করিবার জন্য সংসারে কি মাটীর পুতুল ভিন্ন আর কিছুই নাই ; প্রাণহীন মাটীর পুতুলকে দেবতা ভাবিয়া হিন্দুগণ পূজা করেন। আর তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। ইহা কেবল হিন্দুর আত্মবিশ্বাসের ফল, কিন্তু তাঁহাদেরই সম্মুখে অসংখ্য জীবন্ত দেবতা রহিয়াছেন। স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহারা হিন্দুর— হিন্দুর কেন বিশ্ববাসীর অবশ্য পূজ্য। (বলা বাহুল্য পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ আমার আলোচ্য নহে।)

এই সজীব দেবতা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণই। এই অবতারগণের জীবনচরিত্র সম্যক্ আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিবে যে মহাপুরুষগণই দেবতার প্রতিকৃতি। ইহাদিগের উপাসনা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিনা; আর এই উপাসনাই আমাদিগের হিতকর।

কেহ মনে করিতে পারেন মহাপুরুষগণ ত মানুষ, আমরাও মানুষ; তবে তাঁহারা উপাস্য কিসে?

আমরা সকলেই মানবরূপে জগতে আসিয়াছি সত্য কিন্তু আমরা আসিয়াছি বোধহীন জড়ের মত। আজন্ম যেন পথহারা পথিকের দল এখানে আসিয়া পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতেছি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহাই আমরা জানিনা। বুঝিতে চেষ্টা করি— বুঝিতে পারিনা। কাল যেটা ঠিক পথ ভাবিয়া ধরিয়াছিলাম আজ সেটা বিপথ ভাবিয়া ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু মহাপুরুষগণের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যাইবে যে, ইহাঁরা যখনই আসিয়াছেন, তখন হইতেই যেন তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন প্রণালী যেন সুনির্দ্দিষ্ট; বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবার উপায় নাই। আমরা তাঁহাদের ন্যায় "মানুষ" আখ্যা পাইয়াও এরূপে জীবনাতিপাত করিতে পারিনা। কারণ আমরা নর— তাঁহারা নরদেব। তাঁহারা আসেন জগৎপাতার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারই কোন বার্ত্তাবাহকরূপে। আর আমরা

সাধারণ মানব তাঁহাদের চরিত্র হইতে শিক্ষা লাভের নিমিত্তই আসিয়া থাকি। তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ— তাঁহাদের পদানুসরণ— তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য! তাঁহাদের উপাসনা করা ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিজ্ঞানে তাঁহাদের পূজা করা পুতুলপূজাপেক্ষা কোন অংশে হেয় নহে।

এই মহাপুরুষগণই মানবরূপে দেবতা— ইহাঁরাই বিশ্ব-মানবের উপাস্য "নরদেব"।

সাধারণ মানবের ও মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলী তুলনা করিয়াই তাঁহাদিগকে নরদেবজ্ঞানে— ভগবানের দ্বিতীয় বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্গীতা রূপ অমূল্য উপদেশমালায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিই ইহার প্রমাণ :—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

শ্রীবিহারীভূষণ সাঁতরা।

———•———

রত্নকণা।

যেখানে সৌজন্য সেইখানেই উচ্চ স্বভাব, যেখানে উচ্চ স্বভাব সেই-স্থানেই সৌজন্য, সৌজন্য এবং উচ্চ স্বভাব একই ব্যক্তিতে থাকে।

জাতীয় বিজ্ঞান।

উন্নত মনুষ্য আত্মানুসন্ধান করে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিই পরানুসন্ধানপ্রয়াসী।

কুংফুচ।

বনস্থিত ময়ূর এবং কোকিল হইতে কোন উপকার না জন্মিলেও তাহারা প্রিয়ত্ব হেতু সাধারণের প্রিয় হয়। (পুষ্পহার)

যখন আমরা একাকী থাকি তখন চিন্তার প্রতি, যখন পরিবারের মধ্যে থাকি তখন মেজাজের প্রতি এবং যখন সমাজের মধ্যে থাকি তখন জিহ্বার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (বামাবোধিনী)

আলোচনা।

বস্ত্রসমস্যা।— অন্নসমস্যার পরেই বস্ত্রসমস্যা। সুসভ্য মানবগণের অন্নসমস্যা হইতে বস্ত্রসমস্যা অত্যধিক কষ্টদায়ক ও লজ্জাজনক। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময় শুনাগিয়াছে অনেক নিঃসহায়া স্ত্রীলোক সামান্য একটু কৌপিন পরিমান বস্ত্রের অভাবে পর্ণকুটিরে শুকাইয়া মরিয়াছে।

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন বহুদিন পিঞ্জরে থাকিয়া এমনি অভ্যস্ত হয় যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও সে যেমন তাহাকে নিরাপদ করিবার জন্য আবার সেই খাঁচায় আসিয়া ঢুকে, তেমনই আমরা এমনি দাসত্ব মোহে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি যে, স্বাধীন জগতে আসিয়াও স্বাবলম্বী না হইয়া — নিজের ভাত কাপড় নিজেই সরল, স্বাধীনভাবে উপায় না করিয়া চাকুরীর মোহে বিভোর হই। পরাধীন জীবনকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত, সুখের নিরাপদের জীবন বলিয়া ভাবিয়া লই। ইহা হইতে আর পরিতাপের বিষয় কি আছে!

সরল পল্লী-কৃষক আমরা গৃষ্মের প্রখর রৌদ্র-বর্ষার দুরন্ত ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া যে দু'মুটা ধান পাই তাহা লজ্জা নিবারণের জন্য অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া মান্‌চেষ্টরের হাতে বা দেশীয় মিলওয়ালাগণের হাতে তুলিয়া দিয়া নিঃস্ব সাজিয়া বসি। এদিকে বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বিভীষিকা দরিদ্রতা আসিয়া আমাদের দুর্ব্বল গলা টিপিয়া ধরুক।

বাঙ্গলার দরিদ্র কৃষক আমরা খাটি, পুড়ি, মরি, আর লাভ খাউক অপরে। ধারা শ্রাবনের পুতিগন্ধময় পচা খানা ডোবায় সারাদিন পড়িয়া আমরা পাট কাচি আর তাহারা স্বল্প মূল্যে লইয়া আবার অপরে বহু মূল্যে,— বস্ত্রাদি নানা উপায়ে আমাদিগকে বিক্রয় করুক! আমরা আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাকে খোদার দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লই!

এখন নীরব থাকিলে চলিবে না, এর বিরুদ্ধে আমাদিগকে

পাড়ি দিতে হইবে। তন্নচেৎ দুর্ভিক্ষের নির্ম্মম পদাঘাতে আমাদিগকে নির্য্যাতীত— এমন কি—যমের দক্ষিন দ্বারও দেখিতে হইবে। পল্লীবাসী আমাদিগকে কেবল বস্ত্রের জন্য অপরের দিকে হাঁ করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু যদি আমরা নিজেরাই পাট উৎপাদনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রম ছাড়িয়া তুলা উৎপাদন করিয়া বস্ত্র-সমস্যার মিমাংসা করিয়া লইতে পারি তবে আমরা স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল।

"আমরা স্বাবলম্বী" "আমরা স্বাবলম্বী" বলিয়া আপনারারা যতই চীৎকার করুন না কেন আমরা কিন্তু তাহা মানিব না। যখন শুনিব চরখার ঘর ঘর শব্দে পল্লী মুখরিত, তাঁতের ঠকঠকির তালে তালে সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তন্তুবায়গণ বিভোর; তখনই বলিব পল্লী স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল; পল্লী সজীব, রোগমুক্ত! পল্লী ধন-ধান্যে পূর্ণ, কৃষকের আনন্দ-সঙ্গীতে মুখরিত!

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

বিবিধ সংবাদ।

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী, ভুবনেশ্বর (পুরী) পরপার আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী বিদ্যালয়ের জন্য ১৫। ২০জন ধর্ম্মপরায়ণা কন্যি মেয়ে চাহিতেছেন।

তুরস্কেরা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাধ্যতামূলক বিবাহ-আইনের পাণ্ডুলিপ প্রস্তুত করিয়াছেন। ২৫ বৎসর বয়স্ক তুর্ককে বিবাহ হইতে হইবে।

বর্দ্ধমানে "নিখিল ভারত গো সংরক্ষনী সভার" এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ত্রিপুরায় একটী দেয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৺কাশীধামে (১৫২ সি নং মিশির পোখরায়) বেদ শিক্ষার জন্য

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের দ্বারা বিশালাক্ষ্মী পাঠশালা নামে একটী বিদ্যা মন্দির স্থাপিত হইয়াছে!

কলিকাতায় বারাঙ্গনা প্রায় ৩৪হাজার। প্রতি বৎসর প্রায় ১০ হাজার বালিকা পল্লীগ্রাম হইতে উক্ত ব্যবসা শিক্ষা করিতে যায়। এসব বন্ধ না হইলে জাতীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

কাশ্মিরে নূতন আবিষ্কৃত বারমুখী চরখা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে বার মুখে অনেক সূতা প্রদান করে।

শোক-সংবাদ।

কুচবিহারের মহারাজ ৺জিতেন্দ্রনাথ ভূপ আর ইহজগতে নাই। আমরা তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও প্রজাবর্গের শোকে সন্তপ্ত।

উত্তরপাড়ার জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশের উজ্জ্বল রত্ন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী আর ইহজগতে নাই! তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গাকাশের এক তারকা খসিল।

রাজসাহীর দুবলহাটির বড় রাজকুমার হেমদানাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর মাত্র ৫৮বৎসর বয়সে পরপারে গিয়াছেন। তাঁহার শোকে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

[illegible] পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের

শোভনা

[প্রথম বর্ষ]　　[পঞ্চম সংখ্যা]

১৩২১　　চৈত্র

এস মা।

এস লক্ষ্মি ! এস মা কমলে !

মর্ম্ম অশ্রুসিক্ত রাঙা ফুল লওগো রাঙা পদকমলে।
এস মা এস পুষ্পরথে ত্যজিয়া পেচক বাহনে,
পেচক-মতি সম তব মতি দুর্ণাম বঙ্গ ভুবনে;
কাহারো শিরে সুবর্ণ বৃষ্টি, কারো জুটেনা অন্ন এক মুষ্টি,
ভাসে বুক আঁখি-জলে।
দীন ত বটে সন্তান তব বিন্দু করমা ! করুণা,
ঢাক্ যত ধনী দীন ভাই পানে দূরে যাক্ দৈন্য যাতনা,
ভায়ে ভায়ে হক প্রীতির মিলন।
এসে নেও সবে কোলে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

বসন্ত-মাধুরী ।

—•✱•—

চলে যেওনা রূপের বালা
বুক পেতে তোরে ধরব ।
ঐ—ভুবন-ভুলান রূপ-সাগরে
ডুব দিয়ে আজ মরব ॥
কুঞ্জবনে অমন করে
আর কি কুসুম ফুটবে ?
উদাস প্রানে অমন করে
আর কি মলয় ছুটবে ?
কাল পাখিটা সাঁজ সকালে
আরত কুহু গাইবে না।
কবি গুলো মরবে কেঁদে
নূতন কিছু চাইবেনা ॥
রূপ-সাগরে ঢেউ তুলে আর
সরোজ সখি হাস্‌বেনা।
ভ্রমর, সেত আসবে ছুটে
বুকভরে ভাল বাসবেনা ॥
স্বরগ থেকে আসলে নেমে
শান্তি সুধা ঝরবে ।
"শোভনা" আজি আপন মনে
তোরই সেবা করবে ॥
চলে যেওনা রূপের বালা
বুকপেতে তোরে ধরব ।
ঐ—ভুবন ভুলান রূ-পসাগরে
ডুব দিয়ে আজ মরব ॥

সেখ মহিউদ্দিন আহাম্মদ ।

অনুপমা।

[উপন্যাস]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুপমা মিত্রের কথা।

আজ দুই মাস হইল অনিল বাবু আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তারপর আমার স্নেহময় পিতা এই আলাময় সংসারের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। পৃথিবীর সহিত আমার সকল সম্বন্ধ, সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। আঘাতের উপর আঘাত লাগিয়া আমার বুকের ভিতরের চাপা ব্যথাটা দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। আমি একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। বিপদের বন্ধুর মত যতীন দাদা আমাকে শোকে শান্তনা প্রদান করিলেন। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ মধুর বাণীতে আমার তাপিত হৃদয় অনেকটা শীতল হইল। এতদিন তাঁহার প্রতি প্রাণের মাঝে যে একটা বিদ্বেষ পুষিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা যেন সেই শীতলতা স্পর্শে ধীরে ধীরে নিবিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাঁহার হাত দুইটী ধরিয়া সকাতরে কহিতে লাগিলাম,—

"যতীন দাদা, আজ আপনি আমার একটা কথা রাখবেন বলুন?" আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার কোন কথা না রেখেছি, বল কি কর্ত্তে হবে? আমি প্রাণান্ত স্বীকার করেও তা করব।"

তাঁহার কথায় আমার হৃদয় হইতে একটা ভাবনার অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল, আশার একটা ক্ষীণ আলোক-কণা সেই অন্ধকারময় স্থানটা পূরণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা বলুনত হিন্দুর মেয়ের কি দুইবার বিয়ে হয়?"

এই প্রশ্নে তিনি কণকাল বিস্ময়দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমি আবার কহিলাম, "বিস্মিত হবেন না, বলছি শুনুন। আমি একজনকে ভালবেসেছি, তাঁকেই জীবনের উপাস্য বলে বরণ করেছি, তাঁরি পায়ে আমার প্রাণ মন সমর্পণ করেছি, লোকতঃ না হউক

ধর্মতঃ তিনি আমার স্বামী, আমি তাঁর স্ত্রী।"

তিনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "যদি আপত্তি না থাকে, জানতে পারি কি অনু, কে সে ভাগ্যবান, যিনি তোমার পবিত্র প্রেমের অধিকারী?"

সলজ্জভাবে উত্তর করিলাম, "যিনি আমায় একদিন মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন— আমার কথাগুলি যেন তাঁহার সংজ্ঞা কাড়িয়া লইয়াছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম, কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, তিনি সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "কৈ আমায় তোমার কোন্ কথা রাখতে হবে তা'ত বল্লেনা অনু?"

আমি কাতর-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বিনয়পূর্ণ স্বরে কহিলাম —"আজ হতে যেন আপনি আমায় নিজের ভগ্নির মত দেখেন, এই আমার অনুরোধ—এই আমার ভিক্ষা—এই আমার বক্তব্য।

আমার কথা শুনিয়া তিনি ধীর স্থির প্রতিজ্ঞাপূর্ণস্বরে বলিলেন, অনুপমা, সতী-সাবিত্রীর দেশে আমার জন্ম, সতীর মর্য্যাদা রাখতে আমি জানি। তোমার এই অদ্ভুত পতিভক্তি দেখে আমি যে কতদূর সুখী হয়েছি, তা' ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা আমার নাই। হায়! ভারতের প্রতি উদ্যানে যদি তোমার মত ফুল ফুটত, তাহলে ভারত নন্দন-কাননে পরিণত হোত! প্রতিজ্ঞা করছি, আজ হতে তোমাকে সহোদরা ভগ্নীর মত দেখবো। আজ হতে তুমি আমার ভগ্নী, আমি তোমার ভাই।"

আমি তাঁহার এই অচিন্তনীয় অভাবনীয় উত্তরে পুলকিত হইলাম; এ যুবকের হৃদয় যে এত উচ্চ মহার্ঘ্য উপাদানে গঠিত তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর আমার এতদিন ঘটে নাই। ভাবিলাম; শুধু যে আজ বহুদিনের দুঃসহ একটা চিন্তার হাত হতে অব্যাহতি পেলুম এমন নয়; আজ একজন ভাইও পেলুম।

* * * * * *

পরদিন ধীরেন বাবু আমাদের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি একখানি আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন,—" মা, যতীনের মুখে সব শুনলুম; আমার বড় সাধ ছিল— তোমাকে পুত্রবধূ করি, কিন্তু যখন ঐ বিবাহে তুমি সুখী নও তখন আজ যোর করে তোমাদের দুহাত এক করে দিয়ে তোমাদের চির জীবনের সুখশান্তি নষ্ট কর্ত্তে চাইনা। এখন জিজ্ঞাসা করিমা, তুমি কি একলাটী এখানে থাকবে ? আমি বলি, তুমি নাহয় দিনকতক আমাদের বাড়ীতে চল।"

" না বাবা, একলা থাকতে আমার কোনও কষ্ট হবেনা, আমার কোথাও যাবার আবশ্যক নাই। আপনাদের স্নেহ পেলে আমি যে-খানেই থাকিনা কেন সেইখানেই সুখী। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ওই স্নেহ হতে কখনো বঞ্চিত না হই।"

" তবুও এ সময়ে আমরা তোমায় একলা ফেলে যেতে পারিনা মা। বিপদে যদি তোমার সাহায্য না করলাম মা, তবে আমরা কিসের আত্মীয় ? আজ তোমাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্ত্তে পারলুম না বলে যে তোমার প্রতি আমার স্নেহ থাকবেনা এমন মনে কোরনা দুদিন আগে, তুমি আমার যেমন স্নেহের পাত্রীটি ছিলে, আজও তেমনিটী আছ। আমার কথায় অমত কোরনা মা, কিছুদিন আমাদের সংসারে থাকলে তোমার শোকের অনেকটা উপশম হবে। তোমার যতীন দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তারই সঙ্গে যেও।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি কেবল ভাবিতে লাগিলাম— পূর্ব্ব জন্মে আমরা ইহাঁদের কে ছিলাম যে ইহাঁরা আমাদের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন !

বিকালবেলা বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যত জীবনের কথা আলোচনা করিতেছি, এমন সময় বাড়ীর সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন দাদা সেই গাড়ীর

ভিতর হইতে নামিয়া পড়িয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আজই তোমায় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা আমায় পাঠিয়ে দিলেন। দেরী কোরনা অনু, শীঘ্র তৈরী হয়ে পড়গে যাও।"

আমি তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আমার প্রিয় কতকগুলি পুস্তক একটা ট্রাঙ্কে করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। তারপর বাড়িখানি তালাবদ্ধ করিয়া যতীন দাদার সহিত গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়িখানি একটী সুবৃহৎ অট্টালিকায় ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়ী থামিলে আমরা নামিয়া পড়িয়া বারান্দায় উঠিলাম। সম্মুখে সিঁড়ির ধারে যতীন দাদার মা দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি স্নেহকোমল-স্বরে ডাকিলেন,—"এস মা!"

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমি যতীন দাদা'কে ডাকিয়া কহিলাম—"দাদা, বাবা দশ হাজার টাকা লাইফ্ ইন্সিওরেন্স্ করেছিলেন, তুমি সেই টাকাতে একটা থিয়েটার পার্টি খুলে দাও।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন—"কি বলছ তুমি অনুপমা? তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। থিয়েটার পার্টি খোলার তোমার দরকার? ঐ টাকাতে তুমিত বেশ একটা বড়রকমের কারবার খুলতে পার?

"আছে দাদা এর কোন কারণ, আমার কথাটা তোমায় রাখতেই হবে। আমার এই প্রস্তাবে তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তিনি ইহাতে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখাইতে লাগিলেন। শেষে আমার নিতান্ত অনুরোধে সম্মত হইলেন।

আমি বলিলাম—"দাদা, তুমি আমার জীবনের ইতিহাস অবলম্বন করে একখানা নাটক রচনা কর, এই নাটকখানাই শুধু এই থিয়েটারে অভিনীত হবে।

আমার এই অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবন করিয়া, ইহাতে আমার নিশ্চয় কোন অভিপ্রায় আছে ভাবিয়া, তিনি আর এ বিষয়ে আমাকে বাধা প্রদান করিলেন না। তা ছাড়া তিনি জানিতেন আমাকে আমার সংকল্পচ্যুত করা বড়ই শক্ত।

তিনি কিছুদিন ধরিয়া আমার জিবনী অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া আমরা প্লেয়ার সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুন্দর সুন্দর অয়েল-পেণ্টিং পর্দা ও মূল্যবান পোষাক আনাইলাম। দুইমাস রীতিমত রিহার্সেল দেওয়ার পর আমরা আমাদের থিয়েটার খুলিয়া দিলাম। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের থিয়েটার পার্টী খুব ভাল হইয়া উঠিল। আমাদের অভিনয়ের প্রসংশায় সমস্ত সহরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

রত্নকণা !

উন্নতি লাভ করিতে হইলে, জানিতে হইবে, আমাদের চেষ্টা বিফল হয় কেন ? কি জন্য আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিনা, ইহা জানিতে পারিলে অর্দ্ধেক সফলতা লাভ হয়।

সকল ধর্ম্মের প্রথম সূত্র নির্দ্দোষিতা, তৎপরে সুশীলতা। সুশীলতাকে বিদায় দিলে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম তাহার সহিত বিদায় লয়।

অসাধারণ বড় কাজ করিতে গেলে যে শক্তি আবশ্যক, তাহা সকল মানুষের নাই। কিন্তু সর্ব্বদা মঙ্গলকর কার্য্য করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে।

নম্র হইয়াও চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করা যায় এবং কর্কশ না হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়—এই সত্য অনেকেই ভুলিয়া যান।

হিন্দুর মাতৃহত্যা, শিশুহত্যা ও গোহত্যা।

আইন কানুন বিধিব্যবস্থার উপকারিতা স্বীকার করিলেও ইহা বেশ বলা যেতে পারে যে একটা জাতির অবস্থা তার আইন কানুনের সংখ্যা দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায়। যখন দেখব যে একটা জাতি একটা সমাজ অন্য জাতি অন্য সমাজ অপেক্ষা আইনকানুনের সংখ্যায় আসর খুব জমকিয়েছে তখন বুঝব সে জাতির অবনতির মাত্রা অন্যের অপেক্ষা অধিক। Common sence— সাধারণ জ্ঞান, সহজ জ্ঞান ও বিবেক যাহাই বলনা কেন এগুলিকে হরফ দিয়ে মূর্ত্তি দেওয়াই হচ্ছে আইনকানুন। কিন্তু আমাদের বিবেক যখন কলুষিত তখন আইন-কানুনের কোন মূল্য নাই বলিলেই হয়।

আবার যেমন এই সব আইনকানুন বিধিব্যবস্থার সংখ্যাধিক্য আমাদের অবনতির মাপকাঠি তেমনি সেই সব আইনকানুনাগ্রহীদের সংখ্যাধিক্য এক পতিত জাতির পক্ষে তার জাতীয়জীবনে নব জাগরণের পরিচায়ক। আজকাল সচরাচর দেখতে পাই একদল লোক আছেন যাঁরা সমাজ-অঙ্গে কদর্য্য ক্ষতগুলি দূর করবার জন্য বিধিব্যবস্থা আইনকানুনের সাহায্যে কতকগুলি কুসংস্কার দূর কর্ত্তে চান। কিন্তু আবার কতকগুলি লোক আছেন যাঁরা তাঁদের সেই কাজে বাধা দেন। অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এই কুসংস্কারাগ্রহীদের সংখ্যা আমাদের সমাজে অত্যধিক। বিবেকবলে যে মহাপুরুষ আছেন তাহা যে তাঁদের প্রাণের ভিতর নাই তা নয়। প্রথমতঃ আইনকানুনের সংখ্যাধিক্য, দ্বিতীয়তঃ সেই আইনকানুনাগ্রহীদের অল্পসংখ্যকতা, তৃতীয়তঃ অধিকাংশর মধ্যে বিবেকানুমোদিত কার্য্যসম্পাদনে অনিচ্ছা। এগুলি একত্রযোগে যে সমাজে যে জাতিতে দেখব, আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি সে জাতি অবনতির চরম সীমায় পৌঁচেছে শুধু তার ধ্বংস মাত্র বাকি।

আমাদের এই হিন্দুসমাজে এ তিনটি পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত। কি

ধর্ম্ম কি সমাজ কি কর্ম্ম সমস্তই আমাদের কলুষিত হয়ে উঠেছে। এখন চাই ধ্বংস এখন চাই প্রলয়। জানিনা কবে ধ্বংসের দেবতার ভৈরব ভেরী-নিনাদ বেজে উঠবে। ধর্ম্মের যতদূর গ্লানি সম্ভব তাই হয়েছে শুধু সেই দুস্কৃত বিনাশের দেবতার আবির্ভাবটুকু বাকি আছে।

মানুষ মনুষ্যত্ব জিনিষটাকে হেলায় যখন পায়ে দলে তখন তাকে দুস্কর্ম্ম হতে কোন আইন, কোন শাস্ত্র দূরে রাখতে পারেনা। তা ছাড়া আইন আইনের যেমন শত্রু তেমন শত্রু আইনের আর কিছু নাই। আমার বিশ্বাস যদি কোন আইন না থাকত্ তবে মানুষের এত অধঃপতন হত না। সুতরাং যখন আমি শুনি যে কোন ভাল জিনিষ রক্ষার জন্য কোন বিশেষ আইন হয় নাই তখন আমার মনে আশা হয় যে জিনিষটা জগতে কিছুদিন থাকবে। তাই যখন শুনি যে শ্রীযুক্ত হরি সিং গৌড়ের অসবর্ণ বিবাহ-পদ্ধতি পরিগৃহীত হয় নি তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ-অইনের কথা আমার মনে পড়ে। তুমি আমি যদি মানি তবে ত আইন! আইনের মূল্য তার স্বরূপ নয় আইনের মূল্য তাকে মেনে চলা। সুতরাং এসব আইন যদি পরিগৃহীত হয় তবে ভালই না হয় আমাদের দুঃখ নাই। বিধবাবিবাহআইন ত আছে! আমরা কয় জন বিধবা বিবাহ করেছি? কয়জন অভিশপ্ত বিধবার অশ্রুমোচন করেছি? কয়জন কন্যাদায়গ্রস্থ নিঃস্ব পিতার চোখের জল মুছেছি? চাই না সে আইন যে আইন অনাদরণীয় পড়ে থেকে রাবণের চিতার মত হু হু করে রাতদিন জ্বলে জ্বলে বাঙ্গলার প্রস্তরকঠিন বুকে মিশে যাবে।

সমাজের সেই ঈশ্বরচন্দ্রের আমল থেকে পুরাতন কথাগুলির বিশেষ উল্লেখ করব না। আমার বিশ্বাস এখনও বাংলার মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়নি, এখনও বাংলার তরুণ হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার আছে। এখনও তাদের বুকের মাঝে রক্তলহরী খেলে বেড়ায়। শুধু গোটা-কয়েক প্রাণের কথা বলে যাব। আমি এই প্রবন্ধের প্রথমেই ত্রিহত্যার উল্লেখ করেছি। সেগুলির একটু উপক্রমণিকা দিয়ে আমাদের পাড়া-গাঁয়ের উপযোগী সেগুলি প্রতিকারের গোটাকতক পন্থা দেখাব।

মাতৃহত্যা ও শিশুহত্যা।—

আমাদের শাস্ত্রে বলে মাতৃহত্যা ও শিশুহত্যার মত পাপ নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে মাতৃহত্যা ও শিশুহত্যাত প্রত্যহই ভূরি ভূরি হচ্ছে। যে সমাজপতি সমাজের সামান্য একটী ফাটল দেখলে কবর হতে লাফিয়ে উঠেন, নানা ফন্দি ফিকির বাহির করে, নানা খড় কুটো পুড়ে চুন সুরকী তৈরী করে সে ফাটাল বুজাতে যান তাঁরাত কই এই মাতৃহত্যা শিশুহত্যার কোন প্রতিকার করেন না। তাঁরা মাতৃহত্যাকারী ও শিশুহত্যাকারীর এমন কোন বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারেন না যাতে এসব কেলেঙ্কারী ঢাকা থাকে। শিরিষ-কোরক সদৃশা মাতৃমূর্ত্তিগুলিকে আমরা জন্মের পর হত্যাগারে পাঠিয়ে দিই। তারাও নিতান্ত অসহায়-ভাবে নিহত হয়! কিন্তু যারা গো-খাদক তারা ত কই বাকি গো শিশু হত্যার সমর্থন কোন দিন করেন না। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম যে বাঘ একবার মানুষ খেয়েছে, সে আর মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে না। কারণ মানুষ ধরা নাকি খুব সহজ। এ বিষয় কার্য্যক্ষেত্রে কোন দিন দেখি নাই। কিন্তু এখন আমাদের বেশ প্রতীতি হয়েছে যে, মানুষ যেমন মানুষ খেতে ভালবাসে এমন অন্য কিছু নহে।

একদিন একটা কাগজে দেখেছিলাম বিবাহিতা বাঙ্গালী হিন্দু-রমণীর বয়স—

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১—২	৫	১৩
২—৩	১০৮	২৭
৩—৪	১৫৮	৫২
৪—৫	২৪৫	৭৪
৫—১০	১৪২৫	৬২৪
১০—১৫	১১২০৬	৩৩৪০

এটা বোধ হয় খোদ কলিকাতার সংখ্যা। কলিকাতার মত সহরে যদি ১—৪ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা ২৭১ হয়,

তবে পল্লীগ্রামে কত অধিক হতে পারে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমি এক গ্রামে দেখেছি সেখানে ৬মাস হইতে ২বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বালিকা প্রায় ১০। ১২ জন আছে। অবশ্য তাদের মধ্যে ৫। ৬ জন পোদ বাগ্দী প্রভৃতি জাতির। কিন্তু ভেবে দেখুন হিন্দু রমণীর বিবাহের বয়সের এই যদি সময় হয় তবে আমাদের কতদূর পতন হয়েছে। এই অল্প বয়সের বিবাহের শোচনীয় ফল সহজেই অনুমেয়। ফল— অত্যধিক বিধবার সংখ্যা, স্বাস্থ্যহীনা মাতা, স্বাস্থ্যহীন সন্তানের অসম্ভব সংখ্যা বৃদ্ধি। এর ফল এইখানেই শেষ নয়। ইহার ফল মাতৃহত্যা ও শিশুহত্যায়।

আমাদের এ বাংলাদেশে সচরাচর ১৩ বৎসর বয়সে আমাদের বালিকারা নারীত্বে পা দেন। আর নারীত্বে উপস্থিত হইবার পর মুহূর্ত্তেই যৌন সম্মিলন! এমনকি আমাদের সহৃদয় নব্য বাঙ্গলার তরুণ যুবকেরা স্ত্রীর নারীত্ব বিকাশের পূর্ব্বেই অনেক রকম অসংযমের পরিচয় দেন। এই সকল অবস্থায় আমাদের মেয়েরা অতি অল্প বয়সেই সন্তানবতী হন। স্বামীর কামাগ্নির ইন্ধনরূপে অতি অল্প বয়সে তাঁরা জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। আর দু একজন যারা বেঁচে থাকে তারা জীবন্মৃত। এই অযথা সম্মিলনের যে ফল তা সমাজের অভিসাপ মাত্র। এ মিলনের ফলে যে সন্তান হয় তাদের শতকরা ৬০ জন সূতিকাগৃহে নষ্ট হয়। ৩০ জন বড়যোর ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। বাকী ১০ জনের মধ্যে বড়যোর ৫।৬ জন যৌবনের সীমায় পা দিতে পারে। ১৯২১ সালে তেরো লাখ এক হাজার (১৩,-০১০০০) জন্মেছিল চৌদ্দ লাখ তিন হাজার যাট (১৪০৩০৬০) মরেছে! অবশ্য শুধু যে অল্পবয়সের বিবাহের এই ফল তাহা নহে।

আমাদের বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এত রকম বীভৎস ব্যাধি ঢুকেছে যাহা কেউ ভাবতেও পারে না। তার ফল বিবাহিতা পত্নীকে ও তৎজাত শিশুকে বড় কম পাইতে হয় না। পুরুষ যখন বিয়ে করবে সে কন্যাকে সৌন্দর্য্য থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত

সব গুলি পরীক্ষায় পাশ করিয়ে নেবে। এটা সমাজের রীতি। কিন্তু বরকে যে বাজিয়ে দেখে নিতে হবে তাহা কাহারও ভ্রূক্ষেপ হয় না। ভ্রূক্ষেপ হলেও অনেকে তাহা করেন না। তার কারণ আর কিছুই নয়— শুধু নারীজাতির জীবনকে অকিঞ্চিৎকর ভাবা। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা একবারও ভাবেন না যে, কন্যাকে পুত্রের মত শিক্ষা দিক্ষা দিলে সেও পুত্রের মত বংশমর্য্যাদা বজায় রেখে নিঃস্ব পিতাকে পুত্রের মত সাহায্য কর্ত্তে পারবে। হায়! কন্যাকে সৎপাত্রে দিবার জন্য পিতা যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করেন এবং যত অর্থ ব্যয় করেন সে অর্থ যদি কন্যার শিক্ষায় নিয়োজিত করতেন, তবে আজ দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে মাতৃজাতির নারীজাতির এ বীভৎস বলি দেখতে হোত না।

আমরা স্ত্রীজাতির শক্তির উপর বড় অবিশ্বাস করি। এটা ভারতের এ অবনতির যুগের নূতন ফ্যাসন। আমাদের মধ্যে গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতিও ছিলেন। দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাইও ছিলেন। আর অনেকদিন অন্তঃপুরের পূতিগন্ধময় বায়ুতে থেকে আমাদের মাদের মনের বল অনেকটা নষ্ট হয়েছে। সেটা আমাদের শিক্ষার গুনে দূরীভূত হবে সন্দেহ নাই। একটা বড় দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের এহেন দুর্দ্দিনে যে কয়জন শিক্ষিতা মহিলা আছেন তাঁরা নিজেদের বোনদের উন্নতির তেমন যত্নবতী নন। আমাদের সমাজে যাকে ক্রমোন্নতি বলে তাহা আমি মানিনা। আমাদের এই পতিত জাতির যদি উন্নতি আসে তবে revolutionএ আসবে।

এইত গেল সধবাদিগের দুর্দ্দশার কথা। তারপর বিধবাদেরত কথাই নাই। এই বাংলাদেশে ১৫—২০বৎসর বয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ৯৩,১৬৭ এবং ২০—২৫বৎসর বয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ১৪০,৭২১ এবং ২৫—৩০ বৎসর বয়স্কাদের সংখ্যা ২০৯,৩১৮। ৩৫—৭০ বৎসর বয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা দিলাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরেশনাথ ভূঁইয়া।

আমার সাধ।

আমি কি মনের সাধে খুলিয়া আমার প্রাণ,
নিয়ে মোর বাঁশিখান গাবনা মনের গান ?
নহেকি আমার তরে প্রভাত-তপন-হাসি ?
নহেকি আমার তরে চাঁদিমার সুধারাশি ?
নহেকি শুনাতে মোরে গান পাপিয়ার মুখে ?
নহেকি আমার তরে সুষমা কুসুম-বুকে ?
জুড়াতে তাপিত কায়, মুছিতে নয়ন-জল,
নহে কি আমার তরে জগতে তরুর তল ?
কে নাহি পরিতে চায় প্রকৃতির ফুল-হার ?
কে নাহি হেরিতে চায় বিশ্বের সৌন্দর্য্য সার ?

* * * * * *

কেহ না শুনিবে বলে, আমি কিগো গাহিবনা ?
কেহ না তুলিবে বলে, ফুল কিগো ফুটিবেনা ?
মাঝি কি বাহেনা তরি, ঝড়ে ডুবে যাবে বলে ?
তপন কি উঠেনাক অস্ত যেতে হবে বলে ?
হাঁটিতে কি পারা যায় হামাগুড়ি নাহি দিলে ?
সাঁতার কি শেখা যায় ভয়ে না নামিলে জলে ?
তবে কেন মনসাধে খুলিয়া আমার প্রাণ,
নিয়ে ভাঙা বাঁশিখানি গাবনা মনের গান ?
হয় হোক্ সুর-ছাড়া নাহি থাক্ তাল মান,
তবুও গাহিব আমি সেযেগো "বাণীর দান"।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

বেদ-বিভাগ।

....

"সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্বেঘোষা একৈব ব্যাহৃতিঃপ্রাণা এব প্রাণ ঋচ এবং বিদ্যাদিতি।" আঃ॥

সমস্ত বেদই এক। এক ব্যাহৃতি এক প্রাণ। ঋক্ই প্রাণ। তাহাহইলে বেদের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা হয় কেন? তাহার কারণ ভাগবতে ১২ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—"তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈঃ প্রভুঃ। সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥" চতুরগ্নিহোত্র বলার অভিপ্রায়ে চতুর্মুখ হইতে ব্রহ্মা ব্যাহৃতি এবং ওঙ্কারযুক্ত চতুর্ব্বেদ বলিয়াছেন। বেদ যজ্ঞের নিমিত্ত প্রবৃত্ত এবং চতুরগ্নিহোত্র দ্বারা যজ্ঞ সাধিত হয়, এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মা স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন নাই। বেদ যে চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তিনি ইহাদ্বারা কেবল মাত্র তাহার আভাস দিয়াছিলেন। ঐ আভাস অবলম্বন করিয়া মহর্ষি ব্যাস দ্বাপরযুগে ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বেদ বিভাগ করেন। সত্য এবং ত্রেতা যুগে বেদের এই প্রকার বিভাগ ছিল না। তখন ব্রহ্মর্ষিগণ হৃদয়স্থিত অচ্যুত-প্রণোদিত হইয়া বেদকে ব্যাস করিয়া অগ্নিহোত্রানুসারে মন্ত্রবিনিয়োগ করিতেন। দ্বাপরাদি যুগে মনুষ্যেরা ক্ষীণসত্ত্ব অল্পায়ুঃ ও হীনবুদ্ধি হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিকভাবে বেদকে ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করার শক্তি রহিল না। ইহা দেখিয়া লোকপাল ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। দেবতাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত পরমাত্মার এক অতি সূক্ষ্ম কলা ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এ বিষয় ভাগবতে এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে;—

"অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবাল্লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে॥

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়াবিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদাং চক্রে চতুর্ব্বিধম্॥
ঋগথর্ব্ব যজুঃ সাম্নাং রাশী-কৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণাইব॥"

অনন্তর ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মেশাদি লোকপাল কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম কলাতে পরাশর হইতে সত্যবতীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং চারিভাগে বেদ বিভাগ করিলেন। সূত্রে যাদৃশ মণি গ্রথিত হয় সেই প্রকারে বেদরাশি হইতে বর্গানুসারে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া ঋগ্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চারি সংহিতা গ্রথিত করিলেন। এই প্রকারে বেদেদের উৎপত্তি ও বিভাগ হয়। বেদের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, কারণ সমস্ত বেদই এক সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য সুধীগণ এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী আমাদের দেশের কোন কোন মহোদয় বলেন যে ঋগ্বেদ প্রথমে এবং অন্যান্য বেদ তাহার পরে রচিত হয়। তাঁহাদের এই মত ভ্রামক এবং হেয়। বেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই তাহা গত মাসের এই শোভনায় উক্ত হই-য়াছে। ঋগ্বেদ কেন যে প্রথমে পঠিত হয় তাহার কারণ এখন বলা যাইতেছে। পাঠের ক্রমে ঋগ্ যজু সাম ও অথর্ব্ব অথবা ঋক্ সাম অথর্ব্ব যজু এই প্রকার পঠিত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই ঋগ্বেদের প্রাথম্য দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, ঋগ্বেদ সকল বেদেই অভ্যর্হিত— অভ্যর্হিতং পূর্ব্বং— অর্থাৎ অভ্যর্হিতের কথা অগ্রে বলিতে হয়, এই ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই ঋগ্বেদ প্রথমে পঠিত হয়। ঋঙ্মন্ত্র অল্পবিস্তর সকল বেদেই পঠিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঋগ্বেদ অভ্যর্হিত। দ্বিতীয় কারণ এই যজ্ঞের যে অঙ্গ সাম এবং যজুঃ কর্ত্তৃক শিথীলিকৃত হয় সেই অঙ্গ ঋগ্বেদ কর্ত্তৃক দার্ঢ্য করা হয়। এ বিষয় তৈত্তিরীয় শাখায় এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে— "যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তৎ যদ্ ঋচা তদ্দৃঢ়মিতি।" তৃতীয় কারণ এই ঋগ্বেদ দ্বারা স্তুতি সামবেদ দ্বারা গান ও যজুর্ব্বেদ দ্বারা হোমকার্য্য সাধিত হয়। স্তুতিই

প্রধান। এই নিমিত্ত ও ঋগ্বেদের প্রাধান্য, অন্য কোন কারণ নহে। যাঁহাদের যে শাস্ত্র পৈত্র নহে তাঁহাদের উচ্ছাস্ত্র সম্বন্ধে কথা বলা আমি সমীচীন বোধ করিনা। এ সম্বন্ধে এতাধিক কোন কথা বলিতে আমি ইচ্ছা করিনা।

সামবেদ ঋগাশ্রিত। ঋঙমন্ত্র গানারূঢ় হইলে তাহার সাম সংজ্ঞা হয়। তাহাহইলে সামবেদ ও ঋগ্বেদ একই বেদ। তবে সামবেদের কতিপয় মন্ত্র একবারেই ঋগ্বেদে পঠিত হয় নাই, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণতঃ ঋক শব্দের অর্থ ছন্দঃ যজুঃ শব্দের অর্থ গদ্য। কিন্তু যজুঃ শব্দ গদ্যবাচী হইলেও যজুর্ব্বেদে পঠিত মন্ত্র নানা ছন্দে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে,—" তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতি। একৈক সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥

পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচহ।
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগদাখ্যাং যজুর্গণম্॥
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগ সংহিতাম।
অথর্ব্বাঙ্গিরসাং নাম সশিষ্যায় সুমন্তবে॥ "

ভগবতাংশে অবতীর্ণ মহর্ষি ব্যাস সমস্ত বেদরাশিকে ঋগ্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চারি সংহিতায় বিভাগ করিলেন। পৈল নামক ঋষিকে ঋক্ সংহিতা, বৈশম্পায়নকে যজুঃ সংহিতা, জৈমিনিকে সাম সংহিতা ও সুমন্তকে অথর্ব্ব সংহিতা প্রদান করিলেন। ইহাঁরা আবার পুত্র ও শিষ্যকে ঐ সকল সংহিতা গ্রহণ করাইলেন। এই প্রকারে বেদ বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রচারিত হইল।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদতীর্থ।

—o*******o—

প্রশংসার আশা।

—•✻•— —•✻•—

বর্ত্তমান সমাজে প্রশংসাকামীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে লেখকের লেখনি জ্বালাময় বিদ্রুপবাণের বেশ পরিগ্রহ করিলে প্রশংসার অলস অভিলাষ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে ও সমাজে আন্তরিক অনুষ্ঠান কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই কারণেই প্রেথিত-নামা লেখক ও কবিগণের সুধাসিক্ত লেখনিও সময়ে সময়ে বিদ্রুপ-বিষ উদ্গার করিয়াছে। প্রশংসাকাঙ্ক্ষিগণ প্রতিভা-দীপ্ত বা কর্ম্ম-বিশিষ্ট না হইলেও তাহারা সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় উৎকীর্ণ হৃদয়, কর্ম্মের অবতার স্বরূপ মহাপুরুষগণের অমৃতময় হৃদয়ের আস্বাদনে সঞ্জীবিত না হইয়া প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ কাকপুচ্ছের অসার গৌরব নানা প্রকারে ব্যক্ত করিতে সদাই ব্যস্ত। কেহ কেহ প্রাচীনকালের মহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন উচ্চশির গৌরবের স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া কল্পনা-মুখর হৃদয়ে আপনাদের গৌরব প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। কেহ কেহ বংশের আদি নির্ণয় করিয়া আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করে। কেহ কেহ সংবাদপত্রের প্রশংসাস্তম্ভে নাম আড়ম্বরে বাহির করিবার জন্য সময়বিশেষে দানবীর সাজে। কেহবা কম্পিত হস্তে নিজ লেখনি প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক ও কবিগণের ভাব ও ভাষায় অকাতরে সিক্ত করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে মস্তকোত্তলন করিবার চেষ্টা করে; এইরূপে অনেকে খ্যাতির সৌধাগ্রে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রশংসা মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নহে। কর্ম্মই মানুষের উদ্দেশ্য, কর্ম্মই মানুষের জীবন, কর্ম্মই মানুষের ধর্ম্ম। প্রশংসার তীব্র তৃষ্ণায় যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী প্রশংশা আনিতেও পারে; কিন্তু তাহা সমাজে চিরকাল সমর্থনযোগ্য থাকে না। কিন্তু অশান্তিকল্লোলিত, দুঃখ-নিগৃহিত সমাজের বা ব্যক্তি-বিশেষের অশান্তি ও দুঃখ দূরীভূত করিবার জন্য যে কার্য্য আগ্রহাতি-শয্যে সম্পন্ন করা যায়, তাহা জগতীতলে অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরলোকে

অক্ষয় স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়। তাই আজ বলিতেছি,—

হে প্রশংসাকামিগণ! তোমরা মহৎ বিস্তৃত ও গুরুতর কর্ত্তব্যকে সম্মুখে রাখিয়া সেবাকাতর প্রাণ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটল ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিতে থাক;— সার্ব্বভৌম অভিনন্দন ও অনন্ত-সম্প্রসারিত খ্যাতি তোমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সেবা কর্ম্মের মধ্যে যদি প্রাণপাত করিতে পার, তবে তোমাদের জন্য ইহলোকে হৃদয়দ্বার ও পরলোকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। অজ্ঞানতাচ্ছন্ন অমানিশায় জ্ঞানের বর্ত্তিকা যদি তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হয়, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও স্বাতন্ত্রের মধ্যে ঐক্য যদি তোমাদের ঈপ্সিত হয়, চিরাচরিত সমাজ-বন্ধনের দুর্গ মধ্যে সত্যের নিত্যনবীনত্ব যদি তোমাদের বিদ্রোহের প্রতিঘাত সহ্য করিবার ধর্ম্ম হয়, তোমাদের নিঃস্বার্থ পরোপকার যদি কৃতঘ্নতার মধ্যে উজ্জ্বলতর হয়, তোমাদের আভিজাত্য যদি চিন্তায় ও কর্ম্মে নিদর্শিত হয়, মৌলিক গবেষণা যদি তোমাদের লেখনি হয়, গুণান্বিত কর্ম্ম যদি তোমাদের আদর্শ হয়, তবে প্রশংসা তোমাদিগকে অমরত্বে বরণ করিয়া লইবে ও তোমাদের কর্ম্ম ও চিন্তার যুগল প্রতিকৃতি লক্ষে লক্ষে বক্ষে বক্ষে প্রস্ফুটিত রহিবে। নচেৎ তোমাদের প্রশংসালিপ্সার প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে অহংকারের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই তোমাদের প্রশংসালাভের পথে দণ্ডায়মান হইবে,— আর তোমাদের সহবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণে ও বিদ্রূপ উপহাসে মূর্চ্ছিত হইয়া তোমাদিগকে অতলতলে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

শ্রীগোরাচাঁদ গিরি।

বিশ্বদেবতা।

হে ভূমা বিরাট !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি আপনার মূর্ত্তি দেছ,
একি মহা ঠাট !
ক্ষুদ্রতম পরমাণু মাঝে
অনাহত মন্ত্র গীতি
চিরদিন মেঘমন্দ্রে বাজে,
নিখিলের প্রাণপুটে সকল সুষমা লুটে
নিশিদিন জাগিছ সম্রাট।
হে ভূমা বিরাট !

রুদ্র শান্ত আঁখি,
নির্নিমেষ চেয়ে আছ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহরূপে
চারু দীপ্তি মাখি,
গোধূলির ফাগ-রক্তরাগে
বিচিত্র সৌন্দর্য্য লীলা—
শ্যাম শষ্পে পর্ণদলে জাগে
সীমাহীন নীলাকাশে কৃষ্ণ মেঘ জটা পাশে
কী মাধুরী রাখিয়াছ ঢাকি,
হে রুদ্র পিনাকী !

স্নিগ্ধ শান্ত ভালে,
পবিত্র ত্রিপুণ্ড্ররেখা এঁকে দেছে সন্ধ্যাতারা
যাদু মন্ত্রজালে
নীলিমার স্থির বক্ষ চিরে,
অক্ষয় কিরীট তব

জেগে আছে তুঙ্গ গিরিশিরে
সৃষ্টির প্রভাত হতে অব্যাহত ভীম স্রোতে
মহাসিন্ধু, তব পদতলে,
কল্লোলিয়া চলে !
ক্রুদ্ধ অট্টহাসি,
ধরার দুর্নীতি পানে ঝঞ্ঝা ইরম্মদে
উঠে কভু ভাসি;
রৌদ্রতপ্ত রুক্ষ মরুবুকে,
বিকট তাণ্ডব তব
চিরদিন অদম্য পুলকে,
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মাঝে মানবের শতকাজে
তোমার ইঙ্গিত উঠে ভাসি,
হে মহা সন্ন্যাসী !

শ্রীঅতুলচন্দ্র মহাপাত্র।

....

ঘর জামই।

" বকুল ফুল কুড়াতে যাবিনে ? কত বেলা হয়ে গেল, দেখ দেখি। "

" কেন ? "

" মালা গাঁথবার মত ফুল যে আজ নাই। "

" নাই থাকল, মালা কি হবে ? "

" মালা গাঁথতে হবে, আর কি হবে!" বলিয়া কমলা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

" মালা গেঁথে গেঁথে ত সারা হচ্ছি, তবু মালা পরাবার ত কাউকে পেলুম না। এ মালা গাঁথার সুখ কি সই ?

" কেন সারা হবি বোন, আমি যে আছি; আমায় পরাবে না ? " বলিয়া কমলা স্মিত মুখে বেলার গলা জড়াইয়া ধরিল।

" তোর সাথে পেরে উঠা দায়; চল্‌লো চল্‌।" বলিয়া বেলা কমলার হাত ধরিয়া বকুল তলার দিকে চলিল।

বসন্তের স্নিগ্ধ প্রাতঃ সমীরণ এ ফুলটীকে দোলাইয়া, সে ফুলটীকে হেলাইয়া কত রঙ্গে ছুটিয়াছে। তাহারি কোমল স্পর্শে ফুলের মুকুলগুলি পাঁপড়ি ছাড়িয়া ফুটিয়া উঠিতেছে— ভ্রমরকুল আকুল হইয়া গুণ গুণস্বরে কতকি গাহিয়া মধুপানে ছুটিতেছে। তাহারি কোমল স্পর্শে কোকিল পাপিয়া সুস্বরে তাহার আগমন জ্ঞাপন করিতেছে— চতুর্দ্দিক সুমিষ্ট ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! তাহারি কোমল স্পর্শে নদীবক্ষে তরণীকুল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে মাঝিমল্লার আনন্দ-সঙ্গীত কানে অমৃত ঢালিতেছে!

বেলা স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে ডাকিল " সই!" কমলাও বেলার মুখটীর কাছে মুখ আনিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল " কি "

" তুই সুঁচ সুতা আন গিয়ে, এ নির্জ্জন নদীতীরে, বকুলের তলে বসে বসে দুজনে মালা গাঁথব আর প্রাণের কথা বলব।"

" তাই " বলিয়া চপলা কমলাদৌড়িয়া চলিয়া গেল।

বেলাকে নির্জ্জনে পাইয়া চিন্তা আসিয়া তাহার শূণ্য হৃদয় দখল করিয়া লইল। সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-শোভিত ক্ষীণাঙ্গী নদীটী বসন্তের অর্দ্ধোদিত সূর্য্যের আরক্তিম রাগে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারি উপর দিয়া পালভরে নৌকাগুলি চলিতে চলিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে— সে উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। বেলা ভাবিতেছিল—" এমন নির্জ্জিব নৌকাগুলিও সঙ্গপ্রয়াসী—এ উহার দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে! কিন্তু কৈ আমিত জীবন-সমুদ্রে সঙ্গী খুঁজে পেলুম না। হায় বিধাতা আমাদিগকে এমনি অপদার্থ করে পাঠায়েছ, সঙ্গী খুজবার প্রয়াসটুকু পর্য্যন্ত করবার যো নাই! মাতা পিতা যাঁকে স্বামী বলে এনে দিবেন, তিনি অন্ধ হউন খঞ্জ হউন, অশিক্ষিত হউন— এমন কি মনের মত নাই হউন; তাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে হবে মুখ ফুটে একটু কথা বলার সাধ্য নাই।

* * * *

কমলার দিকে চেয়ে পড়তেই, কমলা বলিয়া উঠিল "কি ভাবছিস বোন"

" মোদের দুঃখের কথা, মোদের যাতনার কথা, সই "

" কেন বোন্ মোদের কিসের দুঃখ ? আমি তোমার সঙ্গে আছি বলে কি তুমি সুখী হতে পারনি, তাই বলনা বোন, আমি আর তোমার ছায়াটী পর্য্যন্ত মাড়াবনা । "

" না সই এদিনের ভাবনা নিয়ে আমি ব্যাকুল নয় ! চিরজীবনের সঙ্গীর মিলনাকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি ব্যাকুল । "

" তার জন্য ভেবে আকুল হতে হবেনা, একদিন যখন সময় আসবে, তখন তোমার জীবনস্বামী এসে তোমায় আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিবেন ।

বেলা মৃদু হাসিয়া বলিল " তোমার স্বামী এসে যে তোমায় আগে ছিনিয়ে নিবেন না, তা তোমায় কে বল্লে ? "

"সে কথা যাক বোন্ পরের কথা পরে, এখন মালা গাঁথা ছেড়ে আগের ভাবনা ভাবলে চলবে না । " বলিয়া চটুল কমলা গম্ভীর হইয়া বকুল ফুলের স্তূপ হইতে এক একটা ফুল লইয়া মালা গাঁথায় মন দিল । বেলাও মালা গাঁথিতে লাগিল ।

[আ]

হরিচরণ বোস অর্থবান ও বেশ বৈষয়িক লোক বলিয়া পাঁচ গ্রামে তাঁর বেশ নাম ডাক । সামান্য একটু দোষের জন্য কত নিরীহ প্রজা-কে নানা প্রকার ফেঁসাদে ফেলাইয়া আদালতের সাহায্যে সর্ব্বস্বান্ত করিতেন বলিয়া আস পাসের লোক তাঁহাকে 'বিষধর সর্প অপেক্ষাও অধিক ভয় করিত। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার একটা দুর্ণাম ছিল তিনি নাকি বদ্ধ কৃপণ !

বেলা হরিবাবুর একমাত্র কন্যা । সর্ব্বদা বৈষয়ীক কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তিনি কন্যাটিকে ও একমাত্র পুত্র শ্যামলালকে তেমন আদর স্নেহ করিতে পারেননি, তাহার স্ত্রী কিন্তু পুত্র-কন্যাকে প্রাণপন স্নেহ করিতেন ।

কমলা হরিবাবুর দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতা রমণীবাবুর কন্যা । রমণী বাবু লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিখিয়াছিলেন ও অবস্থা তেমন সচ্ছল নাথাকায়

কলিকাতায় চটের কলে কাজ করিয়া বেশ দু'পয়সা বাগাইতেন। তাঁহার তিনটী পুত্র ও দুইটি কন্যা। কন্যা দুইটীর মধ্যে কমলা বড়।

বাল্যে একত্র লীলা-খেলার মধ্য দিয়া বেলা ও কমলা উভয়কে উভয়ের সই করিয়া লইয়াছে। সামান্য একটু বিরহে উভয়ে কেমন হইয়া উঠে। একদিন যে উভয়ের স্বামী আসিয়া উভয়ের মাঝে একটা বিরাট অন্তরাল আনিয়া দিবে তাহা তাহারা ভাবিবার অবসর তেমন পায় নাই। মনে করিয়াছে এমনি করিয়া সারা জীবন হাসিয়া খেলিয়া কাটিয়া যাইবে।

লুকাইতভাবে যৌবন আসিয়া তাহাদের অঙ্গে একটা লাবণ্য—একটা জ্যোতি আঁকিয়া দিয়াছে! তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর সহিত মিলনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দিয়াছে— হৃদয়-বীণার তারগুলি যেন কোন অজানা অচেনা জনের হাত পরিবার জন্য ব্যাকুল উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! যৌবনের বেশী প্রতিপত্তি খাটিয়াছে বেলার উপর, যেহেতু সে কমলা হইতে প্রায় দুবছরের আগে এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

একটীমাত্র কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এমন অবস্থাবানের কন্যায় পাণিপ্রার্থী হইয়া কত শিক্ষিত অবস্থাবান না আসিবে, ভাবিয়া হরিবাবু কন্যার জন্য তেমন ভাবনা চিন্তা রাখেন নাই। তাঁর স্ত্রী কিন্তু কন্যার বিবাহের জন্য হরিবাবুকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। সেজন্য হরিবাবু অনেক সময় রাগিয়া লাল হইতেন আর মুখ সেঁটকাইয়া বলিতেন "যা যা আমার কন্যার আবার বিয়ের ভাবনা? দিনান্তে যার অন্ন জুটেনা সেও কন্যা দিচ্ছে আর আমি পারবনা।

রমণীবাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। একে একে তাঁহার দুইটী কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পন করিতে হইবে ভাবিয়াই ব্যাকুল। অনেক চেষ্টার পর কমলার জন্য একটী পাত্র ঠিক করিলেন। সে কলিকাতার কোন একটী মেসে থাকিয়া এম. এ পড়ে। রমণীবাবুর অবস্থা তেমন ভাল নয় তাহার উপর তিনি একটী শিক্ষিত বর ধরিয়া বড় বিপদে পড়িলেন। অমুক চাই তমুক চাই ইত্যাদি বাবদে প্রায় তিন-চার হাজার টাকা ব্যয়। মনের ক্ষমতার উপর অর্থের বিভীষিকা কিছুই নয়!

রমণীবাবু এ বিবাহে মত দিলেন।

একদিন ফাগুনের ভরা বসন্তে একটী বাঙ্গা বর আসিয়া কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার সইর কাছ হইতে টানিয়া লইল। বেলার প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। একদিন সে ভাবিয়াছিল কমলকে ফাঁকি দিয়া পলাইবে, কিন্তু সে কমলা আজ ফাঁক কাটিয়া পলাইল। কমলা শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় কেমন করিয়া বা তাহার সইকে ছাড়িয়া যাইবে, তাহার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিলেও, বেলা দেখিতে পাইল তাহার সইএর হৃদয়ে স্বামীর সহিত মিলনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সদাই যেন জাগিয়া আছে। আরও দেখিল—যে কমলার হৃদয়-সিংহাসনে সে এতদিন ভালবাসার পারিজাত-হার পরিয়া বসিয়াছিল আজ সেখানে একজন অজানা অচেনা লোক আসিয়া জোর করিয়া বসিয়াছে। আর তাহাকে সামান্য একটা কুক্কুরীর মত উপেক্ষা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অভিমান-দীপ্তা বেলা রাগে ফুলিয়া উঠিল। এদিকে তাহার অন্তরাত্মা স্বামীর সহিত মিলনের জন্য ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

[ই]

সই,

এখানে আসবার পর তোমায় দুখানা পত্র দিলুম, কিন্তু এমন কি দোষ করেছি, দুকলম লেখাও পেলুম না। তোমায় ছেড়ে আমি যে কেমন হয়ে গেছি ক্ষুদ্র চিঠিতে তা কি করে জানাব! কবে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, প্রাণে শান্তি পাব।

তিনি এল,এ দিচ্ছেন। আমায় কোলকাতা হতে পত্র দিয়েছেন শীঘ্রই বাড়ী পৌঁছবেন। তিনি একখানা নূতন ধরণের সাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওখানে থাকলে আমি কিন্তু আগে তোমায় পরাতুম। এক খানা এমন চিঠি দিয়েছেন, তা পড়ে আমি শেষ করতে পারিনা—যত পড়ি তত নতুন।

তোমার জন্য প্রাণ যেন আকুল হয়ে উঠে! কতদিন স্বপ্ন দেখি

তুমি আমি বকুলতলায় ফুলের মালা গাঁথছি, আর কতকি গল্প করছি। ভগবান কবে দিন দিবেন, তোমার সাথে দেখা করে বিরহের সমস্ত যন্ত্রণা দূরে ফেলব। আর বেশী দিন বোধহয় আমায় অপেক্ষা কর্ত্তে হবে না, শীঘ্রি তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পাব হয়ত। তুমি আমার ভালবাসা নিও। গুরুজনদিগকে প্রণাম দিও। পত্রের উত্তর দিতে দেরী কোরনা। ইতি—

তোমার বিরহ-ব্যথিতা
"সই"

এইরূপ কত পত্র আসে, কিন্তু অভিমানী বেলা তার একখানিরও উত্তর দিতে পারেনা। রাগে— অভিমানে সে জ্বলিয়া উঠে।

একে একে সুখে দুঃখে দুইটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিকে কমলা স্বামীর সহিত কতই আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেছে; অন্যদিকে তাহার হতভাগিনী সই স্বামীর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ভাবিয়া ভাবিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এক সই স্বামীর সোহাগে ভালবাসায় আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে আর এক সই স্বামী পাইবার ক্ষুদ্র আশা-দীপটী লইয়া নিরানন্দে ডুবিয়া যাইতেছে।

সদানন্দ একদিন শুভক্ষণে হরিবাবুর গৃহে পদার্পণ করিয়া আড়ম্বরে বেলার পাণিগ্রহণ করিল। সদানন্দের কেহ আপন জন না থাকায় হরিবাবুই অভিভাবক হইলেন, এবং সদানন্দকে বুঝাইয়া দিলেন— যখন তাহার নিজের কিছুই নাই তখন তাঁহার বাড়ীতে থাকাই সমীচীন।

দিনকতক আদর অভ্যর্থনার পর, হরিবাবুর বাড়ীর সকলে সদানন্দ-কে একজন কর্ম্মচারীর মত দেখিতে লাগিলেন। নদীতীরে হরিবাবুর একটী ধানের গোলা ছিল সেইখানের সর্ব্বে সর্ব্বা হইবার জন্য, হরিবাবু জামাতাবাবাজীকে অনেক বুঝাইলেন। জামাতাও শ্বশুরের কথায় সম্মত হইয়া শ্বশুরকে একজন সরকারের মাহিনা হইতে রেহাই দিলেন।

[৯]

সদানন্দ এখন আর জামাতা নহেন— সামান্য একজন সরকার মাত্র। যে বেলা একদিন কৈশরের চপলতায়, যৌবনের উদ্দাম মিলনাকাঙ্ক্ষায়

স্বপ্নের বিচিত্র কল্পনায়, স্বামীর কতইনা সুন্দর মূর্ত্তি আঁকিয়াছে! সে বেলার ভাগ্যে আজ এমন এক অকর্ম্মণ্য, নিঃস্ব স্বামী, উদর পূরণের জন্য শ্বশুরের বাড়ীতে সামান্য একজন সরকারের পদে থাকিয়া নানা-প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত! লজ্জায় ও ঘৃণায় বেলার অন্তর পুড়িয়া যাইত! কাহাকে মুখ ফুটিয়া একটুকু কিছু বলিতে পারিতনা কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অতিকষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিত।

একদিন আশ্বিনের মাঝখানে, দুর্গামাতার আগমনের পূর্ব্বে কমলা ও তাহার স্বামী রমণীবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাহাদের কি অভ্যর্থনা —কি অত্যধিক আদর যত্ন! সকলেই সে আনন্দে যোগ দিল, কিন্তু বেলা তার সইএর এ আনন্দে আনন্দিত মোটে হইলনা, অধিকন্তু হিংসায় রাগে অপমানে তাহার হৃদয়খানা তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল— হায় অদৃষ্ট এমন আদর অভ্যর্থনা সেত জীবনে একটি দিনও উপভোগ করিতে পারিবেনা।

গস্তদারের অভাবে সদানন্দকে ধান্য খরিদের সুবিধা দেখিবার জন্য দুই দিনের মত স্থানান্তরিত হইতে হইয়াছিল। কাজেই হরিবাবুকে ধানের গোলায় যাইতে হইল। ধানের গোলায় যাইয়া তিনি খাতা পত্র ভাল করিয়া দেখিলেন। দুইদিন পূর্ব্বে যে ধান্যকে সাড়ে ছয় আনায় বিকিয়াছে তাহারও দর আজ সওয়া এগার আনা হইয়াছে। গত বর্ষার সময় ছোট খামারের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে জল পাইয়াছে তাহা না লক্ষ্য করার জন্য, সে স্থানের অনেক ধান্য খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই অবি-বেচনার কার্য্যদ্বয়ের জন্য হরিবাবু রাগিয়া আগুন হইলেন। জামাইবাবু আসিলে যে তাহাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিবেন তাহাও হরিবাবু বাড়ীর সকলকে ও প্রতিবেশীগণকে শুনাইয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় যখন সদানন্দ সবে মাত্র বাড়ী পৌঁছিয়াছে হরিবাবু কোথা হইতে আসিয়াই জামাতার উপর পড়িলেন। এমন অবিবেচনার কার্য্য করিলে যে লক্ষ্মী জন্ম জন্মান্তরেও জুটিবেনা: তাহার

পুত্র যে অভাগা ও নির্ধন হইবে তাহাও তিনি বলিতে ছাড়িলেন না। আরও অনেক কড়া কড়া কথা সদানন্দকে শুনিতে হইল। শাশুড়ী ঠাকুরাণীও ভিতর হইতে দু চারটা কড়া কথা বলিয়া স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিতে ছাড়িলেন না। বাড়ীর সকলেই সদানন্দের প্রতি খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিল। হরিবাবু সর্ব্বশেষে ক্রোধে ইহাও বলিয়া দিলেন যে এমন অকেজো নির্ব্বোধ হইলে এখানে দিনান্তে একমুঠাও ভাত জুটিবেনা।

সদানন্দকে যে শ্বশুর বাড়ীর এই একটা নির্য্যাতন, অপমান সহিতে হইল তাহা নহে— অনেকদিন এরূপ আরও অনেক কথা সহিতে হইয়াছে। একদিকে দুইদিন ধরিয়া ধান্যের কোন উপায় করিতে না পারিয়া অন্যদিকে জৈষ্ঠের মধ্যাহ্নের সমস্ত তপ্ত কাঠফাটা রৌদ্রটা মাথায় ভাঙ্গিয়া সদানন্দ নিতান্ত রুক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছিল। আর শ্বশুর বাড়ীর দু মুঠা অন্নের জন্য এমন প্রাণপাত পরিশ্রমকে বিধাতার ভ্রুকুটি বলিয়া ঘৃণায় লজ্জায় তাহার অন্তর পুড়িয়া ছাই হইতেছিল। অগ্নিতে যেমন বায়ু সংযুক্ত হইলে দাউ দাউ করিয়া প্রবলাকারে জ্বলিয়া উঠে; তেমনই সদানন্দ এই ঘৃণিত উপেক্ষিত জীবনের দহনশীল চিন্তার উপর শ্লেষের, অবজ্ঞার বাক্যবাণ পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। মৌন সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে দেখা গেল তাহার রৌদ্রদগ্ধ দেহখানা একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; শুষ্ক বদনমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল।

একটী কথাও না বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল; ক্ষীণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোথায় কোনদিকে সে মিশিয়া গেল! কোথায় কোন পথে যাইবে তখন তাহার মনে কিছুই চিন্তা নাই— ঘৃণায় লজ্জায় ও রাগে তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া সদানন্দ তাহার উপেক্ষিত জীবনের অবজ্ঞাময় অধ্যায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিল। দোলায় বসিয়া কোন এক পল্লীঘরের গৃহিনী রোরুগ্ন সন্তানকে নানা সঙ্গীত গাহিয়া ঘুম পাড়াইতে ছিলেন। তিনি গাহিতেছিলেন,— "শ্বশুরের বাড়ী মথুরার পুরী। দু দিন পরে খেতে হয় ঝাটার বাড়ী॥" সদানন্দ তখন

সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, মনকে শান্ত করিয়া সে জননীর উপদেশ-বাণী শুনিল তারপর গভীর অন্ধকারের মাঝে ডুবিয়া গেল।

[উ]

সদানন্দের নিঃস্ব পিতামাতা কতইনা আশা আকাঙ্ক্ষা মনে লইয়া তাহার নাম সদানন্দ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার শাপে হউক আর সমাজের ব্যাভিচারেই হউক সে জীবনে সুখের দেখাটি পর্য্যন্ত পাইলনা। একটু দূরের সমাজে—একটু আগের সমাজে "বরপণ" প্রথায় শ্বশুরের মাথা ধূলার সঙ্গে একাকার হইতেছে আর অন্যদিকের সমাজে "ঘর-জামাই" লইয়া জামাতার প্রতি নিষ্পেষণ চলিতেছে।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বৎসর গেল কিন্তু সদানন্দ আর ফিরিলনা। হরিবাবু অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার খোঁজ পাইলেন না। শেষে সংবাদপত্রেও পর্য্যন্ত "নিরুদ্দেশ" দিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফল কিছু হইলনা।

* * * *

দুঃখে অভিমানে বেলা তাহার স্বামীকে কখনও ভালবাসার সময় পায় নি। ঘৃণায় অবজ্ঞায় তাহার গর্ব্বিত হৃদয় কতদিন সদানন্দের পরিশ্রান্ত হৃদয়ের উদ্দাম ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়াছে; নিস্বঃ গৃহহীন হতভাগ্য, এমনকি উদর পরণ জন্য শ্বশুরের সামান্য একজন সরকার মাত্র জ্ঞান করিয়া নিভৃতে নীরবে ঘৃণায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। দিন দিন যে কেবল তাহার বাহিরের আবরণ দেহখানা শীর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল তাহা নহে—তাহার অন্তরটাও নিজের অকৃতকার্য্যের জন্য— স্বামীকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করিবার জন্য পুড়িয়া খাক হইতেছিল। বেলা কখন যে কি করিত কখন যে কি বলিত তাহা তাহার জ্ঞানের ভিতর নহে।

পর পর পাঁচটী বৎসর গিয়াছে, সদানন্দের কোন প্রকার খোঁজ পাওয়া গেল না। এরি মধ্যে এক বৎসর অল্প বর্ষার জন্য বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে ম্যালেরিয়া গ্রামকে গ্রাম লোকগুলাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিল ও

উদরের ভিতর ছোট বড় প্লীহা দিয়া ফুলাইয়া রাখিল। কোন অশুভ ক্ষণে একদিন এই ম্যালেরিয়া বেলাকে ধরিয়া তাহার গৌরবর্ণ দেহ খানার উপর পাংশু মাড়াইয়া দিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ ঘন কেশগুচ্ছকে বিরল ও পাংশু বরণ করিয়া দিল. আর তাহার পুষ্টাঙ্গকে ক্ষীণ করিয়া দিল।

হরিবাবু ও তাহার পত্নীর আহারে শান্তি নাই, বিশ্রামে সুখ নাই। বেলার কথা ভাবিয়াই পাগল। যে বেলাকে অত্যধিক স্নেহের অনুরোধে কাছ ছাড়া না করিয়া জামাতার বাড়ীতে স্থান দিতেন, সে আজ এমনি পাগল উন্মত্ত! প্রথমে বেলার প্রতি স্নেহ মমতা ছিল কিনা জানা নাই, কিন্তু তাহার উপর এখন মাতাপিতার পূর্ণ বিরক্তি। তার মরণেও তাঁহাদের সুখ। বেলার অত্যধিক দৌরাত্ম্যে হরিবাবুর গৃহে শান্তিদেবী পা টী পর্য্যন্ত দিতে পারেন না।

অনেক ডাক্তার কবিরাজ আসিলেন, কিন্তু কেহই বেলার কিছু করিতে পারিলেননা। একদিন হরিবাবু একজন সন্ন্যাসীর সহিত কথা বলিতে বলিতে জানিতে পারিলেন তিনি নানা দুঃসাধ্য রোগ চিকিৎসা করেন।

সন্ন্যাসী বেলাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "বাহিরের ব্যারাম নয় এ ভিতরের ব্যারাম।

"ব্যারাম সারবে কেমন করে?"

সন্ন্যাসীর প্রশান্ত বদনমণ্ডলে বিদ্যুতের মত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "যখন সদানন্দ ফিরবে আর বেলার সাথে মিলিত হবে।"

হরিবাবু চমকিয়া উঠিলেন; বেলার স্বামী যে সদানন্দ একথা সন্ন্যাসী বা জানিলেন কিরূপে? তারপর কি ভাবিয়া বলিলেন "সদানন্দ এখনও জীবিত? সে কোন খানে?"

"হাঁ হরি, এখনও মরেনি—সে জীবিত। যেখানে তোমার ন্যায় হৃদয়হীন শ্বশুরের অত্যাচার নাই—অবিবেচক সমাজের উৎপীড়ন নাই সে সেখানে।"

হরিবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, কথা ভার হইল। তিনি ছল ছল

নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন সন্ন্যাসী ঠাকুর কবে সে ফিরবে? কবে সে আমাদিগকে ক্ষমা করবে?"

সন্ন্যাসী জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন "যেদিন তোমার মত হৃদয়হীন শ্বশুরের অত্যাচারের গন্ধ পর্য্যন্ত সমাজে থাকবেনা যেদিন সমাজ তার এ ভুল, এ অত্যাচার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করবে, অনুতাপের তপ্ত অশ্রু দিয়ে সমাজ তার প্রায়শ্চিত্ত করবে সেদিন। আরও বলি, যেদিন কৃপণ কুটিল শ্বশুরগণ, আদর যত্নের শ্রেষ্ঠ আসন হতে পরাধীনতার— শ্বশুরের দাসত্বের আসনে জামাইকে নামায়ে আনবেনা, হরি, সেদিন সে ফিরবে। আর ক্ষমা,— যেদিন অনুতাপের অশ্রুজলে বুক ভেসে যাবে দশ দশটা এমন উপেক্ষিত জামাইকে তার উপযুক্ত আসনে বসাতে পারবে, সেদিন সে তোমায় ক্ষমা করবে।"

তেমনি করিয়া সন্ন্যাসী সদানন্দের মত মৌন সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। কেহ তাঁহারও খোঁজ পাইল না।

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

—০*০—

আলোচনা।

—০*০—

বঙ্গীয় শ্রমিক সম্মিলনী:— ১৬।১৭।১৮ মার্চ্চ কাঁকিন আড়ক্কে উক্ত সম্মিলনীর ১ম বার্ষিক অধিবেশন কার্য্য শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তির সভাপতিত্বে সম্পাদিত হয়। তাঁহার বক্তৃতার মধ্য দিয়া তিনি আগা-গোড়া শিক্ষিতগণকেই নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন আজকালকার বিদ্যালয় বা কলেজ সকল উৎকৃষ্ট নগরবাসী বা বিশ্বস্ত স্বদেশ-সেবক গড়িতে পারেনা।" আমরাও দেখিয়াছি; অনেক উচ্চ শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিতগণকে দেশের হিতকর কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইতে— এমন কি বিরুদ্ধাচরণ করিতেও। আমরা শিক্ষিতগণকে অনুরোধ করিতেছি

তাঁহারা তাহাদের এ দুর্ণাম দূর করুন! তাঁহাদের শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে গ্রাম নগর উদ্ভাসিত হউক। আমরা তাঁহাদিগকে বড় বড় মাহিনার চাকুরিয়ারূপে দেখিতে চাইনা— আমরা দেখিতে চাই তাঁহাদিগকে সমাজ-সংস্কারক ও দেশহিতৈষীরূপে।

তিনি স্বদেশভক্ত যুবকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা শ্রমিকগণের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করেন। তাহা হইলে দেশের সমস্ত আন্দোলনে কেহ পৃথক থাকিতে পারিবেনা, আমরাও তাহার কথা প্রতিধ্বনীত করিয়া দেশবাসীকে ইহা জানাইতেছি।

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

—*—

বিবিধ সংবাদ।

—:—:——:—

শুনিতেছি এবৎসর টাটা নগরে রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইবে। ভারতে ইহা প্রথম। [সঃ বসুমতী ১০ই চৈত্র]

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বড় ছুটির পর জজীয়তি ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য প্রার্থী হইবেন শুনা যাইতেছে। [ঐ]

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় লাবনের উপর বর্দ্ধিত ট্যাক্সের প্রস্তাব রদ করিবার জন্য শ্রীযুত রঙ্গচারি একটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা গৃহীত হইয়াছে। [শিশির ৯ই চৈত্র]

বিশ্বের গৃহহীন পরিব্রাজকদিগের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতী" নামে একটী অতিথিশালা খুলিয়াছেন। [ঐ]

কলিকাতা নগরে বালবিধবার সংখ্যা ১৮২৫৬ সমাজের অবস্থা কি শোচনীয়! [ভারতবর্ষ ফাল্গুন]

গুণ্ডা বিল পাশও হইয়াছে, আর নূতন নূতন প্রথায় গুণ্ডার অত্যাচারও হইতে শুনিতেছি। [হিতবাদী ১০ই চৈত্র]

বিহার উড়িষ্যার কোন পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন মন্ত্রী মধুসূদন দাসের পদে খাঁ বাহাদুর ফখ্রুদ্দিন (Fakhruddin) নিযুক্ত হইবেন।

[Ameith bazer weekly]

"আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী প্রমুখ তিন জন মহিলা কাউন্সেলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। [মাঃ বসুমতি ফাল্গুন]

বিলাতে ১২ বৎসরের পুরুষের ঔরসে ও ১১ বৎসরের স্ত্রীর গর্ভে একটী সন্তান জাত হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে তবুও যৌবন বিলম্বে আসে। [শিশির ৯ই চৈত্র]

শোক সংবাদ।

গুমগড় পরগণান্তর্গত তাজপুরের জমিদার ৺বীরণারায়ণ জানা মহাশয় গত ১৬ই চৈত্র স্বীয় পরিজনবর্গকে কাঁদাইয়া পরলোক গত হইয়াছেন। ইনি দেশের অনেক হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ও স্থানীয় সমাজের নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমাজের যে একটা অভাব হইল তাহা আর পূরণ হইবেনা।

আমরা তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি ও পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

....

হরিপুর "বাণী" প্রেসে শ্রীযাদবচন্দ্র সিংহটাল দ্বারা মুদ্রিত ও নরসিংহপুর শোভনা অফিস হইতে শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত।

শোভনা

[প্রথম বর্ষ] [৬ষ্ঠ সংখ্যা]

১৩৩০ বৈশাখ

—•✻•— —•✻•—

—•✻✻•—

ব্রাহ্মণ।

পুরাকাল হতে মোরা মনে এই জানি
হে ব্রাহ্মণ! তোমরা সমাজ শিরোমণি।
অনাঘ্রাত শুভ্র পুষ্প সম তনু, মন,
দেবপূজা ধ্যানে রত প্রশান্ত বদন।
তুচ্ছ অর্থে অনাশক্তি, নাহি স্পৃহালেশ,
ব্রহ্মপদ-পরমার্থে মতি সবিশেষ।
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বিয়া
ধরা-হিত হেতু কর হোম যজ্ঞক্রিয়া।
শক্তি স্বাস্থ্য সংরক্ষণে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে
ভারত গৌরবান্বিত তোমাদের গুণে।
সে ব্রাহ্মণ্যগুণ কই? কেনগো পঙ্কিল
এবে অর্থ-লোভমোহে অঙ্গ অনাবিল?
অর্থাসক্তি অনর্থের তীব্র হলাহল,
পরস্পর-মাঝে আনে বিদ্বেষ প্রবল।
তোমাদের মাঝে আছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী
তোমাদের তাল, পাল; কেন কুৎসা, গ্লানি?
তোমরা না সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ?
সমাজ রক্ষক, প্রভু? একি আচরণ?

প্রকৃতিস্থ হও, লভ শ্রদ্ধা ও সমমান
শিক্ষা দীক্ষা গুণে জ্ঞানে হয়ে মহীয়ান্ ।
তোমাদের নীতিপূর্ণ শ্লোকছন্দ গীতি
সারাদেশে পরস্পরে আনুক সম্প্রীতি ।
প্রভুত্ব ও ঘৃণ্যভাব জাতীয় জীবনে
নহে সত্য মঙ্গলের, সাম্যভাব গুণে
তুল উচ্চে ধরে হাতে নিম্নস্তর জাতে,
ঘৃণা অবজ্ঞায় কারেও ফেলনা তফাতে ।
অতি দূরে সরে গেছে ঘৃণা, অবজ্ঞায়,
কাছে নেও করে জ্ঞানী গুণী সুশিক্ষায় ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস ।

—•✱✱•—

অনুপমা ।

[উপন্যাস]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীঅনিলকুমার রায়ের জীবনী হইতে গৃহীত ।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা কয়েক বন্ধু বেড়াইতেছি, এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের হাতে কয়েক খানি ছাপান বিজ্ঞাপন দিয়া গেল । বিজ্ঞাপন খানিতে লেখাছিল,—

অনুপমা থিয়েটার ! অনুপমা থিয়েটার !! অনুপমা থিয়েটার !!!

রবিবার ২২শে বৈশাখ রাত্রি আটটায় ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত নূতন গীতি নাটক—

সতীর জয় ! সতীর জয় !! সতীর জয় !!!

(মহাসমারোহে তৃতীয় অভিনয় রজনী)

বিজ্ঞাপন খানি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। একি সেই অনুপমা! সেই যতীন্দ্রনাথ! আমার একটী বন্ধু বলিলেন "অনিল বাবু, শুনেছি এই থিয়েটারখানি নাকি খুব ভাল হয়েছে, চলুন আজকের একবার এই নূতন থিয়েটারটা দেখে আসি।" আমারও মনের মধ্যে এই থিয়েটারটা দেখিবার জন্য কেমন একটা কৌতুহল জাগিতেছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম, "আচ্ছা চলুন।" তারপর মেশে ফিরিয়া কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। রাত্রি ৭টার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা দুই বন্ধু অভিনয় দর্শনে বহির্গত হইলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। টিকিট লইয়া দুইজনে আসন গ্রহণ করিলাম। কয়েক মিনিট পরে লাষ্ট বেল বাজিল, ড্রপ উঠিল। দেখিলাম একটা নদী বহিয়া যাইতেছে— নদীবক্ষে ছোট বড় কতক গুলি নৌকা পালভরে যাইতেছে, আর একটী যুবক একটী জলমগ্না বালীকাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া সন্তরন করিতেছে। এই দৃশ্যে আমার প্রানে বহুদিনের পুরাতন একটা স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। হায়! আমি ও এক দিন এমনি ভাবে একজন বিপন্ন বালিকার জীবন রক্ষার জন্য নদীতে সাঁতার দিয়াছিলাম, বিগত দিনের সেই ঘটনাটার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। অভিনয়ের দিকে মনকে কিছুতেই আকৃষ্ট করিতে পারিলাম না। অসাড়তার একটা সূক্ষ্ম আবরণ আমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া ক্ষণ কালের জন্য আমার সংজ্ঞা কাড়িয়া লইল। সংজ্ঞাহীন ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম জানিনা, সহসা সেই বালিকার কলকণ্ঠের সঙ্গীত-ঝঙ্কারে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলাম— বালিকা সেই যুবকের পদতলে নতজানু হইয়া গাহিতেছে—

তুমি ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিয়ো আমি অলির মতন গাহিব গান।
তুমি চাঁদের মতন জোছনা ঢালিয়ো আমি চকোর মতন করিব পান।
তুমি বসন্ত মতন জীবনে আসিয়ো আমি পাপিয়া মতন তুলিব তান।
তুমি অনল মতন জ্বলিয়া উঠিয়ো আমি পতঙ্গ মতন ত্যজিব প্রাণ।

গান ফুরাইয়া গেল। তথাপি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গানের মূর্চ্ছনা কেবল আমার প্রানে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অভিনয়ের প্রত্যেক দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিতে লাগিল। আমি আর চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। নয়ন মুদিয়া মূর্চ্ছিতের মত চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গিয়াছিল মনে নাই। যখন প্রকিতিস্থ হইলাম, দেখিলাম— সেই বালিকা অন্য যুবকের হাত দুইটী ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে,—"যতীনবাবু, হিন্দুর মেয়ের কি দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়? আমার পাবার আশা ত্যাগ করুন আমি একজনকে ভালবেসেছি— তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা করেছি। তাঁরই পায়ে আমার প্রাণ মন সমর্পণ করেছি। লোকতঃ না হউক, ধর্ম্মতঃ তিনি আমার স্বামী—আমি তাঁর স্ত্রী।"

ধীর স্থির স্বরে সেই যুবক কহিলেন—"অনুপমা, সীতা সাবিত্রীর দেশে আমার জন্ম, সতীর মর্য্যাদা আমি বেশ চিনি। ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি— আজ হতে তুমি আমার ভগ্নী—আমি তোমার ভাই!"

তাঁহার ভূমিকা শেষ হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে উপর্য্যুপরি করতালি পড়িতে লাগিল— আনন্দ-ধ্বনিতে অভিনয় গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার বন্ধুটীও চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু আমি আনন্দ-সূচক হৃদয়ের কোন উচ্ছ্বাসই জ্ঞাপন করিতে পারি নাই। আমার মন তখন কেবল আমার অকৃতজ্ঞতার জন্য আমাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। হায়! এত দিনের এত বিপদের মধ্যে পড়িয়াও সে আমাকে ভুলে নাই আর আমি কিনা এক মুহুর্ত্তের নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কি অকৃজ্ঞ আমি! আমিনা একদিন তাহার কাছে বলিয়াছিলাম আমি এত অকৃতজ্ঞ নইযে তারে এত সহজে ভুলে যাব? ধিক আমার উচ্চ শিক্ষায়! ধিক আমার মনুষ্যত্বে!

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম— নয়ন-জলে তাহার বক্ষ প্লাবিত করিয়া, বারংবার তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার এ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিব।

অভিনয় শেষ হইলে বাসায় ফিরিলাম। সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বিছানায় পড়িয়া ছটপট করিতে করিতে রাত্রির শেষ ভাগটা কাটাইলাম।

পরদিন প্রাতে পূর্ব্ববর্ণিত থিয়েটারের ম্যানেজার যতীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে চলিলাম। যতীনবাবু তাঁহার ড্রইং রুমে বসিয়া একখানা সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন. আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মুখের ভাবে বোধ হইল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিলাম না। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া আমি একেবারেই কহিলাম—" মহাশয়, আপনিই কি সতীর জয় এর প্রণেতা ? "

তিনি বিস্ময়-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"হাঁ, আমিই এর প্রণেতা, আমি এটা একটা সত্য ঘটনা অবলম্বন করে লিখেছিলাম"

আমি বলিলাম—যদি আপত্তি না থাকে জানতে পারি কি আপনি এ ঘটনাটা অবগত হলেন কোথেকে ?

আমি এ কাহিনীটা এর নায়িকার কাছ থেকেই শুনেছিলুম। আর তাঁরই অনুরোধে এটা অভিনীত হচ্ছে।

দয়া করে বলতে পারেন, তিনি এখন থাকেন কোথা ?

তিনি এখন এই বাড়ীতেই থাকেন।

মহাশয়; আমার তাঁকে কিছু বলবার আছে; অনুগ্রহ করে তাঁকে একবার জানাতে পারেন কি; কে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাইছে ? তিনি পর্দ্দার আড়ালে থেকে আপনার দ্বারা তাঁর জিজ্ঞাস্য আর বক্তব্য ব্যক্ত করবেন।

"আচ্ছা বসুন।" বলিয়া তিনি সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমি নীরবে বসিয়া আশার তুলিতে মিলনের একটা মধুর ছবি আঁকিতে লাগিলাম। কয়েক মিনিট পরে পাশের দরজাখানি খুলিয়া গেল—

দেখিলাম—অনুপমা সর্ব্বাঙ্গে বসন আবৃত করিয়া ধীর-মন্থর গমনে সে কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি সকাতরে কহিলাম,— "অনু, নিরাশার তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে তোমার বুকে শেল বিঁধেছি। আজ আমার ভুল ভেঁগেছে—চৈতন্ত হয়েছে। আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ তাই এতদিন তোমায় ভুলে ছিলাম। এ অকৃতজ্ঞকে তুমি কি ক্ষমা করবে বল?"

অনুপমা আমার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ছি! কিসের ক্ষমা দেবতা! কাকে ক্ষমা করব—তোমাকে! তুমি অমন কথা বলে আমার প্রাণে ব্যথা দিওনা। শুধু তোমায় একটীবার দেখতে পেয়ে আমি অতীতের সব জ্বালা—সব যন্ত্রণা ভুলে গেছি। আমার প্রাণে কি এক আনন্দের উৎস বয়ে গেছে।"

সে আর বলিতে পারিল না—আনন্দে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, সে আমার বক্ষের উপর ঢলিয়া পড়িল। তাহার সেই কমনীয় স্পর্শে আমার বুকের উপর চাপান একখানা ভারি পাথর সরিয়া গিয়া বুকটাকে হালকা করিয়া দিল। আমার ধমনীর গতি চঞ্চল হইল, সমস্ত শরীরে যেন কি একটা প্রবাহ খেলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

আরোহন।

অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ লঙ্ঘি, উচ্চতরে
আরোহি, আরোহী যদি নিম্নে কভু হেরে
সেকি কভু হেরে সেথা অসম অচল
সমুন্নত সমশীর্ষ, সব সমতল।
জ্ঞান-উচ্চশৃঙ্গে নর হলে আগুয়ান;
উচ্চ নীচ নাহি দেখে সবই সমান।

শ্রীপরেশনাথ ভূঁইয়া

চিন্তা।

কাজ আমার নাইকো কিছু,
কেবল করি চিন্তা গো,
আমি যে ভবে একাই যেগো,
মোরযে কেহ নাইগো।
কেবল আমার প্রাণের সখা
নামটী তাঁর হরিগো,
এতযে আমি ডাকছি তাঁরে
সেত কই আসেনা গো।
করব কেবল চিন্তা তাঁরে
পাই কিনা পাই দেখবো গো,
চিন্তা ছাড়া এ জগতে মোর
আর কিছুই নাই গো।
সারা দিবা নিশি চিন্তা করে
কাটে আমি কাটাবো গো,
করছি এত ভাবনা তবু
কেন দেখা দাওনা গো।
আমি যে জানি দুঃখে কাতর—
পরের লাগি তুমি গো,
এখন দেখছি তুমি অতি
নিঠুর ও কঠিন গো।
যতই কেন দাওনা কষ্ট
ছাড়বনা যে আমি গো,
কাটাবো যে আমি দিবা রাত্রি
চিন্তা করে তোমায় গো।
এত করে যে ডাকছি আমি
দেখা কই দিলেনা গো,
চিন্তা করে যে হলেম সারা
অশ্রুযে সার হল গো।

শ্রীগৌরেন্দ্রমোহন সরকার।

হিন্দুসমাজে নারী ।

—•:*****:•—

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে নারীর অধিকারের গণ্ডী এত সঙ্কুচিত যে তদ্বিষয়ে ভিকল্পে নানা পত্রিকায় নানা ভ রনমণিত প্রবন্ধ ও কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আকুল উচ্ছ্বাসে গাহিতেছেন,

"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এভারত আর জাগেনা জাগেনা ।

কেহবা স্ত্রীস্বাধীনতা প্রাপ্তির আশায় নারীগনকে প্রবুদ্ধা হইতে বলিতেছেন,

"ঘরের কোনে দুয়ার এঁটে বন্দী কেন রহিস্ নারী,
পরিস্ কেন যুগল পায়ে অধীনতার শিকল ভারী ।

* * * * * *

পর্দ্দানশীন পতিব্রতা লক্ষ্মী সতী বাঙ্গলার মেয়ে,
চিরকালই অন্ধতা এই রইবে তোমার জীবন ছেয়ে ?

* * * * * *

জীবন তোমার পীড়ন সয়ে চুপটী করে শুধুই কাঁদা,
ঝাঁট দেওয়া আর ঘর নিকানো চচ্চড়ি শাক ছেঁচড়া রাঁধা ?

* * * * * *

মুক্তিপথের যাত্রী হয়ে যোগ্য হওয়া চাই যে আজ,
বিদ্রোহিনী ! কণ্ঠে তোমার গর্জ্জে উঠুক রুদ্র বাজ।

স্বামী—বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,

"জগতের কল্যান, স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে, সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব হয়না। আরও বলিয়াছেন—

"যাদের মা শিক্ষিত নীতিপরায়না হয়, তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যে কতগুলি Manufacturing machine করে তুলেছিস্।

এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্ট ও ভক্তি দেখা যায় পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখা যায়না। এদেশে ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় প্রভৃতি

দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা তোদের উন্নতি করতে পারলিনে!"

"নারী„ নরকস্য দ্বারম্‌।" "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যম স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" "স্ত্রী শূদ্রৌ নাধিয়তামিতি।" "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" প্রভৃতি কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক নারীর সামাজিক অধিকার এতদূর নষ্ট করিয়া দিয়াছে যে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনস্বীগণ এই সকল শ্লোকের দুষ্টভাব ও রুদ্ধ সমাজের আচারানুষ্ঠানের অবরোধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারেন নাই। তবে আজ সামাজিক চিরাচরিত প্রথার উজান বাহিয়া যে স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে সমূহ বাধা বিপত্তিকে উজাড় করিয়া নারীর পারিপার্শ্বিকতা বিভিন্নভাব ধারণ করিবে, নিঃসন্দেহ।

নারীগণ প্রাচীনযুগে কতদূর স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন, তাহার আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। "ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানাং বিন্দতে পতিম।" কুমারী ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের পর পূর্ণযুবাস্থ পুরুষকে প্রাপ্ত হইবেন, এই শ্লোক হইতে প্রমাণ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেন ও জ্ঞানবতী হইলে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হইয়া পতিমনোনয়ন করিতেন। "ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ" যজ্ঞ সময়ে স্ত্রী এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। বেদাদি শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বে না করিলে কিরূপে স্বরসহিত মন্ত্রোচ্চারণ ও সংস্কৃতভাষণ করিতে পারিবেন? ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের ভূষণস্বরূপ গার্গী শাস্ত্রপাঠ করিয়া পূর্ণ বিদুষী হইয়াছিলেন, ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীগণ যে শিক্ষিতা ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। খনাদেবী যে জ্যোতির্বিদ্যায় বিদুষী ছিলেন তাহা আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন। পূর্ব্বে যে অবরোধ প্রথা ছিলনা তাহা সকলে জানেন। আমাদের গৃহস্থিত সীতারাম, নলদময়ন্তী প্রভৃতি চিত্রপটে তাহার প্রমাণ পাই। আর্য্যাবর্ত্তে রাজপুরুষদিগের স্ত্রীগণ যুদ্ধবিদ্যাও জানিতেন, না জানিলে কেকয়ী প্রভৃতি নারীগণ দশরথাদির সহিত যুদ্ধস্থলে কিরূপে যাইতেন এবং যুদ্ধ করিতে পারিতেন? রাজপুতললনাগণ যে অশ্বারোহন করিতেন সে প্রমাণও আছে।

বর্ত্তমানকালে হিন্দু ভদ্রগৃহের মহিলাগণ অজ্ঞতায় বিধ্বস্ত এবং নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা অজ্ঞতায় উপরন্তু পরিশ্রমে বিধ্বস্ত। ইহাদিগকে শিক্ষিতা করিয়া না তুলিলে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি আশা করা যায়না। স্ত্রীলোকের সাহিত্য ধর্ম্ম, বৈদ্যক, গনিত ও শিল্পবিদ্যা অবশ্য শিক্ষনীয়। কারণ উহা না করিলে সত্যাসত্য নির্ণয়, পতি প্রভৃতির প্রতি অনুকুল ব্যবহার, যথাযোগ্য সন্তানোৎপত্তি, সন্তানের পালন বর্দ্ধন ও সুশিক্ষাপ্রদান যথাপ্রয়োজন গৃহকার্য্য সম্পাদন এবং অপরকে করিতে বলা, এবং বৈদ্যক -বিদ্যানুসারে ঔষধৎ অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করা এবং অপরকে করিতে বলা ইত্যাদি কার্য্য কখন করিতে পারিবে না।

এই সকল কারণে স্ত্রীশিক্ষা বর্ত্তমান কালে ভারতের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদিন পুরুষগণ স্ত্রীদিগকে সহধর্ম্মিনী মনে না করিয়া একমাত্র সোহাগের পাত্রী বা সেবাদাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন ততদিন ভারতীয় সমাজের উন্নতি অসম্ভব। স্ত্রীগণ যেরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকূপে পতিতা হইয়াছেন, তাতে তাঁহারা যে পুরুষের সাহায্য ব্যতীত অদূর ভবিষ্যতে আলোক দেখিতে পাইবে, এরূপ ধারণা করা যায় না। তবে পুরুষগণ চেষ্টা করিলে অনায়াসে স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধান করিয়া সমাজকে উন্নত করিতে পারেন। যদি তাঁহারা এরূপ না করেন, তবে তাঁহারা ভগবানের নিকট দণ্ডার্হ, কারণ তাঁহারা স্ত্রীদিগের প্রতি অন্যায় করিতেছেন; আর স্ত্রীগণ যদি উত্থানের প্রচেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারাও দণ্ডার্হ, কেননা তাঁহারা বিনা আপত্তিতে অন্যায় সহ্য করিতেছেন।

শ্রীগোরাচাঁদ গিরি।

হিন্দুর মাতৃহত্যা, গোহত্যা ও শিশুহত্যা।

—*************************—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এটা অবশ্য সকলকে স্বীকার করেতে হবে ১৫—২০—২৫বৎসর বয়সে মানুষের মনে যৌন সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল অন্য সময়ে তেমন নয়। আর এই বয়সের শতকরা—৬০জন কি ততোধিক বিধবার চরিত্রে অল্প বিস্তর পরিমাণে নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা ঘটে। ফল যাহা হয় তাহা সেই মাতৃহত্যা ও শিশুহত্যায় পর্য্যবসিত হয়। এ সব দুর্গতির জন্য বিধবাদের এক বিন্দু দোষ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই দিতে পারবেনা। এই সকল বিধবাকে যথোচিত শিক্ষা কার্য্য দিয়ে পাপ-পথ হতে বিরত রাখাত দূরের কথা— আমরা তাদের নৈতিক জীবনের কণ্টক হই। কিন্তু আমাদের এমন সৎ সাহস থাকেনা যে, যে বিধবাকে আমরা ভালবাসি তাকে বৈধরূপে বিবাহ করি তাহা যদি না করি, তবে তার গর্ভজাত সন্তান পালনের ভার নিই। কিন্তু আমাদের সমাজ সে পথের কণ্টক। সমাজ কিন্তু পুরুষের দোষের শাস্তি দিবেনা।

যারা পশু তারা এমন সমাজকে মানে। যে পিতা পিশাচ সে নিজ যৌবন-গাঙে ভাটাপড়া নষ্ট-যৌবনা স্ত্রীকে নিয়ে এক প্রকোষ্ঠে আমোদ-প্রমোদে রত থাকে এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য প্রকোষ্ঠে স্থিতা ষোড়শী বিধবা কন্যাকে তার যৌবন-তরঙ্গ রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচারিণী থাকিতে উপদেশ দেয়। যে পিতা যদি সন্তানের প্রকৃত অবস্থা বুঝিত সে অবশ্য সর্ব্ব সমাজকে পায়ে দলে নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিত। হে! বাঙ্গলার তরুণ সম্প্রদায়, তোমাদের কি পায়ে এমন শক্তি নাই, যাতে কি এমন সাহস নাই যে এ সমাজকে শতধা ভেঙ্গে ফেলতে পার? যদি কেউ পার ত এস। সমাজ পিশাচের করাল গ্রাস হতে মাতৃজাতিকে উদ্ধার করি এখনও কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? এখন কি এই কোটি কোটি সন্তান-হারা স্বামী-হারা নিঃসহায় দুর্ব্বল নারীর ক্রন্দন কাণে পশে নি? যদি শুনে থাক এস, সমাজ-গণ্ডি লাথিতে ভেঙ্গে ফেলে, এস হাত ধরাধরি

করে বাঙ্গলায় ধ্বংসের বন্যা আনায়ন করি। সহস্র নারীর অসহায় ক্রন্দনে নীরব অশ্রুতে বাঙ্গলার শ্যামল বুকে যে দাবাগ্নি দাউ দাউ করে উঠেছে তা আমাদের এই নিষ্ঠুর সমাজ-বিধ্বংসী বন্যা না আনলে নিবৰে না।

আমাদের সমাজের এ দুর্দিনে তরুণ বাঙ্গলার তরুণ যুবকদের যে কতদূর আবশ্যক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমাজের যত বুজরুকী, যত সঙ্কীর্ণতা সব আমাদের দূর করতে হবে। সমাজধ্বজার নিষ্ঠুর প্রভাব পায়ে দলতে হবে। আমাদের প্রথম চেষ্টা এই হওয়া উচিৎ যে, যেন আমরা ১৩ বৎসর বয়সের কম বয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ না করি। পন প্রথার মুখে থুথু ফেলতে হবে। টাকার দায়ে নিজেকে কন্যার বাবার পায়ে দলবে না। আমরা সচরাচর দেখতে পাই অনেক যুবক বি এ, এম এ, পাশটা নিজের আর্থিক অবস্থার সঙ্কোচ সত্ত্বে— কোন রকমে এমন কন্যার পাণিগ্রহণ করে যে বিবাহে খুব পন নিয়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় হয়। এ জঘন্য প্রথা সমূলে বিনাশ করতে হবে। নিজের অবস্থা যদি খারাপ হয় আর বিবাহই যদি করিতে হয়, তবে সকলের প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ যে তাঁরা যেন উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ না করেন।

তারপর বরের বয়সের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবকের সহিত ১২ বৎসর বয়স্কা বালিকার মিলন দূর করতে হবে। এ ছাড়া ১২। ১৩ বৎসর বয়সে যদি নিজের বিবাহিতা পত্নী নারীত্বে পৌছে তবে সেসময়কে যেন যৌন সম্মিলনের সময় না ভাবা হয়। যুবক নিজের পত্নীর রূপ ও স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্য সন্তানের মঙ্গলের জন্য যেন এ বিশয়ে বিশেষ সংযমী হন। গর্ভবতী পত্নীকে যেন বেশ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দকর অবস্থায় রাখা হয়। প্রসবের

অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে এবং পর প্রসূতিকে যেন সাংসারিক কোন পরিশ্রম জনক কার্য্যে যোগ দিতে না দেওয়া হয়।

তল্প বয়স্কা বিধবা বালিকাদের পুনর্বিবাহের উৎসাহ দিতে হবে। আমরা যেন সমাজের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেও বিবেকানুমোদিত কার্য্য করি। আমাদিগকে অল্পবয়স্কা অর্থাৎ অক্ষতযোনি বালিকাদের বিবাহ করতে হবে।

অধিকবয়স্কা বিধবারা যাতে সৎপথে থাকে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। তাদের জন্য এমন প্রতিষ্ঠান এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যা দেশের দশের উপকার হবে। দরিদ্র বিধবার জন্য গ্রামের মধ্যে একটি ঘর নিতে হবে। তাতে চরখা, উলের কাজ, প্রত্যেক গ্রামের উপযো[গী] সব কাজের বন্দোবস্ত থাকবে।

তারপর অশ্লীল সংসর্গ জাত সন্তানগুলিকে যাতে নষ্ট করা না হ[য়] তার যথারীতি বন্দোবস্ত করতে হবে এবং সেই সন্তান ও তার মাকে সমাজে নিতে হবে।

প্রত্যেক পিতা যেন নিজের মেয়েকে পুত্রের মত শিক্ষা দেন তাদের ভাবা উচিৎ যদি সে কন্যার উপযুক্ত বর না পাওয়া যায় তবে কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যেন নিজে উপার্জ্জনক্ষম হতে পারে। আমাদে[র] ভাবা উচিৎ বিবাহটা যে শুধু স্ত্রীর আবশ্যকীয় তাহা নহে। পুরুষে[র] যোল আনা। এমন ক্ষেত্রে যে কন্যার পিতা এ কথা না মনে করে পারেন তাঁকে যে আমি কি ভাষায় সম্বোধন করব বলতে পারি না। পিতার মহা ভাবনা হয় পাছে মেয়ে বিয়ে না দিলে মেয়ে নষ্টচরিত্র হয়। কেন, সন্তানকে জন্ম দিয়ে তার চরিত্র বিষয়ে এত সন্দিহা[ন] যদি হও তবে কি সখে বিয়ে করেছিলে। আর এক কথা নিজে[র] পুত্র নষ্ট চরিত্র হলে সে যখন সমাজে ঠাঁই পায় তবে কন্যা যদি নষ্ট চরিত্রা হয় সে কেন পাবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরেশনাথ ভূঁইয়া।

আপনহারা।

—০:*:*:*:০—

অয়ি ইন্দু নিভাননে বর বর্ণিণী!
কেন অভ্র ভেদি গিরি অম্বরে ঢাকিয়া রাখিছ গোপনে
পূর্ণ চন্দ্রোপরি সুবিশাল চক্রদ্বয় করিয়া সজ্জিত,
কবরী উন্মুক্ত করি যেন নব জলধর-পৃষ্ঠে করিছ ধারণ।
মৌলী পার্শ্বে তাল বৃন্তদ্বয় করিয়া স্থাপিত
মরকত তাড়ঙ্ক তাহে করিছ ধারণ॥
সুধাংশু বদনে দ্বাত্রিংশৎ কলা রূপে তরবারি করিয়া সজ্জিত,
অধরোষ্ঠ কিশলয়ে করিছ গোপন।
তদুপরি মহাবলধারী নক্র দুটি সুসজ্জিত করি
ব্যোমচারী পরিমল করিয়া হরণ বিকুনিকা রন্ধ্রে করিছ প্রেরণ॥
অসিকোপরি অম্বুজরাগে সুরঞ্জিত সৃক্কনিদ্বয় স্থাপন করিয়া
(যেন) উদ্ভাসিত ক্ষণ প্রভায় বিমল কপোল দেশ করিছ শোভন।
কম্বুকণ্ঠে মুক্তাবলী সহ অপূর্ব্ব ময়ূখজাল করিয়া বিস্তৃত
যেন আবরিছে পঞ্চাননে গিরিশৃঙ্গ সহ।
কাঞ্চীপদে চন্দ্রোপল জিনি কিঙ্কিনী আয়ুধ নিগড়িত করি
যেন কেশরীনিন্দিত নিতম্বযুগল মহানন্দে রনক্ষেত্রে করিছে গমন॥
নিতম্ব পীড়নে অবসিত জঘন করি মৃদু গতি, গুল্ফ দেশে
শিঞ্জিনী দ্বয় রনঘণ্টা রূপে গম্ভীর নিক্কনে করিছে নিনাদ।
নাগ পাশ সম তব মৃনাল দুটী কেয়ূরে ভূষিত করি, উপত্যকা
প্রায় উরস্ প্রদেশে অব্যর্থ তুণীর তাহে করিছ গোপন।
কোকনদ জিনি চরণ দুটী অলক্তক রাগে সুরঞ্জিত করি,
চন্দ্রকান্ত মণি জিনি সীমন্তে শৃঙ্গার ভূষণ করিছ ধারণ॥
মরিচীকা প্রভা প্রায় সুরঞ্জিত কৌশেয় নিবসন করি,
কে তুমি ললনে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে গজেন্দ্র গমনে পথে করিছ গমন?
ত্রিভুবন বিজয়িনী বীরাঙ্গনা রূপে সুসজ্জিত হয়ে

দুর্ব্বলে পাইয়া কেন অপাঙ্গে অব্যর্থ বান করিছ সন্ধান ?
বহুদূর হতে আসিয়াছি আমি এই অজানিত দেশে,
আত্মীয় স্বজন কেহ না দেখি কোথাও, বলিতে আমার বলি—
পথমাঝে অভাগারে পাইয়া একাকী মর্ম্মগ্রন্থি মোর
ছিঁড়িয়া ফেলিছ তব অব্যর্থ সন্ধানে।
তাহে তব সায়ক সম্মুখে দর্পক তাপন অলক্ষেতে থাকি,
প্রহারিছে নিষ্ঠুরভাবে দুর্ব্বল হৃদয়ে।
আবার নাগপাশ সম তব মৃনাল দুটী
যদি উন্ধান করহ মোর কন্ধরা প্রদেশে,
তবে এই অভাগা হিমানী-সিক্ত পদ্ম প্রায়
ম্লান দেহে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া তুষারবৎ হইয়া জড়
চিরতরে শায়িত করিবে তব উপান্ত প্রদেশে।
কণ্ঠৌষ্ঠ বিশুষ্ক মোর উদন্যা প্রভাবে,
আক্কারণা সুনৃত বাণী না সরিছে আর।
তাই বলি এ দুঃসময় মোর রক্ষগো ললনে শান্তিসুধা বরিষণ করি,
নতুবা চিরতরে বঞ্চিত হইনু আমি ধরাতল হতে॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সবুজের আত্মকথা।

উপক্রমনিকা।

শস্পশ্যামা কানন কুন্তলা ভারতভূমি প্রকৃতই রত্ন প্রসবিনী। উহার সুবিশাল অরণ্যানীর শ্যামল গুহায় এমন রত্ন নিহিত আছে, যাহার কণামাত্র পাইলে মানুষের রোগজীর্ণ প্রাঙ্গন স্বাস্থ্য সম্পদে ভরিয়াউঠে। কিন্তু আজকাল আমরা এমন পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি যে চরণ নিম্নে কল্লোলময়ী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অস্তিত্ব ভুলিয়া পরপারের তমোময় গিরিশৃঙ্গ হইতে প্রবাহিতা স্বল্পতোয়া নির্ঝরিণীর পঙ্কিল জলে তৃষ্ণা মিটাইবার উদ্দেশে

ছুটিতেছি। কত যত্নে, কত অর্থব্যয়ে, রোগের জন্য বিদেশ হইতে ঔষধ আনিতেছি। এদিকে গৃহের প্রাঙ্গনে, বনবাদাড়ে শীতের পর শীত গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম ধরিয়া কতই মূল্যবান ঔষধ নীরবে শুকিয়া মরিতেছে তার ইয়ত্তা নাই। আজ ভারতের এ অধোগতির দিনে সবুজকুল দুঃখে চঞ্চল হইয়া "অনুসন্ধিৎসুর" কলমের মুখ দিয়া নিজের আত্মকথা প্রকাশ করিল। আশা করি উহা বাঙ্গালীর ঘৃণা বা হেলার পাত্র হইবে না। ইতি—

অনুসন্ধিৎসু।

অশোক।

আমি অশোক। আমি মৌর্য্য বংশ সম্ভূত চন্দ্রগুপ্তের পুত্র অশোক নই। আমি রাজাও নই প্রজাও নই, এমনকি আমি মানুষ নই। আমি পশুও নই পক্ষীও নই অথচ আমি হিন্দুর অতি পরিচিত। ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দু মাত্রেই আমার খবর অল্পবিস্তর পরিমানে রাখেন। লঙ্কা-পতি রাবণ পঞ্চবটী বন হইতে জনক-নন্দিনী সীতাকে চুরি করিয়া আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। বিরহ-বিধুরা জানকীর অশ্রুবারি-বিধৌত আমি হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র জিনিষ। আজও ভারত-বাসী হিন্দু শ্রীরাম-নবমীতে আমার ফুল মাথায় লইয়া রাম ও সীতার পবিত্র পুণ্য স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করেন। আমার এহেন দেমাকের কথা শুনিয়া আপনারা হয়ত একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। নিজের প্রশংসা জগতে কেই বা না করে? জগতে সকলে সমস্বরে বলিতেছে "ওগো আমাকে দেখ।" সুতরাং আমিও যদি তাই বলি তবে আপনাদের বিরক্ত হবার কিছুই নাই।

আমি মানুষও নই পশুও নই পাখীও নই আমি একটী গাছ। লম্বায় প্রায় আমি ১৪। ১৫ হাত হই। আমার গুঁড়ি বেশী বড় হইতে দিই না। পাছে; স্বার্থপর লোকে আমাকে কাটিয়া মারিয়া ফেলে। গুঁড়ি ৫। ৬ হাত বাড়িলেই যথেষ্ট। তারপর বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া যাই। আমার পাতা ৬। ৭ ইঞ্চি লম্বা ও ২। ১ ইঞ্চি চওড়া। প্রথম যখন

আমার পাতা বাহির হয় তখন লাল্‌চে রঙের হয়। কিন্তু তাকে আমি আর বেশি দিন লাল্‌চে রাখি না। কারণ, আমি বেশ জানি জগতে যে স্থন্দর ও কোমল তার সর্ব্বনাশ সকলেই কর্‌তে দৌড়ায়। এজগতে সুন্দরের ঠাঁই নাই। কোমলের আশাও বড় কম। আমি পাতাগুলোকে যখন বেশ লাল্‌চে রাখি তখন কতই লোকনা এসে তাকে আদর যত্ন করে ছিঁড়তে আরম্ভ করে। আমার লাল্‌চে পাতার প্রতি মানুষের বিকট স্নেহ দেখলে আমি ছেলেবেলায় শিশুপাঠে কংস ও মৃন্ময় পাত্রের যে গল্প পড়েছিলাম তাহা মনে পড়ে। আপনারা আশ্চর্য্য হবেননা। আমরা গাছ মানুষের মত আমাদের সুখ দুঃখ। আমাদিগকে মারলে আমরা কাঁদি। আমাদের ছুঁলে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। আমার বোন লজ্জাবতী লতাকে আপনারা ছুঁয়ে কখনও দেখেছেন কি ? সে বড় লাজুক আপনারা মানুষ আপনাদের মেয়েছেলেরা লজ্জায় বাহিরে কচ্চিৎ আসে। তাদের প্রায় আপনারা ঘরে বন্ধ করে রাখেন। কিন্তু আমরা গাছ হয়েও তত লজ্জা নাই। তবে স্ত্রীমানুষকে অপরে ছুঁলে সেত লজ্জা করবেই। আপনাদের মা বোনদের ভাগ্যে নীল আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস, কচ্চিৎ জুটে। আমাদের কিন্তু তাহা হয় না। আপনাদের ছেলেমেয়ে বাতাস না পেয়ে বাঁচে কিসে ? ওঃ ঠিক হয়েছে, সেদিন একখানা কাগজে দেখেছিলাম হিন্দুরা ফি বৎসর যত জন্মে তার বেশী মরে। এই উন্মুক্ত বাতাস আপনাদের স্ত্রীরা না পেয়ে এই দুর্গতি।

ফরিদপুরে খেজুর দাদার কথা শুনেছেন কি ? শুনে থাকলে আমাদের আর নির্জ্জীব বলে ভাববেন না। আপনারা মানুষ বড় নির্দ্দয়, কিন্তু আপনাদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশ বড় দয়ালু। তিনি আমাদের কত যত্ন করেন। কত আদরে তাঁর ইন্‌ষ্টিটিউটে রেখে আমাদের খাওয়াচ্ছেন। তিনিই এখন আমাদের ইতিহাস লিখছেন। তিনিই আমাদের দুঃখ ও বেদনা জগতকে জানাইতেছেন।

তারপর আমার লাল্‌চে পাতাগুলি পর পর বয়স বৃদ্ধির সহিত ফিকে ও গাঢ় সবুজ হয়। ফাল্গুনের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত আমার

লাল লাল ফুল ফুটে। সেই সময় বড়ই মুস্কিল, ছেলেরা আমার ফুল খেয়ে খেয়ে বড়ই বিব্রত করে। ভারতে যেখানে লোক রাম-সীতার কথা জানে সেইখানেই আমি আছি। শোভার জন্য আমাকে অনেকে বাগানে পুঁতেন। আমি নারিকেল গাছের মত স্বার্থপর নই আমার ছায়ায় আমি অন্য শাক সব্‌জীকে আনন্দে বাড়িতে দেই! "আত্মার বসুধৈব কুটুম্বকং।" আমার পাদদেশে মাটিও ভাল থাকে। আমি কৃতঘ্ন নয়, যে মাটি আমাকে আহার দিয়ে বাঁচায় তাকে অকৃতজ্ঞের মত তার স্বীধন হইতে বঞ্চিতকরিনা।

আমার ছাল তীব্র ধারক। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় এ্যাড্রিন্যালিন, লেড্‌ ও কপার সল্ট্‌স, আরগট। ট্যানিক এসিড্‌ প্রভৃতির সঙ্গে ধারক হিসাবে আমাকে স্থান দিতে পারেন। জরায়ু হইতে অত্যাধিক রক্তস্রাবে হাইড্রাস্‌টীস্‌ যে স্থলে ব্যবহৃত হয়, আমার ছালের পাচন দুধের সহিত সে স্থলে ব্যবহার করিতে পারেন। রোগিনীর ঋতুর চতুর্থ দিন হইতে রক্তস্রাব না বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত এক আউন্স করিয়া পাঁচন প্রত্যহ টাট্‌কা প্রস্তুত করিবেন। ঐ পাঁচন সালফিউরিক এ্যাসিডের সহিতও দিতে পারেন। সালফিউরিক এ্যাসিড ৫ ফোঁটার বেশী দিবেন না। আমার ফুলের রস ১৫ হইতে ৬০ ফোঁটা পরিমাণ রক্ত আমাশায় ব্যবহৃত হয়। অজীর্ন জনিত পেটের অসুখেও ঐ ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন! দেশীয় কবিরাজেরা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ৮ তোলা ছাল, ৮ তোলা দুধ ও ৩২ তোলা জল একত্রে ফুটাইয়া শেষ ১৬ তোলা প্রত্যহ দু তিন মাত্রায় জরায়ুর ঐঅধিক রক্তস্রাব রোগে প্রয়োগ করেন। আমার ছালের রস ঘি ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে "অশোক-ঘৃত" প্রস্তুত হয়। আমার কচি পাতা ফুলের পরিবর্ত্তে লোকে ব্যবহার করে।

অনুসন্ধিৎসু—

—*****—

নববর্ষে ।

এসেছ বরষ ! নিয়ে হাসি না কান্না,
সুখ না নিয়ে দুখ ?
শনির কুঞ্চিত দৃষ্টি, না নিয়ে
রবির স্মিত মুখ ?
পূবের আকাশে ছড়ান একটু
রাঙা ফাগের ঘটা;
অপর প্রান্তে কালো মেঘ একটু,
ধাঁধাঁয় প্রকৃতি ভাব্‌চা !
পাখীর গানে জেগে উঠে এযে
সুপ্ত হৃদয়-বীণা;
মরা নদীগুলি জীয়ে উঠে যেগো,
জাগে উর্ম্মি তুলে ফণা ।
ছোট তরীগুলি যায় নেচে নেচে
মহান্‌ সিন্ধুর বুকে;
মিলিবে সোনার কুল না মাঝে
পড়িবে ঘূর্ণিপাকে !
নাই চিন্তা নাই শঙ্কা একটুকু
মুখে কি উৎসাহ গীতি;
বেয়ে যায় দাঁড় দাড়ি, ঝিকি মিকি
সলিলে অরুণ-ভাতি ।
জাগ ভাই জাগ, অলস-শয্যায়
এখনও শুয়ে কারা ?
নব বরষের নব গানে জাগ,
কর্ম্মক্ষেত্রে যাও ত্বরা ।
যা নিয়ে নবীন বরষ আসুক,
যাওরে অতীত ভুলে,
আশায় সারা জগৎ চলিছে,
সুখ দুখ কর্ম্ম-মূলে !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র [illegible] ।

সুখ দুঃখ।

যদি না আসিত নিশা
তিমির ধরিয়া বুকে,
বিমল জোছনা-রেখা
ভাল হত কার চোখে ?
সকল কুসুম-বুকে
যদিরে থাকিত বাস,
ফুল-রাজ গন্ধরাজে
কে আর করিত আশ ?
না হত পঙ্কিল যদি
জগতে সরসী-জল,
স্বচ্ছ, নীরে এত আশা
কে আর করিত বল ?
প্রচণ্ড তপন-কর
যদিনা হইত ওরে,
বরষার বারি-ধারা
করিত শীতল কারে ?
যদি না ঝরিত ফুল
শীতের শিশির-পাতে,
ফিরিত কি মৃতদেহে
পরাণ, বসন্ত-প্রাতে ?
আছে বলে এ জগতে
ঘন ঘোর অমানিশা,
গগনের চাঁদে তব
সঁপে দাও ভালবাসা।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

আলোচনা।

(গৌড়াস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের আধুনিক অবস্থা)

পরম প্রীতিভাজন পল্লী-জননীর মর্ম্মবাণী মুখরা "শোভনা" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মহাশয়,

যদিও আমি সমালোচক নহি এবং আমার পেশাও উহা নহে তথাপি আজ, আমি আপনার শোভনা পত্রিকাখানি কয়েকবার পাঠ করিয়া, দু একটী কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষাটাকে ধৈর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আশা করি এই ক্ষুদ্র বক্তব্যটীকে সমালোচনার হিসাবে না ধরিয়া, মাত্র আমার প্রাণের অত্যধিক আনন্দোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করতঃ আপনাদের শোভনার ক্রোড়ে স্থানদান কৃপণতা করিবেন না।

গত পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় " গৌড়াস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের আধুনিক অবস্থা " শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া, বাস্তবিক আমি যত অধিক আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছি, ঠিক ততখানি কি তদপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণে বিস্ময়াপ্লুতও হইয়াছি। তাহার কারণ ইহা আমাদের এই সুদূর পল্লীর মধ্যে নিতান্ত নূতন আবেগময় চমকের স্ফুরণ বলিয়া। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার অনেক সুধীজন, বিশিষ্ট সংবাদপত্র সমূহ কত শত বার মর্ম্মন্তুদ ব্যথায় চীৎকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, সেই সকল গভীর আর্ত্তনাদভরা হইলেও একটু তীব্রতায় অনুলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। আজ এই পর্ণকুটীরাচ্ছন্ন পাড়াগাঁয়ের বুকের মধ্যে যে একটু সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকদিনের সেই অমর কবির চির নূতন " কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ, " কথাটার স্বার্থকতা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিবার অবসর পাইতেছি।

লেখক মহাশয় যদি কেবল গৌড়াগু বৈদিক ব্রাহ্মণকে না বলিয়া, দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের ঐ রকম অন্যান্ত শ্রেণীগুলির সম্বন্ধেও কলম ধরিতেন, তাহা হইলে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তরুণ লেখকের ভীত লেখনী যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট শিথিলতার এবং স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মানুষ, জাতি বা সমাজ যে বিজয়ী হয়, উন্নত হয়, তাহা সংখ্যায় নহে, কিন্তু শক্তি সংগ্রহে। কবির সত্য দৃষ্টি হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে বেশ বোঝা যায়, কোন্ শক্তিতে মানুষ, জাতি বা সমাজ নির্দ্দোষ হইতে পারিয়াছে। তাই আচার্য্যের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে,—

"—শুন বৎস বৃথা আস্ফালনে নাহি ফল।
রিপু বীর্য্য না করি বিচার
এহেন প্রতীতি নহে উচিত তোমার।
কূপবাসী মণ্ডুকনিচয় ভাবে,
বিশ্ব কূপটুকু॥

আজ এখানে সমাজ লইয়া কথা এবং সেইটীর সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে হইলে বা তাহার কোন কিছুর পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অপরের সহিত তুলনা করিতে হয়। সেই তুলনাটী সম্ভবতঃ অনেকটা প্রতিযোগিতায় আসিয়া দাঁড়ায়। আদর্শ সম্মুখে না ধরিয়া কে বা কাহারা বাস্তব উন্নতিতে উন্নত হইতে পারিয়াছে? নিজেদের বলাবল চিন্তা না করিয়া, যোগ্যতার সন্ধান না রাখিয়া, বাহিরের জাঁকজমকে অস্ফালনে কিস্তিমাৎ করিতে যাওয়া নিতান্ত অবিমৃষ্যকারীর কার্য্য নহে কি? বর্ত্তমানে সমাজের অবস্থা যে রকম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে তাহাতে প্রত্যেক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সকল বাদবিসম্বাদের আগাছাগুলিকে হৃদয় হইতে নির্ম্মূল করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া, স্বেচ্ছাচারিতা-কীটদষ্ট সমাজে মহীরুহের মূলদেশকে সুদৃঢ় করিবার

জন্ত বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ প্রবেদন ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। ইহার মধ্যে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বা দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু উহা যদি বাস্তবিক ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বা অপমান-সূচক বলিয়া বোধ হয় তাহাহইলে প্রকাশ্য বিচারে লেখককে দণ্ডনীয় করা যে যুক্তিযুক্ত তাহাতে কোন ভুল নাই। অন্তথায় মাত্র বাহিরের ঠাট্ বজায় রাখিয়া, বিষ-দন্ত হীন ঢোঁড়ার মত ছোবলের উপর ছোবল মারিয়া, হক্‌বক্তাকে সায়েস্তা করিতে যাওয়া নিতান্ত কুরুচির পরিচায়ক ব্যতীত অন্ত কি হইতে পারে?

একথা লিখিবার এখানে কোন আবশ্যক ছিলনা,— যদি এই ধান ভান্‌তে শিবের গীতটাকে সচীৎকারে গাহিবার জন্ত কেহ উসকাইয়া না দিত। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া কোন কোন সমাজ-বিধাতা নাকি বেজায় রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, উহা তাঁহাদিগকেই আক্রমন করিয়া লেখা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তিইত হয়না বরং বিস্ময়াবিষ্টের মতন মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে,—

"একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে রঘুরাজ?"

এই সকল কথার সমালোচনায় ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাজন যেরকম ভাবে এবং ভাষায় লিখিয়াছেন, সেইগুলি একবার উহাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দয়া করিয়া দেখিবেন কি? হক্‌কথা বলিবার ক্ষমতা যদি তাঁহাদের থাকে, তাহাহইলে এই দীন লেখকের অপরাধ কোথা হইতে আসিল?

এ বিষয় আমি কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে ব্যক্ত করিয়াছিলাম এবং উক্ত প্রবন্ধটীও পড়িতে দিয়াছিলাম। তাঁহারা যাহা মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা আমি এখন প্রকাশ

করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কারণ তাহা দ্বারা শুধু লেখকের নির্ভিক তেজস্বীতা এবং এ দুর্দ্দিনে তাঁহার প্রাণে কত ব্যথা লাগিয়াছে——প্রভৃতি বর্ননায় তাঁহার তোষামদ করা হয় বলিয়া।

তাই বলিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি এহেন দুঃসময়ে আত্ম-কলহপূর্ণ বাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া, সমাজের মধ্যে যদি কোথাও গলদ থাকে তাঁহাকে সুমার্জ্জিত করিবার জন্ত প্রচেষ্টিত হউন,——ইহাই একমাত্র মিনতি। এই সম্বন্ধে আমার আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। বারান্তরে প্রকাশ করিবার আশায় রহিলাম। কিন্তু লেখককে বলি,—

"যা হয় তা হোক,—যায়না থাকা মৃত্যুঘেরা এই কূলে
সাচ্চা প্রাণের ভরসাখানার পাল্‌টী তুলে মাস্তুলে
এই বেলা তোর পান্‌সীখানা দে খুলে।"

নিবেদক—
শ্রীবঙ্কিমবিহারী অগস্তি।

শেফালিকা।

(A)

রমেনবাবুর নব-বিবাহিতা পত্নী শেফালিকা পিত্রালয় হইতে যেদিন প্রথম স্বামীগৃহে প্রবেশ করিল, সেদিন অনেক দিনের সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত পুরাতন একটা স্মৃতি আসিয়া বালিকার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিদারুণ ব্যথাও জাগাইয়া তুলিল। সেই তাহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতামাতার অকাল মৃত্যুর কথা, আর সেই সঙ্গে তাহার মনে পড়িল—সেই রাখাল বালক শান্তশীলের কথা। পিতা মাতার মৃত্যুর পর সে যেদিন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়া

হইয়াছিল সেদিন কতইনা মহত্ব দেখাইয়া সেই রাখাল বালক তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল। তাহার পর আবার কেমন করিয়া সহসা একদিন সেই রাখাল বালক উন্মত্ত অবস্থায় কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। তাহার পর তাহার বর্ত্তমান জীবনের কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে— সে এক্ষনে বিবাহিতা হইয়াছে—ধনবান স্বামীলাভ করিয়াছে কিন্তু পিতামাতার সেই স্নেহ আর আশ্রয়-দাতা সেই রাখাল-বালকটীর কথা সে এখনও ভুলিতে পারে নাই!

(B)

একদিন বিকাল বেলা শেফালিকা তাহাদের বাগানে কতক গুলি ফুল তুলিতেছিল, এমন সময় একজন লোক তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শেফালিকা ফুল-তোলা বন্ধ করিয়া সঙ্কোচিত ভাবে ফিরিয়ার জন্য উদ্যত হইতেই সে ব্যক্তি কহিল—

কাকে দেখে সঙ্কুচিত হচ্ছ শেফালিকা? এযে তোমার সেই রাখাল-ভাই—শান্তশীল।

শেষের কথা কয়েকটী শ্রবন করিবা মাত্রই সে সাশ্চর্য্যে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থামিয়া গেল। তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে দেখিয়া শান্তশীল কহিতে লাগিল,—

আমি উন্মাদাবস্থায় গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া কিছুদিন পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াই। তাহার পর একদিন পাগলা-গারদে নিক্ষিপ্ত হই। তিন বৎসর কাল কারাগারে অবস্থান করার পর আমার চিত্ত স্থির হয়। স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একদিন বাটী আসিয়া তোমার সন্ধান লইয়া যখন জানিলাম— কোন এক ধনবান ব্যক্তির সহিত তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন আমি তোমার বিষয়ে একপ্রকার

নিশ্চিন্ত হইলাম। আর আমি তোমার সহিত দেখা করিতে চাহিলাম না। কিন্তু আজ সহসা তোমাকে এখানে দেখিয়া তোমার সহিত দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এমন সময় একজন ঝি আসিয়া ডাকিতেই শেফালিকা চলিয়া গেল। সেই অবধি মাঝে মাঝে তাহাদের পরস্পরের দেখা হইত। শেফালিকার এই রাখাল ভাইর কথা তাহার স্বামীর নিকট বলি বলি করিয়া বলা হইল না। কিন্তু তাহার এই আলস্যের ফলে একদিন বড়ই অশুভ ঘটিল। যে দাসীর আহ্বানে শেফালিকা ও শান্তশীল পরস্পর চলিয়া গিয়াছিল সে একদিন শেফালিকার সহিত কলহ করিয়া রমেন বাবুর নিকট তাহার চরিত্রে সন্দেহারোপ করিল। রমেন বাবু প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার পর আরও দুই একবার যখন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি ক্রমশঃ শেফালিকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে একটা দারুণ ব্যথা জাগিয়া উঠিল। তিনি যাহাকে সমস্ত প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিতেন তাহারই এই ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

* * * * * *

একদিন শেফালিকা রমেন্দ্রনাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা বলিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। রমেন্দ্রনাথ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

(C)

শেফালিকা রোগ-শয্যায় শায়িতা। ব্যথা ও বেদনায় তাহার স্বাস্থ্য একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রমেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিতে আসিতেন না। একদিন সে তাঁহাকে ডাকিয়া

পাঠাইল। শেফালিকার আহ্বানে রমেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সে তখন প্রলাপ বকিতে বকিতে অনেক বার তাঁহারই নাম করিতেছিল। রমেন্দ্রনাথ শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। শেফালিকা তাঁহার দিকে একটীবার মাত্র চাহিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল। তারপর—তারপর সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে রমেন্দ্রনাথের বুকে কে যেন সবলে আঘাত করিতে লাগিল। তাইত আমারই দোষে কি আজ একটী কুসুম অকালে ঝরিয়া গেল! হায়! আমি যদি তখন একটু তলাইয়া দেখিতাম তাহাহইলে হয়ত এতটা হইত না। দাম্পত্য প্রেমের প্রবল বন্যা তাঁহার প্রস্তর-কঠিন হৃদয়-বাঁধ ভাসাইয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিল।

শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী।

রত্ন কণা।

যেখানে মনুষ্যত্বের দৈন্য, শক্তির অভাব, প্রেমের একতার দরিদ্র, সেখানে সাক্ষর কি নিরক্ষর, পুরুষ কি স্ত্রী সবাই মরা।

জ্ঞান না থাকিলে মুক্তি ব্যর্থ হয়, আর ধর্ম্মজীবন না থাকিলে জ্ঞান ও মুক্তি দুইই জীবনকে লালসার খর গতিতে পঙ্কিল করে।

যে দেশে জগচ্ছক্তির এত অপমান, যে দেশের অর্দ্ধেক চৈতন্য এত অজ্ঞান পঙ্গু, যে দেশে মায়ের বুকে জাতির মাতৃ-প্রেরণা ও সৃজনী শক্তির সাড়া নাই, সে দেশের দৈন্য অবসাদ যে ঘুচিতে চাহেনা তাহাতে বিচিত্র নয়।

আত্মবিস্মৃতিই যে মৃত্যু, ব্রাহ্মণের অধঃপতনই তাহার প্রমাণ।

আলোচনা।

শিল্প :—

শিল্পের মধ্য দিয়াই জাতীয় স্বাবলম্বন—আত্মনির্ভরশীলতা এবং জাতীয় আর্থিক উন্নতি। শিল্প প্রতিষ্ঠানই জাতীয় মুক্তির সুদৃঢ় সোপান। যে জাতীর শিল্প প্রতিষ্ঠা নাই, শিল্প চর্চ্চা নাই, সে জাতি নির্জ্জীব মৃতপ্রায়! এক টুকরা কাপড়ের জন্যও যাহাকে হাঁ করিয়া অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—সুদুর পরাহত!

প্রতীচ্চে আজ যে ধনকুবের আমেরিকার দৈনন্দিন নূতন নূতন আবিস্কার— উন্নতির সুমেরু-শিখরে আরোহন; শিল্প প্রতিষ্ঠানই ইহার মূল। প্রাচ্যে আজ যে জাপানের নব অভ্যুদয় তাহাও কেবল এই শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। শিল্প না হইলে ব্যবসা বল, বানিজ্য বল কিছুই সুচারুরূপে চলেনা। জাতীর স্বাবলম্বন আসিতে পারেনা—জাতি আত্মনির্ভরশীল হয়না।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক জাতীর মুক্তি সংগ্রামেই নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জাতীর মুক্তি, দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারেনা।

শিল্পের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে না— দেশে বিলাসিতা আসিয়া জুটীবে। আবার অনেকে এমন শিল্প-প্রতিষ্ঠাতা আছেন শিল্পকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা আদৌ চেষ্টা করেন না বা চেষ্টা করাকে ভাল বিবেচনা করেন না। আমাদের মনে হয় তাঁহারা সেইখানেই ভুল করেন; তাঁহারা আসল কথা— শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান।

সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলাই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীর

সৌন্দর্য্য জাতীয় স্বাবলম্বন শিল্পের সৌন্দর্য্যের মধ্যে। জাতীর সেদিনের সুখের কথা মনে করুন, যেদিন টাকায় মস্‌লিন ছিল। আরও দূরে, মনে করুন জাতীর সেদিনের সুখসমৃদ্ধির কথা যেদিন ভারতে কলাবিদ্যা প্রস্তর-শিল্প ছিল। এইরূপ যতই পশ্চাতে আমাদের জাতীয় ইতিহাস খুলিবেন সেখানে দেখিবেন শিল্পের সৌন্দর্য্যতা ও সৌষ্ঠবতা আর জাতীর সুখ ও ঐশ্বর্য্য।

এই শিল্প হারাইয়াই আমরা জীবন সংগ্রামে দিন দিন হটিয়া যাইতেছি দিন দিন দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতেছি। এই শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই আমাদের সুখ সম্পদের স্বাদু-মন্দাকিনী-ধারা নামিয়া আসিবে জাতীর বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িবে! আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবেনা—গত সুখের কথা ভাবিয়া বিলাপ করিলে চলিবেনা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের দশের ও নিজের সুখৈশ্বর্য্যের ডাকিয়া আনিতে হইবে।

একদিনের চেষ্টায় দুদিনের চেষ্টায় আমরা সুন্দর শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিবনা সত্য— সুন্দর শিল্প আনায়ন করিতে হইলে আরও অনেক দিন। তার জন্য ভীত হইলে চলিবেনা! অভিষ্ট কার্য্যে একাগ্রতা চাই! আজ মুক্তিকামী মহাত্মার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চরখা ঘুরাইয়া শিল্প বিস্তার হাতে খড়ির কার্য্য সম্পাদন করি আসুন!

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া।

বিবিধ সংবাদ ও শোক সংবাদ।

১৫ই এপ্রিল মালদহে মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন বসে। তাহাতে নাতার সুসন্তান ডাঃ এইচ সার ওয়ার্দ্দি সভাপতির আসন গ্রহন করেন

নানা স্থান হইতে বঙ্গীয় প্রজা সত্ত্ব আইনের তীব্র প্রতিবাদ চলিতেছে।

মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন।

কাঁথিতে অভয়ানন্দ আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

আমরা কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, কাঁকুড়দহ জাতীয় বিদ্যালয় হইতে স্থানীয় অসহযোগী শ্রীযুত রমণীমোহন মাইতির সম্পাদকতায় একটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার উদ্দেশ্য শোভনার সমালোচনা করা। জাতীয় মুক্তির পথ, দেশের উন্নতির সোপান, সমাজের ব্যাভিচার ও কুসংস্কার প্রভৃতি এতগুলা জিনিষ কি সমালোচনার ভারে চাপা পড়া জাতীয় দলের পত্রিকার শ্লাঘার বিষয় হইবে? কংগ্রেসে দু দল শুনিয়া আসিতেছি— আবার কি নূতন দলের সৃষ্টি হইল নাকি? — নিন্দাকামীর দল। আমরা ভয়ে এতগুলা কথা বলিতেছি না বরং তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। সূতিকাগারে মরণ দেখিয়া লোকে হাসিলে দুঃখ রাখিবার স্থান রহিবেনা।

হোম পাইপ কোং মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীর হাতে ৫০০০০৲ দিয়াছেন। এবং মিউনিসিপালিটীর হাতে আরও অত টাকা আছে। তাহার দ্বারা লৌহ পাইপ নির্ম্মিত হইয়া মেদিনীপুরে জল সরবরাহ হইবে।

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ৺নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১২ই চৈত্র সোমবার ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় করুণ লেখক বড় একটা উপন্যাস সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত বিধবা বিবাহ তিনি করিয়াছিলেন ও প্রচলনের জন্য যত্নবান ছিলেন তাঁহার মত সাহিত্যিক ও স্বদেশ-প্রেমিকের অভাব বাঙ্গলা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে।

অশ্রুকণা:— শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সরকার প্রণীত কবিতা পুস্তক, প্রাপ্তিস্থান—প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও শোভনা কার্য্যালয়। মূল্য ।৵ কবি সহজ ও সরল ভাষায় পল্লী-চিত্র আঁকিয়াছেন। কবিতাগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও নূতন কবির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

....

হরিপুর প্রেসে শ্রীনটবর আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও শোভনা অফিস হইতে শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া দ্বারা প্রকাশিত।

শোভনা

প্রথম বর্ষ	সপ্তম সংখ্যা
১৩৩০	জ্যৈষ্ঠ

সূর্য্য।

সূর্য্যের বিকাশ ভবে যদি না থাকিত।
তবে বল সূর্য্যমুখী কার পানে চেয়ে থাকি,
কার ছবি বুকে ধরি, ফুটিত ঝরিত ?
কে দিত ফুটায়ে তবে প্রাণ-শতদল সবে,
দেহের সরসী-নীরে জীবন প্রভাতে ?
কে দিত মুছিয়ে বল রজনীর আঁখিজল,
কে দিত অধর তার ভিজায়ে হাসিতে ?
কে বল উষার ঘুম ভাঙ্গাইত দিয়া চুম,
গোলাপী অধর তার সোনালী আভায় ?
বল কে কিরণ দানি গড়ি ইন্দ্রধনুখানি,
সাজাত গগন-বক্ষ মোহন ছটায় ?

যদি না থাকিত বিশ্বে সূর্য্যের বিকাশ।
কে বল ধনীর দ্বারে, দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে,
সমান কিরণ বাঁটি হইত প্রকাশ ?
বল কে কোমল করে রাখিত সৃজন করে
গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, রজত চন্দ্রমা ?
কাহার আলেখ্য ধরে আপন বুকের পরে,
জ্যোতির্ম্ময় হোত বল আঁধার নিলীমা ?
বল কেগো বিশ্বপর বুলায়ে আপন কর
করিত শীতলে উষ্ণ অবনী ভিতর ?
বল কে সৃজিয়া বৃষ্টি, করিত ধরার সৃ[illegible]
ফলে ফুলে তরু লতা সুনীল সাগর ?

সোনার সূরজ ভবে যদি না থাকিত।
সলিল—সলিলময় হোত সব বিশ্বময়
আঁধারে ভরিয়া যেত চরাচর তবে।
তাহলে,তাহলে শৈত্য, সাজিয়া ভীষণ দৈত্য
চিবায়ে গিলিয়ে খেত চরাচর সবে।
তাহলে আঁধার-রাজা তুলি কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা,
অখণ্ড প্রতাপ নিজ দেখাইত ভবে।
শৈত্য আর অন্ধকার করি ঘন মার মার
সদর্পে গর্জ্জিয়া সৃষ্টি চরণে দলিত।
ধ্বংসের অতল তলে সকলি যাইত চলে
আঁধারে দেখাতে আলো কেহনা থাকিত।

শ্রীপরেশনাথ [illegible]

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ।

ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় একবার গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের আধুনিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সহিত মাহিষ্য জাতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইতিহাস পাঠেও বেশ অবগত হওয়া যায় যে এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রাচীন সময়ে গৌড়াধিপতি রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হইয়া তদানীন্তন কালের শক্তি সম্পন্ন মাহিষ্য জাতির আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং মাহিষ্য জাতিও এই ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় দান করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়াধিপতির উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করেন। এইরূপে প্রায় ৯০০ শত বৎসর কাল এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মাহিষ্য জাতির পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। মাহিষ্য জাতি এই সুদীর্ঘ কাল এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া বঙ্গের অন্যান্য সমাজের ভ্রূভঙ্গি হইতে নিস্তারও পান নাই। সামাজিক হিসাবে ধরিতে গেলে বঙ্গেরসমস্ত মাহিষ্য জাতি যেমন একপক্ষে এই ব্রাহ্মণ দিগের পৃষ্টপোষক, তেমনই অন্যপক্ষে বঙ্গের অন্যান্য জাতিও ইহাদের এবং ইহাদের আশ্রয় দাতা মাহিষ্য সমাজের সামাজিক গৌরব হানি করিতে এবং পরোক্ষে কুৎসা রটাইতে বদ্ধপরিকর। অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক মাহিষ্য জাতিকে "চাষা" ইত্যাদি হেয় আখ্যায় অভিহিত করণ বোধহয় এই সামাজিক দলাদলির ফল। অথচ বঙ্গের অন্যান্য অনেক শ্রেনী এই মাহিষ্য জাতির জন্মগত বৃত্তি কৃষিকার্য্যে পরাঙ্মুখ না হইয়া বরং ইহা গৌরব-জনক ও অর্থকরী বিবেচনা করিয়া অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। অন্যান্য জাতি মাহিষ্য-সমাজের এই পেশাদারি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় বরং মাহিষ্য জাতিকে বাধ্য হইয়া সংসার নির্ব্বাহার্থে আজকাল অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ
এবং মাহিষ্য সমাজের মধ্যে আশ্রিত ও আশ্রয় দাতা সম্বন্ধে এই
সম্বন্ধ আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৯০০ শত বৎসর অক্ষুন্ন রহিয়াছে।
আমাদের মেদিনীপুর জেলায় বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মাহিষ্য
জাতির সংখ্যা অধিক। তাহারা ধনবলে এবং সামাজিক
মর্য্যাদায় অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা হীনও নহে। পাশ্চাত্য
আদর্শ সংস্পর্শে আজকাল সামাজিক মর্য্যাদাও অনেকটা ধন-
গত হইয়া পড়িয়াছে। অর্থশালী মাহিষ্য জাতির যাজনাদি
কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উপার্জ্জনও
নিতান্ত অল্প নহে। অথচ এই সম্প্রদায় ধনগৌরবে অন্যান্য
জাতি অপেক্ষা নিতান্ত হীন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।
সমস্ত তমলুক মহকুমা কেন সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় একটীও
গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ নাই যিনি অর্থসম্পদে বলীয়ান বলিয়া
মনে হয়। এই বিষয় চিন্তা করিয়া আরও মনে হয়
এই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ মাহিষ্য সমাজের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়
ইহাদের আত্মনির্ভরতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজীতে
একটী প্রবাদ আছে যে Want is the mother of invention
অর্থাৎ অভাব হইলেই মানুষ উপার্জ্জনের পন্থা উদ্ভাবন করে।
অভাবই মানুষকে সঞ্চয়শীল হইতে শিক্ষা দেয়। এই
সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের উপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ থাকায় ইহারা
এই উভয়বিধ গুণে বর্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে
দেখা যায় যে এই জেলার অন্যান্য শ্রেনী ব্রাহ্মণগণের উপায়ও
যেমন অল্প তেমনই তাহাদের আত্মনির্ভরতা ও সঞ্চয়শীলতা
অধিক। অন্যান্য শ্রেনীর পাচক ব্রাহ্মণও এই উভয়বিধ গুণে অল্প-
দিনের মধ্যে অতুল সম্পদের অধীশ্বর, অথচ গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণ প্রচুর
অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও নিঃস্ব। আর পরমুখাপেক্ষী জাতির কখনও
উন্নতি নাই ইহাও সর্ব্ববাদি সম্মত।

একদিকে যেমন সঞ্চয়শীলতার অভাব অন্যদিকে তেমনই প্রচুর অর্থাগম। এই দ্বিবিধ ভাবের সংঘর্ষ জনিত কুফলও অনিবার্য। এইজন্য মনেহয় যে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অমিতব্যয়ী এবং অমিতব্যয়িতার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই কুক্রিয়াসক্ত ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া পড়িতেছেন ইঁহাদের অধিকাংশই গঞ্জিকাসেবী। অন্ততঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা এই জাতিতে গঞ্জিকাসেবীর সংখ্যা তুলনায় অনেক অধিক। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে গঞ্জিকা সেবন মস্তিষ্কের অবসাদক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এইজন্য এই শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। অন্য কর্মাভাবে এই সম্প্রদায় শ্রম-বিমুখতা নিবন্ধন আলস্য পরায়ণ হইয়া পড়িতেছেন। এক্ষণে এই শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের অনেকেই আত্ম-নির্ভরতাশূন্য; অসঞ্চয়ী; অমিত-ব্যয়ী; কুক্রিয়াসক্ত, অসংযমী, অলস ও অল্পবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছেন কিনা ইহাই সুধী মাহিষ্যবর্গের বিবেচ্য। এইরূপ জাতি যে কস্মিন কালেও ধনবান হইয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেনা তাহা ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টেই বেশ প্রতীয়মান হয়।

ঐশ্বর্য্য ছাড়াও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের অন্য উপায় বিদ্যাবত্তা। যে সমাজে যত বিদ্বান ব্যক্তির অভ্যুদয় সেই সমাজের প্রতিপত্তি ততই অধিক। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান যত থাকুক আর নাই থাকুক অন্ততঃ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সমাজে ব্রাহ্মণ প্রতিপালনের উদ্দেশ্য তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেবতারাধনা ইত্যাদি দ্বারা সমাজের মঙ্গল কামনা করিবেন ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহীর হিত কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা পুরোহিতের কার্য্য। সম্যক শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে ভগবদারাধনায় অঙ্গহানি হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আজ প্রায় ৯০০ শত বৎসর কাল মাহিষ্য সমাজ যে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই বা সেই আশ্রয় দাতা সমাজের কি মান রক্ষা করিয়া চলিতেছেন?

আশ্রিত ব্যক্তি চিরকালই আশ্রয়দাতার মন রক্ষা করিয়া চলে। গোঁড়াগু বৈদিক ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানগরিমায় ও গুণগরিমায় মাহিষ্যসমাজের স্বাভাবিক শ্রদ্ধার কতদূর অধিকারী তাহাই সমাজের বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এতদঞ্চলে জ্ঞানোন্নতিতে ইহারা কতদূর অগ্রসর দুই একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় অরুচিকর হইবেনা। কাহারও সহনেৰ্থ পর্য্যন্ত বিদ্যা না থাকিয়াও তিনি "তর্কসিদ্ধ" উপাধি মণ্ডিত। কাহারও এক-ছত্র লিখিতে গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হয় তিনি হলেন কিনা কাব্যরত্ন। কেহ আচমন করিতে না জানিয়াও পৌরহিত্য বিশারদ। কেহ দু চার পাতা সংস্কৃত না পড়িতেই এচোঁড়ে পেকেই ভট্টাচার্য্য। তাঁহাকে ভট্টাচার্য্যের বিদায় না দিলেই মাহিষ্য সমাজ একবারেই নরকস্থ। যে বিদ্যা-বটবৃক্ষের পাদদেশে বসিয়া পুরাকালের আর্য্য মনীষিগণ নিরহঙ্কারে একাগ্রচিত্তে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করিতেন আজ সেই পূত পাদপের মস্তকোপরি নিশ্চিন্ত ফলাহারলুব্ধ অনন্তপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ লোলুপ দৃষ্টি সংকারে সগর্ব্বে সমাসীন। ব্রাহ্মণ সমাজের শোচনীয় অধঃপতন এতদ-পেক্ষা আর কি হইতে পারে? একেত মাহিষ্য সমাজ এই গোঁড়াগু বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অন্যান্য জাতি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তদুপরি যদি ইহারা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত হন তবে মাহিষ্য জাতির সামাজিক স্পর্দ্ধা থাকে কোথায়! আজকাল এত-দঞ্চলে এই শ্রেনীর ব্রাহ্মণগণ এতদূর অশিক্ষিত যে সামান্য কিছু শাস্ত্র-তর্ক উঠিলেই ইহাদিগকে অন্যান্য শ্রেনীর শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ভাড়া করিয়া আনিতে হয়।

ইংরাজ-রাজের কল্যাণে আজকাল মাহিষ্য সমাজে বিদ্যানুশীলনের ত্রুটী নাই। মাহিষ্যগণ যেমন ধনে তেমনই শিক্ষায় ক্রমোন্নতিশীল। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও তাহাদের অধীত বিষয়। একজন উচ্চ শিক্ষিত মাহিষ্যকে যদি এক-জন অল্প শিক্ষিত ব্রাহ্মণের শরনাপন্ন হইয়া দেব ও পৈত্র কার্য্যে ব্রতী হইতে হয় তবে সেখানে স্বাভাবিক ভক্তি থাকে কোথায়? বরং অশ্রদ্ধা

হওয়াই সম্ভবপর। আজকাল অনুসন্ধানের যুগ, মানব মন এখন বিভিন্ন বিষয়ের কারণানুসন্ধানে ব্যস্ত। অন্ধ বিশ্বাসের স্থান আর নাই। শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। একজন শিক্ষিত মাহিষ্যের প্রশ্নে অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের দ্বারাই বা কিরূপে উত্তর সম্ভবে? শিক্ষার অভাবে সমাজে যে কুফল সংক্রমিত হয় তাহাই গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। লোকে বলে সন্তানে পিতার গুণ অপেক্ষা দোষগুলিই পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পায়! গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনাদর ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে সুতরাং এই শ্রেণীর ভাবী বংশধরগণ কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে এতদঞ্চলের অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণসন্তানগণ আধুনিক শিক্ষার ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে। নন্দীগ্রাম ও আসদতলা এই উভয়স্থানে প্রায় ১২ বৎসর কাল দুইটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উৎকল মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের সন্তানগণ এই উভয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে, কিন্তু একজনও গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণ সন্তান এনব্য কাল পর্য্যন্ত এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বিদ্যালাভে যতটুকু ঔৎসুক্য থাকুক আর নাই থাকুক অধিকাংশ গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণের আত্মা ঈর্ষা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদি অবিদ্যায় কলুষিত। এই শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে স্থান নাই। এরূপ হওয়ার কারণই বা কি? রাঢ়ী বারেন্দ্র ইত্যাদি শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অনেকেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। পক্ষান্তরে গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এমন পণ্ডিত অতি অল্প যাঁহারা তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিতে পারেন। সমানে সমানে বন্ধুত্বই সম্ভব। গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণ উচ্চশিক্ষিত হইলে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন, অশিক্ষিত যজমানের নিকটই তাঁহাদের পাণ্ডিত্য অধিক। বিদ্যা ও গুণের আদর সর্ব্বত্র। ইঁহারা অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিদ্বান ব্যক্তি আদর করেন না।

এই ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ সমাদৃত হইতেন সন্দেহ
নাই। বকের যেরূপ হংসমধ্যে বদ্ধভাবে বিচরণ করা অসম্ভব তদ্রূপ
এই শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের বঙ্গীয় সমাজে স্থান লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ি-
য়াছে। শাক দিয়া মাছ ঢাকা আর কতদিন চলিবে? মাহিষ্য সমাজের এ
বিষয় বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে

সত্যের খাতিরে যতটুকু সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই বিবৃত করিলাম।
ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া একথা
লিখিতেছি না। এতদঞ্চলের গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণ যেমন
একদিকে মা লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষলাভে বঞ্চিত তেমনই অন্যদিকে
মা সরস্বতীর অনুগ্রহলাভেও পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িতেছেন। অনেক
মাহিষ্যগণ পুণ্যের খাতিরে হউক বা না হউক অন্ততঃ মানের
খাতিরে দানাদি কার্য্যে মুক্তহস্ত। আমার মনে হয় এইরূপ মুক্ত
হওয়াই এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের শোচনীয় অধঃপতনের কারণ।
অবশ্য একপক্ষে মাহিষ্য জাতি আজ প্রায় ৯০০ বৎসর কাল এক
শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের ভাগী হইয়াছেন
সত্য তেমনই অন্যপক্ষে তাঁহাদিগকে ধনহীন, বিদ্যাহীন, এমন কি
চরিত্রহীন করিবার পরোক্ষ কারণ হইয়া পড়িয়াছেন কিনা ইহাই
অবধারণ করা তাহাদের আশু কর্ত্তব্য।

"জনৈক মাহিষ্য"

বঙ্গবালা প্রতি।

—০০—

ধাতার অমিয় সৃষ্টি—বঙ্গলক্ষ্মি ! বঙ্গবালা !
তোমাদেরি পুণ্যে প্রেমে বঙ্গগৃহ চির আলা !
কি চারু পবিত্র মূর্ত্তি—শুভপ্রীতি নির্ঝরিণী,
স্নেহ প্রেম পূত উৎস, করুণার মন্দাকিনী;
সারল্য-মণ্ডিত মুখ, লাবণ্য জোছনা জিনি,
প্রশান্ত পয়োধিবক্ষ—অনন্ত রত্নের খনি !
পুরুষ-হৃদয়কুঞ্জে রমণী—প্রকৃতি রাণী,
অস্ফুট প্রেমের পুষ্প ফুটাইছ দিবা যামি।
তোমরা অশান্তি-শান্তি, সন্তাপে শান্তনাময়ী,
বিপদে সম্পদ শত, পাপ ঘোরে পুণ্যময়ী,
ধূ ধূ ধূ মরুভূ প্রাণে সুশীতল স্রোতঃস্বতী,
হা হুতাশ নিরাশায় আশার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ,
কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহে সুখনিদ্রা শান্তিময়ী,
শক্তিহীন বাহুযুগে শক্তিদাত্রী শক্তিময়ী,
লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের পথ প্রদর্শক তারা,
দলিত মথিত মৃতে সঞ্জীবনী সুধাধারা,
কৃষ্ণা নিশিথিনী বক্ষে শুভ্রা চন্দ্রালোক সমা !
কি মধুর ! কি অমৃত ! এ জগতে নিরুপমা !
আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত ! সাধ মিটেনাক নিরখিয়ে !
কিবা প্রেমময়ী মূর্ত্তি গড়েছে বিধি কি দিয়ে !
যে আমিত্ব প্রতিষ্ঠায় কত রাজা কত দেশ
বিধ্বস্ত, বিগতপ্রাণ কত জন, নাহি শেষ,
পুরুষের সে আমিত্ব—কত উচ্চ চূড়া তার !
রমণী—পরশমণি স্পর্শে ভেঙ্গে চুরমার।

নিতে নাহি জান, শুধু দিতে জান—যেচে দাও
ছেয়ে ফেল অনুরাগে, প্রতিদান কোথা চাও!
মিটাও প্রবল তৃষা আকুল কামনা যাহি,
ফলাও আশার বৃক্ষে স্বরগ অমৃত যাই,
দূরে দাও স্বর্গ মর্ত্ত উভয়ের ব্যবধান,
নাশিয়া পশুত্ব ফেলে দাওগো দেবত্ব প্রাণ,
দাও শক্তি টান প্রাণে কর্ম্মক্ষেত্রে ধরাতলে,
শিখাও সঁপিতে প্রাণ পরতরে নিজে ভুলে,
কতই সোহাগ যত্নে হাত ধরে হেসে হেসে
জননী ভগিনী কন্যা জীবন সঙ্গিনী বেশে
অনন্ত অসীম এই অকুল পাথার প্রেমে
ভাসাও ভাসিয়া যাও—লক্ষ্য সে পরম প্রেমে।
অমিয় অধরে বুকে প্রতি অঙ্গে জড়াইয়া!
অন্তরে কস্তুর স্রোত পড়িছে কি মুরছিয়া!
ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—বঙ্গলক্ষ্মি! বঙ্গবালা!
তোমাদেরি পুণ্যে প্রেমে বঙ্গগৃহ চিরআলা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস

রতন কণা।

যেথায় বজ্র সেথায় বৃষ্টি সেথায় অন্ধকার—
যেজন পাপী সেজন তাপী নাইক শান্তি তার।
যেথায় চন্দ্র সেথায় তারা সেথায় জোৎস্না—
সেজন সাধু সেজন সুখী নাই তার দুঃখকণা।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী

কালীশের কপাল

(অনুপ্রাসাত্মক প্রবন্ধ—"ক-কার")

কলিকাতার কাছে

কাশীপুরের কৈলাস কাব্যতীর্থের কনিষ্ঠা কন্যা কামিনী। কালীশ কবিরত্ন কামিনীর কাকা। কাকিমা কমলিনী। কপালদোষে কাল-দোষে কালীশের কন্যাদ্বয় কুসুম ও কালী, কৈলাস-কন্যা কদম্বা, কামিনী-জননী কৌশল্যা কাল কবলিতা। কামিনীকে কেহ কখন কটু কথা কহে না। কামিনীকে কোলে কাঁকে করিয়া কালীশের কন্যার শোক কতক কমিয়াছে। কামিনী কোমল স্বভাবা কমনীয়তায় কন্দর্পকন্যা, কিঙ্করপ্রায় কাকার কষ্টে কাতরা কামিনীর কাজ কর্ম্মে কথায় কৌশলে কন্যা-শোক কখন কালীশকে কাতর করে নাই। কথায় কথায় কামিনী কৈলাসের কন্যা। কৈলাস কাব্যতীর্থ কলিকাতায় কোনও কলেজে কাজ করেন। কালীশ কাশীপুরে কোটা করিয়া কালী কমলা কার্ত্তিক পূজা করিয়া কিছু কিছু কামাই করেন। কামিনী কাকামার কাছে কাজ কর্ম্ম করে। কাব্যাস্তে কখন কখন কাকার কাছে কলাপ কণ্ঠস্থ করে। কণ্ঠস্বরও কোমল। কর্ণতৃপ্তিকর। কৈলাস ও কালীশের কত কামনা! কমলা স্বরূপা কন্যা কামিনীর কুলীনে কাজ করিবেন; কার্ত্তিক বরের করে কন্যাদান করিয়া, কামিনীর কন্যা পুত্রের কাতর-কোমল ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া কত কৌতুক করিবেন কতই কহিলেন, কতই কল্পনা করিলেন! কিন্তু কে কাল কি কামনায় কর্ণপাত করিবে? কে কহিবে কাল কাহার কেশাকর্ষণ করিবে?

কলিকাতার কলেজস্কোয়ারে কৈলাসের কুটীর! কোনদিন কলেজের [illegible]

কার্য্যকালেই কৈলাসের কলেরা। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কায়মনোযত্নে কতক কমিল। কালীশ, কামিনী, কমলিনী কলিকাতায়। কিন্তু কমিলে কি হয়, কালের কে কি করিবে? কার্ত্তিকের কুড়িদিনে কৈলাস ক্রমশঃই কেমন কাতরতর কোলাপ্স করিলেন। কত কস্তুরী, কত কি, কিছুতেই কিছু করিল না। কলেজকে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে, কাশীপুরকে, কালীশ কামিনী কমলিনীকে কাঁদাইয়া "কাল" কৈলাসকে কবলিত করিল। কোথায় কৈলাস,, কোথায় কাহার কামনা! কৈলাস কাহাকেও কিছু কহিল না।

কালীশেরই কষ্ট! কি করিবেন,— কামিনী কিশোরী,— কোথায় কাজ করিবেন? কৈলাসের কার্য্যান্তে কাশীপুরে কালীশ কত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন! কামিনী কাতরা, কখন কখন কাঁদে; কিন্তু কাকা কাকীমাকে কখন কাতর করেনা। কালীশ কতকি করিতেছেন! কখন কোথায় কি করেন কাহাকে কহেন না। কামিনীর কাজের কথা কুটুম্বদের কতই কহিলেন, কেহই কিন্তু কর্ণপাত করিলেন না। কালে কিনা করে? কবি কহিয়াছেন "কালস্য কুটিলা গতি"।

কতকষ্টে কালীশ কলিকাতারই কুমারটুলীতে কামিনীর কাজ করিতেছেন! কমলিনী কেবলই কোথায় কুসুম-কালী, কদম্বা, কোথায় কৈ কহিয়া কাঁদিতেন। কালীশ কিছু কর্জ্জ করিয়া কামিনীর কার্য্য করিলেন কিছু কাল কাতরতা কতক কমিল। কিন্তু কপালের কর্ম্মফলের কে কি করিবে? কামিনীর কষ্টের কপাল, কোমলতা কমনীয়তায় কি করিবে? কুঁজী ননদের কৈকেয়ী-শুশ্রূষার কোন্দল কামিনীকে কতই কাঁদাইত।

কামিনী কিন্তু কিছুকাল কাহাকেও কিছু কহিল না। ক্রমশঃই কোন্দল করিতেছে, কখন কখন কেহ কামিনীর কেশাকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু "কাল" নহে। কামিনী কি করিবে ? কাতর কাকা কাকিমাকে কিছু কহিয়া কাঁদাইল না। কিন্তু কহ কোন্দল কমিল কি ? "কাল"ও করাল কটাক্ষপাত করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কামিনী কি করিল ? কাপড় কেরোসিনতৈলাক্ত করিয়া কায়াত্যাগ করিল।

কাঁদ ! কালীশ, কমলিনী, কাঁদ ! কাঁদিবার কপাল করিয়াছিলে, কাঁদিয়াই কাল কাটাও।

শ্রীগৌরহরি খাটুয়া।

গ্রীক দার্শনিক

উন্নত ভাল ধারণম্	কপট উচ্চ ভাষণম্
নাসিকাশ্মশ্রু যোজনম্	যুবজনমনোমোহনম্
পেটিকা গুম্ফ পোষণম্	বৈচিত্র্য শব্দ গ্রহণম্
মাংসাদি সর্ব্ব ভক্ষণম্	অলীক যশঃ দর্শণম্
জারিত বর্ম্ম শোভনম্	ঈদৃশ গুণমেষণম্
উলঙ্গ পাদ ভ্রমণম্	নমস্তে নমঃ দর্শনম্
গোপন নিশাভোজনম্	নমস্তেস্থলে, হঃন্ টনম্।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া বি, এ,

হিন্দুর গোহত্যা মাতৃহত্যা শিশুহত্যা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

ভাই তোমরা হয়ত ভাববে এসব করলে সমাজ তোমাদিগকে ছাড়বে কিন্তু তোমরা ভেবে দেখেছ তোমাদের সমাজ আজ জীবিত কি ? লাথি মেরে ভাঙ এ সমাজকে, একঘরে হয়ে থাক ভাল। প্রত্যেক গ্রামে যদি অন্ততঃ দুজন এরূপ করতে পার তবে তোমাদের দুজনে একটী সমাজ। আমার গ্রামে আবার দুজন যদি এরূপ করি চারজনে ১টী সমাজ হব। ভয় কি ? তোমরা হয়ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছ, কে আগে করবে ? তুমিই আগে পথ দেখাও, দেখবে দলে দলে তোমার পথ ধরেছে।

আর শাস্ত্রই যদি মানিয়া চলিতে হয় তবে প্রকৃত শাস্ত্র মানিয়া চল। তোমরা যে বল আমরা বেদ মানি আচ্ছা বলিতে পার বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা এরূপ ছিল? কখনই নয়। আজ কাল কোন রমণী যদি কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চায় তোমরা "হায় ঘোর কাল উপস্থিত" বলিয়া চেঁচাইতে থাকিবে। নানা টিকী-প্রধান ভণ্ড পণ্ডিতের কাছে সে নারীকে সমাজ হইতে তাড়াইবার জন্ত ভাষ আনিতে যাইবে। কিন্তু তোমার যে পণ্ডিত যিনি বেদকে নিজের গোত্র বলে গর্ব্ব প্রকাশ করেন সেই অথর্ব্ববেদে আছে,

"গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী
যথাস্যে বাশিনী
ত্বম বিদথামাবদসি—"

গৃহে আগমন কর, গৃহপত্নী হও। ক্ষমতাশালিনী হইয়া সমিতিতে নিজ মত প্রকাশ করিবে।

ঋগ্বেদে আছে—

"সম্ হোত্রম্ স্ম পুরা নারী সমনম্ বা অবগচ্ছতি—"

পুরাকালে নারীগণ সাধারণ যজ্ঞস্থলে এবং সমিতিতে গমন করিতেন।

আজকাল তোমরা কয়টী মেয়েকে সভা সমিতিতে গমন করিতে দিয়াছ?

আজকাল তোমরা অনূঢ়া কন্যা রাখা পাপ ভাব। তাকে পুত্রের ন্যায় সম্পত্তির ভাগ দিতে নারাজ হও। তাকে শিক্ষা দাওনা কিন্তু বৈদিক যুগে এ সব কিছুই ছিল না। কন্যারা মনোমত বর বাছিয়া লইতেন! অবিবাহিতা পিতৃগৃহে পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকিতে পারিতেন কিংবা যে কন্যার বিবাহ দেওয়া হইত তার পিতা যদি অর্থবান থাকিতেন তবে কন্যাকে তার অর্থের অংশ দিতেন তবে বরকে পণ হিসাবে নয়, সে ধনে কন্যার সম্পূর্ণ

অধিকার ছিল। তাই সেকালে ছিল,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়তি যত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা।"

মোটকথা তোমরা শাস্ত্র বিবেক যাহাই বলনা কেন সব পাশ দিয়াই তোমাদের সমাজ-স্বেচ্ছাচারিতা প্রমাণিত হবে। তার যা বিষময় ফল তাহা আমরা প্রতিদিন দেখছি। জন্ম হইতে যে কন্যাকে চার দেওয়ালের মধ্যে রাখ সে ভবিষ্যতে তোমার সমস্ত আভিজাত স্পর্দ্ধা নষ্ট করে পরের বাড়ীতে ভিক্ষা করে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। যদি পিতা তোমরা প্রথম হইতে কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করতে, যদি তাকে পুত্রের মত পালন করতে, যদি তাকে সমাজে সভা সমিতিতে স্বমত প্রকাশ করতে দিতে তাহা হলে নারীর জন্য সমাজের এমন অধঃপতন, কলঙ্ক কখনই হোত না। কন্যার বিবাহে নিজের সমস্ত দিয়ে পথের ভিখারী হতে না। এত দিয়ে থুয়েও লাথি জুতো খেতে না। তোমার প্রাণপ্রতিমা, প্রাণের কলিজা, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া কন্যা বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, গায়ে কেরোসিন সিক্ত করে কলঙ্কের দায়ে পুড়ে মোরত না। একেই বলে পর পদানুকরণ। একেই বলে পরবুদ্ধিনীতি। তখন তোমাদের উপদেশদাতা সমাজপতি পণ্ডিতজী কি করেন? কয় ফোঁটা চোখের জল ফেলেন?

মূর্খ ভেঙ্গে ফেল এ সমাজ, লাথি মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও, পায়ে যদি যোর না থাকে তবে গলায় দড়ি দিয়ে মর। সমাজের এ দোষ সহিতে হবেনা।

অধিকার ছিল। তাই সেকালে ছিল,—

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়তি যত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা।"

মোটকথা তোমরা শাস্ত্র বিবেক যাহাই বলনা কেন সব পাশ দিয়াই তোমাদের সমাজ-স্বেচ্ছাচারিতা প্রমাণিত হবে। তার যা বিষময় ফল তাহা আমরা প্রতিদিন দেখছি। জন্ম হইতে যে কন্যাকে চার দেওয়ালের মধ্যে রাখ সে ভবিষ্যতে তোমার সমস্ত আভিজাত স্পর্দ্ধা নষ্ট করে পরের বাড়ীতে ভিক্ষা করে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। যদি পিতা তোমরা প্রথম হইতে কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করতে, যদি তাকে পুত্রের মত পালন করতে, যদি তাকে সমাজে সভা সমিতিতে স্বমত প্রকাশ করতে দিতে তাহা হলে নারীর জন্য সমাজের এমন অধঃপতণ, কলঙ্ক কখনই হোত না। কন্যার বিবাহে নিজের সমস্ত দিয়ে পথের ভিখারী হতে না। এত দিয়ে থুয়েও লাথি জুতো খেতে না। তোমার প্রাণপ্রতিমা, প্রাণের কলিজা, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া কন্যা বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, গায়ে কেরোসিন সিক্ত করে কলঙ্কের দায়ে পুড়ে মোরত না। একেই বলে পর পদানুকরণ। একেই বলে পরবুদ্ধিনীতি। তখন তোমাদের উপদেশদাতা সমাজপতি পণ্ডিতজী কি করেন? কয় ফোঁটা চোখের জল ফেলেন?

মূর্খ ভেঙ্গে ফেল এ সমাজ, লাথি মেরে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দাও, পায়ে যদি যোর না থাকে তবে গলায় দড়ি দিয়ে মর। সমাজের এ শ্লেষ সহিতে হবেনা।

আমাদের দেশে চলতি কথায় বলে,

মাংসেতে মাংস বাড়ে
ঘৃতে বাড়ে বল;
দুগ্ধতে লাবণ্য বাড়ে
শাকে বাড়ে মল।

এ কথাটী সত্য। মাংসের অভাব ঘিয়ে পূরণ করে। কিন্তু আমরা দুধ ঘি কতটুকু প্রত্যহ খাই। যা খাই শাক ভাত তাতে শরীর টিকে কি? আমরা শাক ভাতে পেট পুরে ভাবি খাওয়া হল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা একরকম উপবাসী থাকি। শরীর তত্ত্বে বলে,

প্রটিন—২ ছটাক।
চর্ব্বি—২ ছটাক।
চাল—৫ ছটাক।

এই মোট নয় ছটাক আমাদের প্রত্যহ আহার হওয়া উচিৎ। এর কমে শরীর টিকবে না। আমরা যদি মাছ মাংস না খাই তবে এই ২ছটাক প্রটিন ও ২ছটাক চর্ব্বি পাইতে হইলে প্রত্যহ ৩ সের দুধ খাইতে হইবে। প্রতি ৫ ছটাক চালে আমরা ১এর২ ছটাক প্রটিন পাই। চর্ব্বি খুব কমই পাই। সুতরাং আমরা মাছ মাংস না যদি খাই তবে ২ ছটাক প্রটিন পাইতে হইলে আমাদের প্রত্যহ ১।০ সের চাউল খাইতে হইবে। কিন্তু তাতে চর্ব্বির ভাগ নাই বললেও হয়। চাল প্রটিনের অভাব দূর করিতে পারে কিন্তু চর্ব্বির অভাব পারে না। কিন্তু দুধ প্রটিন ও চর্ব্বি দুয়ের অভাব দূর করিতে পারে। মাছ মাংস প্রটিনের অভাব দূর করিবে কিন্তু দুধের অভাব দূর খুব কমই করিবে। ২ ছটাক প্রটিন পাইতে হইলে ১॥ সের চাল খাওয়া

দরকার। কিন্তু ১।। সের চালের স্থানে ।। সের জল খাইলে চলিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে চর্ব্বির অভাব দুধ ছাড়া আর কেউ পূরণ করিতে পারে না। যারা পারে খুব কম পরিমানে। দুধ কিন্তু সব অভাভ দূর করিতে পারে। তাই দুধকে সম্পূর্ণ খাদ্য বলে।

এই চর্ব্বির পরিমাণ একটু কম হইলেও ক্ষতি নাই। চর্ব্বির প্রধান কাজ শরীরের উত্তাপ রক্ষা করা। অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা। এ চর্ব্বি শরীরে খাদ্যরূপে থাকে। উপবাসাদির সময় বিশেষ কাজে লাগে। কোন প্রাণীর চর্ব্বি খেলেও এ চর্ব্বি পাওয়া যায়।

অনেকের যেমন বিশুদ্ধ জল বায়ু না হলে চলেনা গরুরও তেমনি। প্রত্যেক গোয়ালে ২।৫ টী বড় জানালা থাকা উচিৎ। গোয়ালে চোনা জমে গরুকে ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

আজকাল বৃষোৎসর্গ রীতি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে! এ রীতির পুনরুত্থান অতি আবশ্যক! তাহলে ভাল এঁড়ে গরু পাওয়া যাবে! ভাল এঁড়ে গরু না হলে ভাল বাছুর পাওয়া দুষ্কর।

যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রত্যেকে ২।১ টা গরু রেখেছে আমরা ভারতবাসী প্রত্যেকে বড় যোর আধখানা করে গরু বা প্রত্যেকে দু জনে একটী করে গরু রাখতে পেরেছি।

ভারতের	প্রতি	১০০	লোকের	৫০ গরু
ডেনমার্ক	”	”	”	৭৪ ”
আমেরিকা	”	”	”	৭৯ ”
কানাডা	”	”	”	৮০ ”

কেপকলনির প্রতি ১০০ লোকের ১২০ গরু
নিউজিলাণ্ড „ „ „ ১৪০ „
অষ্ট্রেলিয়া „ „ „ ২৫৯ „

ডেনমার্ক, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে গরুকে আবার লাঙ্গলটানা, গাড়ীটানা, ঘানিটানা প্রভৃতি কাজে লাগান হয়না; এসব কাজ ঘোড়ার কলে হয়। কিন্তু আমরা গরুর দুধত খাইই তা ছাড়া এসব-কাজ করাই। সে সকল দেশে ৫টী গরু যে দুধ দেয় আমাদের ৫০টী তা দেয় না। সুতরাং তাদের যেখানে ৫০টী গরু থাকে আমাদের সেখানে ৫০০ গরু থাকলেও কুলাবেনা। সুতরাং যোর করিয়া বলিতে পারিনা কি হিন্দুরা গোঘাতক ?

শ্রীপরেশনাথ ভূইয়া।

নিদাঘে

"ফটি-ইক দে জল,—"
রৌদ্রতপ্ত ধরাবুকে আসি বিঁধে স্বর মর্ম্মস্থল।
খসে পড়ে বৃক্ষ-তলে শুষ্ক পাতা, তপ্ত বায়ু বহে শ্বাসি,
কি করুণ স্বরধার তব পাখি! কি ব্যথাই পরকাশ!
এ ধরার দীঘি-নদী-বারি কোনো! তৃষা কি মিটাতে নারে!
"ফটি-ইক দে জল!" আকাশের পানে চেয়ে তাই বারে বারে?
কি ব্যথা জাগালে পাখি!
পল্লীবাসী তোমা চেয়েওত খাটো? প্রশ্ন উঠে থাকি থাকি।
চাটাল ডোবা এঁদো পুকুরের আধিক্য পল্লীর বুকে,
নাই দীঘি নাই জলাশয় বারি পিয়েতে মনের সুখে,

দূষিত বারি যে পানে পল্লীবাসী শীর্ণ রুগ্ন রোগে নানা,
দেখেও দেখেনা পল্লী-জমিদার, এমনি হৃদয় খানা ।

ভাগ্যবান যেহে তারা ।
রিজার্ভ ট্যাঙ্কে তাদের ভাগ্য নির্ম্মল বারিধারা ।
তাদের জীবনের অধিকাংশ দিন সহরের বুকে যায়,
তথায় বরফ, জলের কল ত্রিতল অট্টালিকায় ।
গরীব পল্লীবাসীর জীবন কৃমি কীটের মত,
কে চায় তাদের পানে পাখি ! জানালে দোষ শত ।

সে কাল কোথায় এবে
হেথায় হোথায় দীঘি পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে ?
কই সে রাজপথ, পার্শ্বে পার্শ্বে ঘন পত্র অশ্বত্থ, বট,
কাক-চক্ষু সম নীল বারিভরা পুকুর সে দৃশ্য পট ?
যেমটি স্বরায় ধনের সদ্ব্যয় দেখা যায় ইহকালে,
মরুক পল্লীর হতভাগ্য সব, জঞ্জাল এ ভাবতে গেলে ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস ।

সহধর্ম্মিণীর প্রতি

(বিপথিকের উক্তি)

আজ বড় সাধে, মনেরই খেদে,
বলেছি তোমায় "আমার" ।

তাই মম প্রাণ, শৌর্য্য বীর্য্য মান,
সপেছি করেতে তোমার ॥
তুমি চাও মোরে, রেখে উচ্চস্তরে,
কায়মনে কর আরাধনা।
আমিত চাহিনা হেন আরাধনা,
হুজুর জনাব জাহাপনা ॥
হৃদয়ের রাণী ! (কেন) হবে পূজারিণী,
সচিব হইবে কেবা মম !
প্রেমের মূরতি শুনলো সুমতি,
তুমি প্রেমদীক্ষা শিষ্যা সম ॥
সম্পদে বিপদে থাক পদে পদে,
বিপথ দ্বার করিতে রুদ্ধ !
বিপথ হইতে পারিলে আনিতে
দেখিবে বিশ্ব হইবে মুগ্ধ ॥
সঙ্কোচে শৃঙ্খলিতা হইলে হে আজ,
কর্ত্তব্যে তব বাধিবে বিঘ্ন।
হবেনা পূরণ তব আকিঞ্চন,
মর্ম্মে ব্যথা পাবে যে তখন ॥
যেমতি সাবিত্রী লয়ে প্রাণপতি
পরাজিত করিল শমন।
তেমনি সতীত্বে হও আগুয়ান
দেখিবে আমি তোমা-সদর্ন ॥

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দাসগুপ্ত।

চয়ণ

ভাষাতত্ত্বের মুখবন্ধ।

সিন্ধুনদের নিম্নস্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে "ব্রাবড়" নামে এক প্রকার অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। ইহা-হইতে সিন্ধী ও লহণ্ডা ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। কোহিস্থানী ও কাশ্মিরী ভাষাদ্বয় কোন ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে ঐ ভাষার সহিত ব্রাবড় ভাষার যে বহু সাদৃশ্য ছিল, তাহা সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয়। নর্ম্মদা উপত্যকার দক্ষিণে আরব্যোসাগর হইতে ওড়িশা পর্য্যন্ত প্রদেশে অনেকগুলি ভাষা ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সহিত অপভ্রংশ বৈদর্ভীর খুব নিকট সম্বন্ধ। বৈদর্ভী ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপভ্রংশ ভাষা সমূহ হইতে আধুনিক মারাঠি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এদিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অপভ্রংশ "ওড্র" বা "উৎকলী" প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বর্ত্তমান ওড়িয়া ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ওড্রির উত্তরে বিহার, ছোটনাগপুর ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বার্দ্ধে মগধী ভাষা প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে বর্ত্তমান বিহারী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এটী একটী প্রধান ভাষার মধ্যে পরিগণিত ছিল, পূরবী প্রাকৃতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যও বিদ্যমান ছিল। ওড্রি, গৌড়, ও ঢক্কী ভাষা সমূহ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মাগধীর পশ্চিমে প্রাচ্য অপভ্রংশ বা গৌড়ী প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্বর্ত্তী গৌড়ই ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বে

বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এ স্থানে ইহা টক্কী নামে অভিহিত হইত। ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রদেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, ইহা তৎসমুদায়ের আদি। গৌড় অপভ্রংশ পূর্ব্বদিকে আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; উত্তর বঙ্গ ও আসামের ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন।

* * * পূরবী ও পশ্চিমী প্রাকৃতের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ মগধী বলিয়া আর একটী ভাষা আছে। বর্ত্তমান পূরবী হিন্দিই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই ভাষা অযোধ্যা, বুন্দেলখণ্ড, ও ছত্রিশ গড় প্রদেশসমূহে প্রচলিত আছে।

অভ্যন্তর ভাষাসমূহ যে অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নাগর অপভ্রংশ বলিয়া অভিহিত। সম্ভবতঃ ইহা পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক ভাষা সমূহ হইতে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে, নাগর অপভ্রংশ অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়া সমস্ত পশ্চিম ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে সৌরসেনী অপভ্রংশ অন্যতম। সৌরসেনী হইতে পশ্চিমী, হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। আবন্তী ও ইহাদের মধ্যে আর একটী ভাষা। আবন্তী বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে ব্যবহৃত হইত, রাজস্থানী ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

* * * * * *

উত্তর ভারতের আধুনিক ভাষা সমূহ পাঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। রাজস্থানী ভাষার সহিত এই সকল ভাষার নিকট সম্বন্ধ।

* * * * রাজস্থানী ভাষাও এই প্রদেশের ভাষার উৎপত্তি একটী ভাষা হইতেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই উভয় ভাষার আকর ভাষার নাম আবন্তী অপভ্রংশ।

মাধবী, চৈত্র ১৩২৯। রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

সঙ্গীত-বিহঙ্গ।

উড়ে যা আমার সঙ্গীত-বি-হঙ্গ
দূর-দিগন্ত পানে,
ঝঙ্কৃত করি শাশ্বত প্র-সঙ্গ
ধ্রুব মঙ্গল-তানে।
যেথায় কণ্ঠ পিঞ্জর নি-যন্ত্র
কেন রবি তুহ কুণ্ঠিত বি-যন্ত্র
পবনে পবনে অমর ত-রঙ্গ
তোর আবাহন আনে।
উড়ে যা আমার সঙ্গীত বি-হঙ্গ
দূর-দিগন্ত পানে।
হেথা চারি ধারে সংসার ঝন্-ঝনা—
চঞ্চল করে ত্রাসে,
ঘুরিছে লুব্ধ হিংসার গঞ্জ-জনা
শ্যেন সম আশে পাশে।
যারে যথা শুধু আনন্দ নী-রন্ধ্র
প্রেম রবি তারা চন্দ্রমা অ-তন্দ্র
নীলে নীলে কার ইঙ্গিত বি-ভঙ্গ
তোরে অনন্ত টানে।

উড়ে যা আমার সঙ্গীত বি-হঙ্গ
দূর-দিগন্ত পানে।

প্রভাতী, ফাল্গুন ১৩২৯ শ্রীকালিদাস রায় বি, এ,

চূর্ণ ও স্বাস্থ্য।

* * পানের চূর্ণ শরীরের পক্ষে কতকটা উপকারী তাহা সকলেই যে জানেন এমন নহে। শরীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। উহা না থাকিলে শরীর পুষ্টির অভাবে রোগ এবং মৃত্যু নিশ্চয়।

খানিজ দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চূর্ণ ও তাহার লবণ, উহার অভাবে পুষ্টি হয় না। * * চূর্ণ বেশী পরিমাণ না থাকায় শরীরের সকল যন্ত্রে পুষ্টির অভাব ঘটিয়া অনেক রোগ হয়। * *

চূর্ণ সেবন করিলে রক্ত সঞ্চালন ভাল করিয়া হয় এবং সেইজন্য হজম শক্তি বাড়ে। চূর্ণ সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রাত্রের ঘাম বন্ধ হয়। চূর্ণের অভাবে যেমন স্নায়ু উত্তেজিত হয়, তেমনি চূর্ণ সেবনে উত্তেজিত স্নায়ুসকল স্থির হয়। * শরীরে চূর্ণের অভাব থাকিলে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ আরাম হইবে না। চূর্ণও সেবন করিতে হইবে। সকল রোগেই শরীর হইতে চূর্ণ বাহির হইয়া যায়। * * * স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে প্রচুর পরিমাণে চূর্ণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

চৈত্র, ১৩২৯ উপাসনা।

আবহাওয়া

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাড়ী ৭২০০০ টাকায় নিলাম হইয়া গিয়াছে। তাহা রক্ষার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশহিতৈষীগণ চেষ্টা করিতেছেন।

কাশীতে আগষ্ট মাসে নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে। সেজন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ভারত ভ্রমণ করিবেন।

মেদিনীপুরের জননায়ক শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাশমল ভোটের দ্বারা জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন, শাসনকর্ত্তারা তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

ভারতে কুষ্ঠ নারীর সং ১,২০,০০০ তন্মধ্যে বাঙ্গলায় ১৫৪৫০, কি শোচনীয় অবস্থা! এর প্রতিকার করা চাই।

এতদিন লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে প্রধান নগর ছিল কিন্তু নিউইয়র্ক এবার লণ্ডনকে ধনেজনে হারাইয়াছে।

আগামী ২৩ ও ২৪শে জুন নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হইবে তাহাতে বর্দ্ধমানাধিপতি সভাপতি হইবেন।

শোক সংবাদ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মনোজমোহন বসু আর ইহজগতে নাই। আমরা তাঁহার অভাবে শোক প্রকাশ করিতেছি।

প্রিণ্টার— শ্রীকানাইলাল চক্রবর্ত্তী, বাণী প্রেস হরিপুর।
প্রকাশক— শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী, শোভনা-কার্য্যালয়।

শোভনা

প্রথম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
১৩৩০ আষাঢ়

—o°°°°o—

জাতের কথা

আজকাল তথাকথিত একদল সমাজপতি তারস্বরে বলিতেছে যে জাতিভেদ প্রথাটা যতদিন সমাজবক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিবে ততদিন ভারতে উন্নতির আশা অল্প। কাজেই এই সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই মানুষ হইব। আমাদের পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা বিরোধ বাদপ্রতিবাদ সমস্তই একবারে লোপ পাইবে। তখন আর আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিমধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া এক বিরাট মহা জাতির পতাকা নিম্নে মাথা রাখিয়া নিজেদের দুরন্ত ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া কিসে দেশের ও দশের উপকার হইবে তাহার জন্য আত্মনিয়োগ করিব। আমাদের কর্ম্মের চক্র যতই বাড়িবে, ততই মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়া উত্তোরত্তর সম্প্রসারণ হইতে থাকিবে। অতএব এই সর্ব্বনাশমূলক ভেদনীতি সমাজ হইতে অপসারিত করা প্রত্যেক নেতার কর্ত্তব্য।

আর একদল দীনচিত্ত হীনবুদ্ধি
সমাজপতি এই মতের সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া এই
জাতিভেদ প্রথার দৃঢ় বন্ধনকে দৃঢ়তর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।
তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ অবাধগতিতে সেই অতীত পৌরাণিক যুগের
দিকে তর তর বেগে ধাবিত, যেন কোনরূপ বাধা মানিতে
প্রস্তুত নয়,— অতীত সুখের মদিরা পানে বিভোর হইয়া, অর্দ্ধ
-নিমিলিত নয়নে গিলিত চর্ব্বনে ব্যস্ত, মধ্যে মধ্যে স্বর্গরাজ্যের
স্বপ্ন দেখিয়া বর্ত্তমানের অধোগতি তাহাদের নয়নের অগোচর
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মান্ধাতার আমলে যাহা একবার জীবন
মরণ সমস্যার সমাধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে মাপকাটী যেন
অপরিবর্ত্তনীয়। সমাজ রসাতলে গেলেও, সমাজে নতুন নতুন
শত সহস্র অভাব অভিযোগ নতুন সজ্জায় আসিয়া উপস্থিত
হইলেও তাহারা পুরাতন নিয়মের পক্ষপাতী। সে জর্জ্জরিত
রোগজীর্ণ দেহের সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক, তাহার মধ্যে
মধ্যে যে যোড়াদেওয়া ছাটকাটকরা আবশ্যক তাহা তাহারা
স্বীকার করিতে রাজী নহে। তারা বলে "হাড়ি ডোম জেলে
বাগ্দি পোদ নমঃশূদ্র এদের ছায়া স্পর্শ করলেই যে পাপ হয়
সে পাপ গোকোটীদানং গ্রহনেন কাশী মাঘে প্রয়াগে যদিকল্পবাসী
সুমেরু সমতুল্য হিরণ্যদানং তথাপি ন মুঞ্চতি তৎস্পর্শপাপম্।
শত তীর্থ স্নানেও অসংখ্য পুণ্য কার্য্যের দ্বারা ধৌত হয় না।
এই সমস্ত ছোট জাতের মধ্যে কোন সদ্গুণ সম্ভবে না।
পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে নতুবা এই সব
ছোট জাত, এই সব ইতর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে
সাহস করে? কাজেই এদের একঘরে না করলে আমরা
স্নানাহার করিব না।

এই ধারণা একদিন হয়েছিল—
মহাজ্ঞানী যোগীবর শঙ্করাচার্য্যের অমনি ভগবানের স্থায়ের আসন টলিল, নিষাদের মুখে ভগবান আবির্ভূত হইয়া বেদান্তের অখণ্ডনীয় সত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিষাদের পদে ঋষির মস্তক লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পরাজিত সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য সাধনা ভজনা নিষ্ঠা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল।

উদারনীতির দল ও সংরক্ষণকারী এই দুই দলের মধ্যে কোন্ মত অভ্রান্ত তাহা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে দেখা যাউক জাতিভেদ প্রথা কিরূপে দৃষ্ট হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার পর বহু শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে। কত শত রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শাশনপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু তবুও সেই পুরাতন সনাতন নিয়মের ভগ্ন অস্থিকঙ্কাল এখনও জীর্ণ সমাজবক্ষে অব্যাহত রহিয়াছে। কত অত্যাচার অনাচার সেই সনাতন সদাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও আবার তাহার পদপ্রান্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। জগতের ইতিহাসে আপনার অপরিবর্ত্তনীয় অভ্রান্ত সত্যঘোষণা করিতে আর কোন দেশের সমাজশাশন সক্ষম কি না জানি না।

আর্য্যগণ আপনাদের বিশ্রাম-বাছিয়া লইয়াছেন, আর্য্যদিগের লৌহ অত্যাচার হইতে আপনাদের জীবন ধনসম্পত্তি সম্মান প্রতিপত্তি সংরক্ষণ করিয়া শিল্পপ্রায় স্বভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। এখন চিন্তাপ্রপাত

কি করিয়া স্ব
বহির্ম্মুখী না হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে ।
স্ব উৎকর্ষ সাধিত হয় এই ভাবনা তাঁহাদের একমাত্র সাধন
ভজন পূজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে । ক্রমে কাজ যতই বাড়িতে
লাগিল, যতই জটিল হইতে জটিলতর হইতে চলিল ততই
তাঁহারা পথ খুঁজিতে লাগিলেন । চিন্তা বিফল হইল না ।
পথ বাহির হইয়া পড়িল । ব্যক্তি বিশেষে শক্তি বিশেষে
কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত হইল । তাই এ কালের বাণী—
" চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ "

একটীমাত্র মনকে শতধা
বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্রত্বে শূন্যত্বে পর্য্যবসিত হইতে হইল না ।
যে যাহার কাজ বাছিয়া লইল,— ছোট বড় ভাল মন্দ
এ প্রভেদ তখনও হয় নাই । " আমরা সবাই মায়ের
ছেলে, হাড়ি ডোম বাগদি জেলে, সবাই এক মায়ের ছেলে
জুটেছি মায়ের কাজে জাতি কুল মান ভুলে । "

এই বাণী সে যুগের বার্ত্তা ।
তারপর কত পুরুষ এইভাবে যে যার বোঝা বইতে লাগল
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে তখনও কেউ ব্যস্ত হয় নাই ।
এইবার ক্ষমতা পর পর বেড়ে চলল । কার্য্যের ধারা
বংশানুক্রমিক হওয়াতে সময়ের দাঁড়ী নেমে পড়ল । সম-
ব্যবসায়ীদিগের প্রতিযোগিতা বাড়তে লাগল । সকলে বাহবা
চাইল, পেতেও বিলম্ব হলনা । সাত সমুদ্র তের নদী
অসংখ্য দুর্ভেদ্য পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করে নাম ফুটতে
লাগল । প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহায় সহানুভূতি প্রতীক্ষা
করতে লাগল । কিন্তু ও যুগের রহস্য এই যে একশ্রেণী

অপর শ্রেণীর কার্য্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না অথবা তজ্জন্য অপর শ্রেণীর বিষনয়নে পতিত হইত না, তাই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধা পায় নাই। তাপস বিশ্বামিত্র ও অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ গুরু দ্রোনাচার্য্য তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে আহার বিহার বিবাহ ইত্যাদি স্ব স্ব রুচি অনুসারে অবাধে চলিত কিন্তু তজ্জন্য বর্ত্তমান কালের মত তৎকালে "খাঁড়ার ঘা" সবেগে নিপতিত হইত না। তাই ত্রেতাযুগের অবতার ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন ও সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিতে কখনও ঘৃণাবোধ করেন নাই। তাই সূর্য্যবংশাবতংশ শান্তমূর্ত্তি শান্তনু ধীবররাজের কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে গুণের আদর ছিল। আভিজাত্য তখনও সমাজ অঙ্গে এত সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার পর নূতন এক ধর্ম্ম অভিযান হিন্দুধর্ম্মের দ্বারে আসিয়া সজোরে আঘাত করিল। সেই আঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত সমাজদেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়াও কেবল প্রাণে বাঁচিয়া ছিল। তাহার পর ঈশ-দূতদ্বয় নবম ও একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া সে মূর্চ্ছাপন্ন চলচ্ছক্তিহীন সমাজকে বেদমন্ত্রে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়া নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত করিলেন।

কিন্তু তাহাতে একটু বিশেষত্ব রহিল। প্রাচীন উদার-নীতির স্থলে একটু কুচকাওয়াজ খাটান হইল। "ইতর" শব্দ সমাজ-অঙ্গে অঙ্কিত হইল, কিছু রংলাটেরও ব্যবস্থা হইল। উঠিতে বসিতে কথা কহিতে বাহিরে যাইতে হইল। দুই একটী কৃত্রিম নিয়ম মানিয়া চলিতে হইল। মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল, রাশি রাশি চাল কলা আলু মুলার ব্যবস্থা হইল। শ্রেণীর গণ্ডিগুলির চারিদিকে ঘন ঘন লৌহনির্ম্মিত প্রাকার ও কৃত্রিম খাদের সৃষ্টি হইল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও জাতিবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত হইল। তাহার কিছুদিন পরে আর এক নূতন ধর্ম্মবিপ্লব আসিয়া সনাতন সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করিল এবং কোথায় বা ভগ্ন চূর্ণ স্থান জোড়া দিল। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার পর সমাজ বর্ত্তমান অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পড়ুয়া, বি, এ।

অনুপমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

যতীন্দ্রনাথ সেনের কথা

এই কয়েক মাসের মধ্যে অনিল বাবুর দেহের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক রুগ্ন হইয়া গিয়াছে, দেহের বর্ণ ম্লান হইয়া গিয়াছে, চক্ষের সে দীপ্তি নাই, মুখের সে প্রভা

নাই । যখন তিনি আমাদের ড্রইং রুমে আমার সহিত
দেখা * করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে আদৌ
চিনিতে পারি নাই । এমনকি তাঁহার কণ্ঠস্বরেও না ।
তবে একবার মনে হইয়াছিল এ স্বর যেন কোথায় কবে
শুনিয়াছি । পরে তিনি অনুপমার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা
করিলে আমি তাঁহাকে তথায় উপবেশন করিতে বলিয়া
অনুপমাকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলাম । ড্রইং রুমের
নিকট আসিয়া অনুপমা পর্দাখানি একটু সরাইয়া তাঁহার দিকে
তাকাইতেই তাহার মুখে একটা বিস্ময় ও আনন্দের রেখা
ফুটিয়া উঠিল । আমি তাহার মুখের এই ভাব লক্ষ্য
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম " কে উনি, কোন পরিচিত লোক
নাকি ? ওঁর কণ্ঠস্বরে অনুমান হয় উনি কোন পরিচিত
লোক হবেন, তবে আমি চিনতে পার্চ্ছি না । " অনুপমা
সবিস্ময়ে কহিল " সে কি দাদা ! তুমি অনিলবাবুকে চিনতে
পার নি ? " আমি বলিলাম " একেত ওঁর সঙ্গে আমার
আলাপ খুব কম ছিল, তার উপর ওঁর চেহারারও অনেক
পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাই হয়ত আমি চিনতে পারিনি ।
তাহলে অনু, তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করগে, আমি ততক্ষণ
ওঁর আহারের ব্যবস্থা করি । " এই বলিয়া আমি সেস্থান
ত্যাগ করিলাম । অনুপমা অনিলবাবুর সহিত দেখা করিতে
গেল ।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমি
আহারাদির * সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া অনিলবাবুর নিকট
গিয়া বলিলাম " এত বেলায় আহারাদি না করে আপনি

কিছুতেই যেতে পারবেন না।" তিনি স্মিতমুখে কহিলেন, "যতীনবাবু একজন অপরিচিতের প্রতি এতটা আত্মীয়তা প্রকাশ করবেন না।" আমি তাঁহার কথায় লজ্জিত হইয়া কহিলাম "ক্ষমা করবেন, আমি তখন আপনায় আদৌ চিনতে পারিনি।" তিনি আমার কথার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া কহিলাম "থাক্, কথা-বার্ত্তা পরে হবেখন, আগে স্নানাহার করুন।" তিনি তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় অনিলবাবুর সহিত বারান্দায় পদচারণ করিতে করিতে নন্দকিশোরবাবুর মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের থিয়েটার পার্টী খোলা পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিলাম। তিনিও নদীবক্ষে অনুপমাদের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষ্যাৎ হইতে অদ্যাপি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীঅনিলকুমার রায়ের কথা।

যতীনবাবুর বাড়ী হইতে আসিয়া মেসে আমার পড়ার রুমে ঢুকিতেই টেবিলের উপর আমার নামের একখানা পত্র দেখিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি লেপাফাখানা খুলিয়া দেখিলাম, "শীঘ্র বাড়ী আসুন, আপনার মায়ের ভয়ানক জ্বর ও বিকার। ইতি— জনৈক প্রতিবেশী।"

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই মুহূর্ত্তে গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলাম, মা রোগশয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন আর আমার মামা তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

আমি মায়ের গাত্রে হাত দিয়া দেখিলাম দেহের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, নাড়ীর গতি ক্ষীণ। ধীরে ধীরে ডাকিলাম "মা!" মা আমার দিকে একটীবার মাত্র চাহিয়া বলিলেন "কেও অনিল, এসেছিস বাবা? কাছে আয় তোকে একবার ভাল করে দেখি. আর হয়ত দেখ্‌তে পাব না।" মায়ের কথায় আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি বলিলাম "তুমি ভেবোনা মা, তোমার ও অসুখ শীঘ্র সেরে যাবে।" মা ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন "না বাবা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।" আমি তাঁহার পদতলে বসিয়া বাল্য জীবনের কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম—শৈশবের স্নেহময়ী জননীর সেই আদর; যত্ন আমার স্মৃতির দ্বারে উঁকি মারিয়া আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত নাড়িয়া দিল। কে যেন সবলে আমার বুকে আঘাত করতে লাগল।

আমি সত্বর গ্রাম্য ডাক্তার নরেশবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি সঙ্গে যে কয়েকটী ঔষধ আনিয়াছিলেন তাহার কয়েকটী একত্রে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাওয়াইতে উপদেশ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি সেই ঔষধের এক দাগ তাঁহাকে খাওয়াইলাম। ক্রমে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, আশার একটা ক্ষীণ আলোককণা আমার প্রাণের জমাটবাঁধা নিরাশার আঁধারটা দূর করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় আমাদের গৃহের প্রাঙ্গনে একখানি ঘোড়ার গাড়ী লাগিল। আমি ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলাম, যতীন বাবু ও অনুপমা। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মা এখন কেমন আছেন?"

"তিনি এখন একটু সুস্থ আছেন, আপনারা ভিতরে আসুন।"

এই বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে সাদরে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে মায়ের অবস্থা দেখিয়া আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। দেখিলাম, পূর্ব্বদিন অপেক্ষা তাঁহার দেহের তাপ অত্যন্ত অধিক, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দিতেছে। প্রশ্ন করিলে আদৌ উত্তর দেন না, কেবল এক আধ বার চক্ষু মেলিয়া চাহেন।

আবার নরেশবাবুকে ডাকিতে লোক পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া মায়ের অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। পরে রীতিমত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিকালে মায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার রোগপাণ্ডুর মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মায়ের পুণ্য আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া মুক্ত পাখীর মত কোন অজানা অচেনা দেশে উড়িয়া গেল। নিষ্ঠুর বিধাতার কুটিল বিধানে আমার এতদিনের স্নেহবন্ধন মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিঁড়িয়া গেল। এত বড় অনাবিল স্নেহের পবিত্র নির্ঝরিণী নিমিষের মধ্যে কালের প্রচণ্ড কিরণে শুকাইয়া গেল।

প্রতিবেশীগণের সাহায্যে যখন মায়ের মৃত দেহ বহন করিয়া অদূরবর্ত্তী নদীতীরে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলাম তখন নিশার উলঙ্গ অন্ধকার সমগ্র শ্মশানটার উপর একটা ভীষণতের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। উপরে নিবিড় কৃষ্ণ আকাশে তারকারাজি ক্ষীণপ্রভ দীপগুলির ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। কোথাও একটা সাড়া নাই—শব্দ নাই—সব নীরব নির্জ্জীব। চিতায় আগুন জ্বালিয়া সেই অন্ধকারকে মথিত করিলাম, হরিধ্বনি দিয়া সেই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিলাম—সেই নির্জ্জীব শ্মশানে একটা সজীবতার ছবি অঙ্কিত করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনিলকুমারের কথা।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি আমাদের বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রুমালে করিয়া কতকগুলি ফুল তুলিয়া বাগানের মধ্যস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত একটা বেদীর উপর বসিয়া নতমুখে একখানি মালা গাঁথিতেছিলাম, এমন সময় স্কন্ধদেশে কাহার কোমল করপল্লবের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে একখানি বিনপবিনিন্দিত স্বর বীণার সুরে বাজিয়া উঠিল "অনিলবাবু!" কি কোমল সে স্বর! কি মধু-মূর্চ্ছনাময় সে রাগিনী! কি প্রেম-প্রীতি-অমিয়বর্ষী সে কণ্ঠ! মুখ তুলিয়া চাহিলাম,

দেখিলাম— ফিরোজা রঙের একখানি সাড়ি পরিয়া, সোনালী রঙের একখানি ওড়না গায়ে দিয়া, বেণী দুলাইয়া অনুপমা আমাকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিলাম "দেখ অনু, আমার ইচ্ছা হয় এই ফুলের মালাটা তোমার গলায় পরিয়ে দিই।" আমার কথায় তাহার কমনীয় বদনখানির উপর দিয়া আনন্দের একটা উজ্জ্বল আভা নিমিষের জন্য খেলিয়া গেল। সে আমার হস্ত হইতে মালাটী কাড়িয়া লইয়া কহিল, "আগে আমার গলা থেকে ঋণের ফাসটী খুলে দেন, তারপর ও নূতন ফাস পরাবেন।" এই বলিয়া সে আমার গলায় মালাখানি পরাইয়া দিল। আমি বাহুবেষ্টনে তাহাকে আমার স্পন্দকম্পিত বক্ষের উপর টানিয়া ধরিলাম। তাহার কমনীয় বপুর আনন্দবাহী স্পর্শে আমার তপ্ত দেহখানি সন্ধ্যার শিশিরসিক্ত শেফালিকার ন্যায় শীত স্নিগ্ধ হইয়া গেল। আমি স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে মালাখানি খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলাম। সে ধীরে ধীরে আমার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া আমার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অমনি পাশের একটা আম্রশাখা হইতে কয়েকটী পাখী মিলিত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের সে মিলিত স্বর উলুউলুধ্বনি-মিশ্রিত শঙ্খরোলের মত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া গেল। *

—। সমাপ্ত।—

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

* এই উপন্যাসখানি প্রকাশের জন্য "শিশির-পাবলিসিং হাউসে" প্রদত্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য উহার ফ্রেস কপি আমার নিকট না থাকায় অরিজিন্যাল কপি দেখিয়া ছাপান হইয়াছে। মূল কপি নির্ভুল না থাকায় ইহার অনেকাংশে ভ্রম পরিলক্ষিত হইয়াছে, আশা করি পাঠকগণ ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি— "বিনীত লেখক"

কৃতঘ্নতা।

কোকিল ডাকিয়া কয় "শোন কাক ভাই,
তোমা হতে কোন কাজ কেহ পায় নাই।"
বায়স হাসিয়া কয় "মাতৃভক্ত তোরে
পুত্রবৎ পালিল যে ভুলে গেলি তারে ?"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া বি, এ,

রত্নকণা।

হয় কি পঙ্কিল জলে বিম্বিত কাহারো ছায়া ?
যায়কি কুয়াসা-মেঘে দেখারে সুরয-কায়া ?
বিভু-মুখ-বিম্ব যদি হেরিতে বাসনা মনে,
মুছ ধুলা মাটি যত তব মন-দরপণে।

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী

আত্মনির্ভরতা

চাঁদ কহে প্রদীপেরে, "তুচ্ছ আলো তোর
উজ্জ্বল করিল বিশ্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি মোর।"
প্রদীপ হাসিয়া কয় "এ মোর নিজের
যার গর্ব্বে স্ফীত তুমি সেত অপরের।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া বি, এ,

চয়ন !

জনবল।

* * * সমাজে জনবল কমিয়া যাইবার এবং সোসাইটির উপর সমাজ অধঃপাতিত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কারণ পরবশতা অথবা পরাধীনতা। জীবগণ মধ্যে পরবশতা তিন প্রকার:— অবরুদ্ধ অবস্থা, গৃহপালিত অবস্থা এবং পরপুষ্টাবস্থা। মানবসমাজেও এই ত্রিবিধ অবস্থাই দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদগণ একবাক্যে বলিতেছেন, এ তিন অবস্থাই সর্ব্বনাশজনক। ইহাতে দেহ ক্রমে অবসন্ন এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মনও অধঃপাতিত হইয়া যায়। * * * মানব সমাজ দাসত্ব এবং পরপুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, দুর্ব্বল সবলের অধীন হইলে, নির্ব্বোধ এবং নীচাশয় গোঁয়াড় এবং দুষ্ট ব্যক্তির নিকট অবনত হইলে, এমন একটী অবস্থা উৎপন্ন হয় যাহাতে দাসত্ব ক্রমেই বাড়িয়া চলে, দাসগণ আরও অধিক দাস সৃষ্টি করে এবং পরাধীনের মনোবৃত্তি ও উপকরণ সকল সমাজমধ্যে বহুবিস্তৃত হয়। অবশেষে পরাধীনের জীবাত্মাও সমাজের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে (*) এ অবস্থায় নির্ম্মূল হওয়া ভিন্ন পরাধীনতার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় থাকেনা। পরবশতা ক্রমে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম-চেষ্টা, উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট করিয়া জড়ত্ব আনয়ন করে। ইহাতে ব্যবহারের অভাবে, ও প্রয়োগ স্থল সঙ্কীর্ন হওয়ায় ক্রমশঃ দেহ ও মন দুইই অবসন্ন হইয়া যায়, এমন কি পরিপুষ্ট জীবের পাকস্থলী এবং জননেন্দ্রিয়ও বিনষ্ট হয়। * * দেহমন দুইই যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তবে জনবলত বাতুলের প্রলাপ মাত্র, জীবের অস্তিত্বই থাকেনা।

ঈদৃশস্থলে জীবের আত্মরক্ষার উপায় কি? সবল দুর্ব্বলকে, দুষ্ট নির্ব্বোধকে পদানত করিবেই। তবেকি মানবের আত্মরক্ষার উপায় নাই? আছে! মনকে জড় হইতে না দেওয়াই একমাত্র উপায়। দেহকে শৃঙ্খলমুক্ত না করা দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু মনকে স্বয়ং শৃঙ্খলাবদ্ধ

(*) The Glands regulation Personality By L. Berma.

হইতে না দিলে কেহই পদানত করিতে পারেনা। কথায় বলে "হাত বাঁধিবে, পা বাঁধিবে, মন বাঁধিবে কে?" মনকে জড়ত্ব হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে রাখা এক্ষেত্রে প্রধান ধর্ম্ম। মনকে অপরের নিকট বিকাইয়া দিলে সমস্ত আশা ভরসাই বিনষ্ট হইয়া যায়। আত্মসম্মানবোধ থাকিলে মন কখন পদানত হইতে পারেনা। যে শক্তি সমাজকে অধঃপাতিত করে, সে শক্তির সহায়তা ঐ সমাজে কাহারও করা উচিত নহে; আত্মসম্মান বোধ থাকিলে সে শক্তির সহায়তা ঐ সমাজস্থ কোন ব্যক্তিই করিতে পারেনা। মনের বলই বল। তাহা না হইলে দুর্ব্বল মানব যুগযুগান্তর হইতে বিবিধ বিপদ-সঙ্কুল ধরাপৃষ্ঠে কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতনা এবং জীবরাজ্যে সর্ব্বোচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারিতনা ইহা নিশ্চিত।

* * * মানব অন্য সমস্ত জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া এখন মানবের উপরও প্রভুত্ব স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পরিণাম মানবজাতির ধ্বংস; প্রভুর এবং দাসের উভয়েরই ধ্বংস। * * আমরা হিন্দুজাতি বেদপন্থী, বেদান্ত-দর্শনের অনুগত। আমরাত নিরাশ হইবনা। আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদিগকে নির্ম্মূল করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। বিধাতার জগতে আমাদিগের আবশ্যকতা আছে। "man beast" অর্থাৎ মানব-পশুকে প্রকৃত মানব করিতে হইলে, তাহাকে বিধাতার চরণপ্রান্তে উপনীত করাইতে হইলে জগতে হিন্দুজাতির আবশ্যকতা আছে। আমাদিগের সমকালিক জাতি প্রায় কেহই আজি জীবিত নাই; আমরা কিন্তু মরিয়াও মরি নাই একথা প্রণিধান করিতে হইবে, এ কথা ভুবিয়া বুঝিতে হইবে। আর ইহার যে পন্থা এখনই ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিতেই হইবে। মনকে পরাজিত হইতে কখনই দেওয়া হইবে না। মন অটল রাখিতে হইবে। তাহা চেষ্টার ফল, সাধনার সিদ্ধি। পুরুষকার এস্থলে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে? সাধনা এ ক্ষেত্রে কি মন্ত্র জপ করিবে তাহাই অগ্রে বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩০। শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

বরষা আহ্বান।

সারাটা জ্যৈষ্ঠ গিয়াছে কাটিয়া প্রখর রৌদ্র-তাপে,
নিদাঘ-বিষম দাপে।
ঝিমাইয়া পড়ে গাছ লতা পাতা, স্থলে বারি নাই মোটে,
তরকারি দম্‌ লা হাটে।
জ্যৈষ্ঠের মাঝে পড়েছিল বটে কয়েক ফোঁটা বারি,
চাষীদের ঝকমারি।
চষে বীজধান ফেলেছিল ক্ষেতে, রোদে গেছে জ্বলে পুড়ে
এবে মরে মাথা কুড়ে।
এসেছে আষাঢ়, মেঘ গুরু গুরু, ম্যাক্‌ ম্যাক্‌ ভেক সুরু,
বুকে আশা ভুরু ভুরু।
কভু দেখা যায় কৃষ্ণ মেঘ-নিয়ে উড়ে শুভ্র বকশ্রেণী
কি সুন্দর ছবিখানি!
এসগো বরষা! তাপিত-ভরসা ধারয়িত্রী-অঙ্গ সরসা,
মিটুক চাতক-পিয়াসা।
রঞ্জিত চারু পেখম তুলি নাচুক শিখী শিখিনী
রণিয়া চরণ-কিঙ্কিনী।
দরিদ্রতা-মলিন অধর হক রঙিল আশার পরশে,
যাক চাষী ক্ষেতে হরষে।
এসগো বরষা! বিরহিনী ক্ষীণা দিক্‌ লিপি মেঘদূতে,
চাকুরে পতিরে পেতে।
ঘুচুক দৈন্য ভাসাক বাঙ্গালী অর্ণবে বাণিজ্য তরী,
দুর্নাম যাক্‌ সরি।
ফল পুষ্পে বিবিধ শস্যে ধন ধান্যে বঙ্গভূমি
মাথাটি তুলুক, নমি।
সর্ব্ব সন্তাপ অভাব ঘুচাও স্নেহ স্নিগ্ধ বারি দানি,
এসগো বরষা রাণি!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

রত্নকণা :— আমাদের যে জীবন উহাত ব্যর্থ যাইবার নয়! আমাদের প্রাণের প্রত্যেকটা স্পন্দন বৈদ্যুতিক শক্তির মত লক্ষ হৃদয়ে কার্য্য করিবে এইজন্যইত আমাদের সৃষ্টি! লোকে আমাদিগকে অবজ্ঞা করুক, উপেক্ষা করুক, সে অবজ্ঞা উপেক্ষা তাহাদেরই আপন অঙ্গে গড়াইয়া পড়িবে; কিন্তু আমাদের জীবণের স্বার্থকতা অনার্থই রহিয়া যাইবে। (স্বামী স্বরূপানন্দ)

সমাজ।

নিম্নস্তর জীব হইতে উচ্চস্তর জীব পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর জীব মধ্যে মিলে মিশে থাকবার আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই দেখা যায়। এই আকাঙ্ক্ষাই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একতার মূলে এনে সমাজবদ্ধ করে তুলেছে সকল স্তর জীবেরই সমাজ আছে। আমি প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিত না হলেও জীবশ্রেণীর চালচলন, আচার ব্যবহার দেখে অনুমান দ্বারা কতকটা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েছি। আমরা মানুষ। আমাদের একতাবন্ধন ও সমাজ অন্যান্য স্তরের অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের। কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। পিপীলিকার দল খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বা লব্ধ খাদ্য দ্রব্য ক্ষুদ্র-কণা প্রভৃতি মুখাগ্রে লইয়া বাসস্থান অভিমুখে যাইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলে। যদি তাঁহাদের শ্রেণীর কোন অঙ্গ পদ-বিমর্দ্দনে কোনও লোক বিনষ্ট করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় আবার তাহারা অল্পকালমধ্যে শ্রেণী সংগঠন করিয়া লয়। কিন্তু মানুষের বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষের মনুষ্য সম্প্রদায়কে ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন দেখা যায়। হিন্দুস্থান ভিন্ন ভিন্ন জাতির আধিপত্য ও প্রভুত্বের আবর্ত্তনে পড়িয়া নদীবক্ষে প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ তৃণখণ্ডের মত ইতস্ততঃ হাবুডুবু খাইতেছে।

মুসলমান রাজত্বের কাল হইতে এই খৃষ্টান রাজত্বের কাল পর্যন্ত রাজপুরুষগণের সংগীয় ... ভাবের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। পিপীলিকা সমূহের ন্যায় শ্রেণী বা পংক্তি গঠন করিয়া চলিবার ক্ষমতা একেবারেই লোপ পাইয়াছে ইহার ভবিষ্যত ফল যে কিরূপ দাঁড়াইবে, সাধারণ বিবেচনা শক্তির বহির্ভূত। ধীর স্থিরভাবে সমাজের মনীষিদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত।

ভারতবর্ষের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের হিন্দুসমাজ জাতিত্বের গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে এই সমাজের পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ নব্য সম্প্রদায় দেশের সকল জাতিকে অস্পৃশ্যতাদোষ অর্থাৎ ছুঁৎ মার্গ পরিহার পূর্ব্বক মিত্রতা ও একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছেন। হিন্দুস্থানের নষ্টিক ব্রাহ্মণদল এই মতের বিরোধী। তাঁহারা বলিতেছেন— "ইহাও কি সম্ভব? হিন্দুর বেদ পুরাণ কি মিথ্যা? কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের উচ্চ নীচ কুলে কি জন্মগ্রহণ অসত্য? মেথরের কর্ম্ম— "পাইখানার বিষ্ঠা পরিষ্কার করা।" ব্রাহ্মণের কর্ম্ম— "সুগন্ধি পুষ্প-চন্দন দ্বারা দেবপূজা দেবার্চ্চনা।" উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কত?

আর একদল বলিতেছেন— "ওহে নব্য সম্প্রদায়! মুসলমান কি হিন্দু! খাদ্যদ্রব্যে, আচার ব্যবহারে, পূজা পদ্ধতিতে ও ধর্ম্মে কর্ম্মে কোন্ বিষয়ে হিন্দুর সহিত উহাঁদের মিল আছে? সব বিষয়ে পার্থক্য। পার্থক্য না ঘুচাইতে পারিলে কস্মিনকালেও

তাঁহাদের সহিত আমাদের একভাবে মেলা মেশা চলিতে পারেনা।
একই দেশের মধ্যে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মত এতটা
অসন্তোষের ও অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে।
এত সমগ্র দেশ লইয়া কথা।
দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীমধ্যেও অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে
জমিদার ও দরিদ্র প্রজাবর্গ হইয়া।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সমষ্টি লইয়া দেশ।
পল্লীর অসন্তোষ ভাব বিদূরিত করিতে না পারিলে দেশের হিত-
সাধন-চেষ্টা বৃথা। ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা ও ভোগ-বিলাস-
পল্লীর অধিকাংশ জমিদারকে স্বার্থপরতার নিম্নস্তরে নীত করিতেছে
মোহমুগ্ধ জমিদারবর্গ দরিদ্র প্রজাপীড়নে সমাজে বিষম বি-
শৃঙ্খলতা আনয়ন করিতেছেন! যাহাদের আধপেটা অন্ন
খাইয়া দিন যায়, পরিধান ছিন্ন বস্ত্র. দেশবাসী ধনবান জমি-
দার ভাতৃবৃন্দ যাহাদের পীড়ক তাহাদের অত বড় একটা
দেশের বা সমাজের তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইবার জেদ নাথাকাই
সম্ভবপর।
প্রজাপীড়ক পল্লী-জমিদারশ্রেণী অন্তর্ভুক্ত
এক মোড়ল ধনবান সম্প্রদায় আপন গ্রাম বা পল্লীমধ্যে
আপনাদের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া-
ছেন। গ্রামের মধ্যে দু একজন গরীবের ছেলে যদি সুশিক্ষা
লাভ করিয়া অধঃপতিত গ্রামের কুরীতি সংশোধনে ও উন্নতিতে
একটু মন সংযোগ করেন. ধনবানেরা তাঁহাদের মানের খর্ব্বতা
উপলব্ধি করিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাদিগকে অপদস্থ ও কোন
ঠাসা করিয়া রাখিতে প্রয়াস পান!' মোটের মাথায় কোন

সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়ের মতের পোষক নহেন।

এই সব অন্তরায় এই সব বিভিন্ন মত সমাজকে অবনতির পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়াছে। যদি ন্যায় সত্য ও ধর্মের ভিত্তির উপর সমাজগৃহ গঠনের চেষ্টা করা যায়, কতকটা সফলকাম হইতে পারা যাইবে বলিয়া বোধ হয়। আমরা দেশবাসী পরস্পর পরস্পরের হিত সাধন করিব, হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইব জমিদার ও দরিদ্র প্রজার মধ্যে স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ বা পীড়নের ভাব থাকিবেনা। জাতি ও ধর্ম লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা দ্বৈভাব বা প্রভৃতি স্থাপনের প্রয়াস একটুও স্থান পাইবেনা। একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলে সম্পূর্ণভাবে না হক আংশিক ভাবে এ সব বাক্যে সার্থকতা প্রতীচ্য দেশে বিদ্যমান বলিয়া প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচ্য এতটা সাফল্য ও গৌরবলাভে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া ধারণায় আসে!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

মুক্তকণা :— বিপদই মানুষকে বড় করিয়া তোলে। তাহার সমগ্র জীবনের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার এমন উপযুক্ত পরীক্ষক আর নাই। নিকষ-পাষাণে কষিয়া বিপদই তোমার যোগ্যতার বিচার করিয়া লয়, বিপদই মুক্তকণ্ঠে তোমার উত্তরণ-কাহিনী ঘোষণা করিয়া দেয়। একটা একটা করিয়া বিপদের পাথর দিয়া যে বিরাট বিস্তৃত মন্দির নির্মিত হয়, তাহারই মধ্যে কীর্ত্তিদেবতার প্রতিষ্ঠা।

(স্বামী স্বরূপানন্দ)

স্বার্থ পরিণাম।

আর্য্য এ ভারতে যবে করে আগমন,
বর্ণে কর্ম্মে ভেদাভেদ
ছিলনা এ ভাবচ্ছেদ,
তাদের সৌভাগ্য তাই করিলা বরণ,
বাঙ্গালী কাঙ্গালী নাম তখন স্বপন।

আলোক সৃজিত বিশ্ব তমঃনাশ তরে;
মেঘলোক ভেদ করি
উঠিয়াছে হিমগিরি,
সে আলোকে ঢাকিবারে পারিয়াছে কিরে?

আর্য্য জাতি সাম্যধর্ম্ম হারাল যখন,
বর্ণে কর্ম্মে—ব্যাবধান
নাশিল একতা প্রাণ
হরিল বীরত্ব গর্ব্ব উচ্চ মান ধন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,—তিনটী ভাগেতে
একই আর্য্য দেহ কেটে
তিনেতে লইল বেঁটে
তিন ধর্ম্ম তিন কর্ম্ম—স্বার্থ ছলনাতে।

কহিনুর—প্রজ্ঞারত্ন হরিয়া ব্রাহ্মণ
"একছত্র অধিশ্বর"
ঘোষিল সবার পর
দেবতা আসনে রাখি গর্ব্বিত চরণ।

নিরাকার পরব্রহ্মে আনিয়া সাকারে
দেবতা অসংখ্য গড়ি
স্বরচিত শাস্ত্র পড়ি
সাজিলেক পুরোহিত অন্ধ সবা পরে।

ব্রাহ্মণের বেদ হল চাল কলাময়,
বিষয়-বাসনা-তৃষা
হইল শাস্ত্রের ভাষা,
স্মৃতি শ্রুতি ব্যাকরণ হল তর্কময়।
নির্বিষ খোলষ স্কন্ধে—শুভ্র উপবীত
জাতীয় গৌরব রটে,
তীরবেগে বাকা ছুটে,
পশ্চাতে পাণ্ডিত্য লুটে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
টলিল সমাজভিত্তি স্খলিত চরণ—
ক্ষত্রিয়ের রাজাসনে
বৈশ্য-ধন ধান্য পানে
কলুষিত দু নয়ন— চাহিলা তখন।
শৌর্য্য বীর্য্য, ভাগ্যলক্ষ্মী,—মাগিলা বিদায়,
অন্ধদৃষ্টি, পশুবল,
ভীরুতা,— ভাগ্যের স্থল
নিলা কাড়ি, আর্য্যসুত কাঁদিয়া লুটায়;
সমাজশাশন দূরে, দেশ অরাজক,
স্বার্থ দ্বেষ মাঝখানে
প্রাণের বাঁধনে টেনে
ছিঁড়ে ফেলে গঠিলেক সহস্র রাজক।
ওদিকে সিন্ধুর তীরে ভেরীর নিনাদ
করিলেক মুসলমান,
কাঁপিল বাঙ্গালী প্রাণ,
কোথা বীর্য্য? সে একতা? গনে পরমাদ!
"সপ্তদশ অশ্বারো সাথ বক্তিয়ার
বঙ্গপথে"— শুনে যত
বঙ্গের চানক্য শত
শাস্ত্র ঘেঁটে দেখে "বঙ্গ যবন রাজার!"

ব্রাহ্মণের শাক—বেদ ! বীর রাজা তায় !
বখ্তিয়ার বঙ্গে ঢুকে,
অঞ্চলে দেহটী ঢেকে
প্রাসাদ আড়ালে রাজা তরিযোগে ধায় !
ভুলি স্নেহ করুণা স্বদেশ মাতার
ভবানন্দ স্বার্থে মজি
কৃতঘ্ন সন্তান সাজি
যবনে বিলায়ে দিল সর্ব্বস্ব যে তাঁর !
যে মোগল, প্রতাপ ! তব বক্ষরক্ত দিয়া
ময়ূরের সিংহাসনে
তাজমহল বিমোহনে
নির্ম্মিল, সে তব বন্ধু স্বার্থের লাগিয়া !
পলাশীর রণক্ষেত্রে সঁপিছ আত্ম প্রাণ,
সে সিরাজ-রক্তে লালী
করিলে ইংরাজ-ডালী
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সব স্বার্থান্ধ শয়তান !
নন্দকুমারের ফাঁসী ?—স্বার্থ এম্নি হায় !
মনে প্রাণে—দেশনেতা
দীন অনাথের পিতা
বধিলে নিষ্পাপ বৃদ্ধে মিথ্যা রটনায় !
অন্নদাতা শ্বশুরের হত্যা কামনায়
জামাতা চক্রান্ত করে,
বঙ্গে আর বাকী কি রে ?
ধিক্ রে বাঙ্গালী তোর স্বার্থপরতায় !
হা স্বার্থপরতা তুই কেন বঙ্গে এলি ?
বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি
শূরতা সৌভাগ্য শুদ্ধি
ও মোহিনী রূপসরে সকলি ডুবালি !
তোরি প্রেমে মজে আজি বাঙ্গালী কাঙ্গালী !!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস।

আবহাওয়া।

গত ১৬জুন কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলন শেষ হইয়াছে। তাহাতে বহু সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়া তীর্থ দর্শনের পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। আশাকরি সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় এই সাহিত্য-পীঠস্থানে প্রতিবর্ষে এ সম্মিলনী বসিবে।

আবার গৌরীশঙ্কর-অভিযান আরম্ভ হইবে দেখি এবার কি হয়!

অনেক নকল টাকাআধুলি প্রস্তুত হইতেছে। নমুনা তাহাদের গুপ্ত ট্যাকশাল।

ডাকে একটী ইনসিওর হারাইয়া যাওয়ায় শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার মজুমদার ভারত সচিবের নামে ১১০০৲টাকা দাবী করিয়াছেন।

নানাস্থানে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ শুনা যাইতেছে। সহযোগী অসহযোগী উভয়েই তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা অক্ষম! হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যতিত ভারতের দুর্ভাগ্য ঘুচিবেনা।

আগামী কংগ্রেসে মৌলানা মহম্মদআলি সভাপতি হইবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে হাওড়ায় একটী "সাহিত্যসম্মিলন" বসিবার কথা শুনা যাইতেছে।

জার্ম্মানির যে বিখ্যাত জ্যোতিষ য়ুরোপে মহাযুদ্ধের কথা পূর্ব্ব হইতে বলিয়াছিলেন তিনি বলিতেছেন জার্ম্মানির সহিত ভারতেযুদ্ধ আরম্ভ হইবে।

১—২বৎসর পর্য্যন্ত ৫জন, ২—৩ পর্য্যন্ত ১০৮জন, ৩—৪ বর্ষ্যন্ত ১৫৮, ৪—৫পর্য্যন্ত ২৪৫, ৫—১০ পর্য্যন্ত ১৪১৫ শুধু কলিকাতায় বালিকা-বধুদের সংখ্যা। যাহাদের সমাজে একবৎসরের মেয়েও বিবাহ হইতে পারে তাহাদের সাগরের জলে ডুবিয়া মরা উচিত!

আনসারী ও নাইডুর উদ্যোগে এলাহাবাদে গোহত্যা নিবারনের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য একটী সম্মিলন হইয়াছিল।

শো ভ না

৯ম সংখ্যা

র্ষ ১৩৩০

ইতিহাস।

কে বুঝে কালের লীলা ?
জগৎ জুড়িয়া শুধু আবর্ত্তন
আলো আঁধারের খেলা।
ঐ হোথা আলো, ঐ অন্ধকার
ইতিহাস-বক্ষে আলেখ্য তাহার,
স্থূল যুগধর্ম্ম-সূক্ষ্মতর গতি-
মহিমা বুঝাই ভার—,
উত্থান পতন এযে চিরন্তন
ভাবুক ভাবিয়ে ভোলা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

জাতের কথা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এক্ষণে দেখা যাউক যাহাকে আমরা জাতিভেদপ্রথা বলি তাহা সনাতন জাতিবিভাগ কিনা।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও উপপুরাণ পাঠে জানা যায় যে আদিম কালে জাতি বিভাগ ছিল, কিন্তু তাহা জাতিভেদ নহে। এই ভেদবুদ্ধি আমাদের মধ্য যুগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতই মানুষের শক্তি সামর্থ্য কমিতে থাকে যতই অভ্যন্তরস্থ মহতী বৃত্তিনিচয় শুষ্কীভূতা হইয়া যায়, ততই মানবের ভেদবুদ্ধি, বিদ্বেষভাব, ঘৃণা, হিংসা গড়াইয়া উঠে। মানুষ নিজে যে বিশ্বাস, যে শক্তি হারাইতে বসে সে শক্তি সে বিশ্বাস অপরের মধ্যে দেখিতে পায়না। নিজের মূল্য যতই নামিতে থাকে অপরের মূল্য ততই পড়িয়া যায়। মানুষ পরের গুণ ও নিজের দোষ দেখিতে পারেনা। কাজেই মধ্যযুগে জ্ঞানসমদ্রের চতুর্দ্দিকে বেড়া দিবার প্রয়াস দেখা গেল। তাহারা তাই নিম্ন শ্রেণীর সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল— আমরা উচ্চ আদর্শ হারাইয়াছি যাহাতে অপরে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া না আসিতে পারে, তাহা করিতেই হইবে। তাই তাহারা প্রাণপনে কায়মনোবাক্যে এই নিম্নস্তরের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। দর্শনে, স্পর্শনে, বাক্যালাপে তাহারা কেবলই ঘৃণা, উপেক্ষা ও পদাঘাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল প্রভৃতি নীচ পশুর চাইতে তাদের আসন অনেক নীচে স্থাপিত

হইল। তাহারা যে সদসদ্ বোধ বিশিষ্ট মানব সে ধারণা তাহাদের নাই। এই যে তাহাদের একটা অন্ধ সংস্কার এই যে তাহাদের একটা অজ্ঞান কুহেলিকা, এই যে গুণের অনাদর, ইহা বর্ত্তমান সভ্য জগতের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ঋকবেদে অসংখ্য আছে। আধুনিক কালেও প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পাঠে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। পাশ্চাত্য জগতের উচ্চহৃদয় রাজনীতিক্ষেত্রের উজ্জ্বল রত্ন যে প্রেসিডেন্ট ওয়াসিংটন নূতন মহাদেশে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে প্রজাশাশন তন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁহার জন্ম সামান্য এক দাস বংশে। যুদ্ধবিদ্যায় ভীমসেন, রাজনীতি ক্ষেত্রের চাণক্য, গনিতবিজ্ঞানের বরাহমিহির, উনবিংশ শতাব্দীর পুরুষসিংহ নেপোলিয়ন নগন্য কৃষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি জ্ঞান-রাজ্যের একছত্র সম্রাট ঋষিকল্প স্ক্রেটিস ধাত্রীনন্দন বলিয়া ত কই ঘৃণিত উপেক্ষিত হন নাই? আজ যদি নিউটন নগন্য কৃষক সন্তান বলিয়া অনাদৃত হইতেন তাহাহইলে বিজ্ঞান আজ লোকলোচনের অন্তরালে অথবা কেবল কল্পনারাজ্যের বিষয়ীভূত হইত।

যাঁহার লেখনী হইতে স্বাধীনতামন্ত্র প্রথম নিসৃত হইয়া সমগ্র জগতের এক অভিনবতার সৃজন করিয়াছে সেই ফরাসীকবি ও দার্শনিক রুশো এক কুটীর-বাসী ওচর্ম্মকারপুত্র। জর্ম্মনকৃষক সন্তান রাসায়নিক ভকলীন, কসাইনন্দন ডিফো, কুম্ভকারনন্দন বার্নাড়, কৃষকনন্দন কবি ফুলার স্কটদেশীয় কবি বার্নান ইহাঁরা অতি হীন অবস্থা হইতে উঠিয়াছেন।

প্রতিভা জ্ঞান ও কর্ম্ম জাতিবিশেষের সম্পত্তি নহে। এই যে ছোট জাতি যাদের আমরা ঘৃণা করি থু থু ফেলি ও দূর দূর করি, তারা যদি উপযুক্ত সুবিধা ও সন্ধান পায় তাহা হইলে তাদের ভিতরের নির্জীব মালমসলা সজীব হইয়া উঠিবে বহুদিনের চাপা প্রতিভা যাহা ব্যবহার অভাবে মরচে ধরে গেছে, যাহার উপর একটা ঘন আবরণ আবর্জ্জনা জমাট বেঁধে বসে আছে তাহা আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াবে, অন্তর্বিকাশ বহির্বিকাশে পরিণত হইবে। তাহা বহুদিনের বন্ধন ছিঁড়ে একবারমাত্র স্বাধীনতার বাতাসে বেরিয়ে পড়ে ছোট ছোট জাত ভাইরা আজ পুরাতন পুঁথি পাতড়া ঝেড়ে ঝুড়ে তাদের যাকিছু সন্ধি, যা কিছু রহস্য বের করাচ্ছে এবং একমনে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে লেগে গেছে। প্রত্যেক বৎসরের পরীক্ষার ফল দেখলে বোঝা যায়, মুচি চামার হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত পুরাণতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও তাহাদের প্রতিভার তীক্ষ্নতা কম দেখা যায় নাই। তাই আজ গনক সমাজ, ধীবরসমাজ, নাপিতসমাজ ও নমঃশূদ্র সমাজের মধ্যে নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই যে আজ এত বাতি ধুংধুনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে— তাহার কারণ— নূতন জাগরণ। বহু দিনের আটকান বুদ্ধি আজ সব বাধা বিঘ্ন ঠেলে যেন মুখ তুলে উঠেছে। আজ তাহারা তর্জ্জনী হেলনে উচ্চতর জাতিকৃত পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। এত বড় সমাজ—সঙ্ঘকে পায়ের নীচে রাখা আর সম্ভব নয়। ইহার ফলে যে সত্বর একটী সামাজিক বিভ্রাট উপস্থিত হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিতে আমাদের হৃৎকম্প হয়। হে ভগবান তুমি রক্ষা কর তুমি বার বার রক্ষা করিয়াছ এবারও রক্ষা করিও। দেখো যেন বিশৃঙ্খলতা না আসে—উন্নতির নামে যেন অবনতি না ঘটে,—সাম্যের

মাঝে যেন বৈষম্য না আসে—উৎকর্ষের স্থলে যেন অশান্তি না হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক জাতিভেদপ্রথা যদি অহিতকর—জাতিবিভাগ হিতকর কিনা—

এস্থলে প্রশ্ন এই—তবে কি জাতিবিভাগ তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব— কখনই না।

একটী শস্যক্ষেত্রে অসংখ্য অধিবাসীর জমি আছে যদি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বাঁধ বা সীমা না থাকে তাহা হইলে আবাদের সময় যখন ক্ষেত্র জলে জলময় তখন কিরূপে স্ব স্ব ক্ষেত্র চিনিয়া লইবে ? কিন্তু তাই বলিয়া যদি প্রত্যেকে স্ব স্ব সীমা এরূপ সুদৃঢ় করে যে একজন অপরের জমির উপর যাতায়াত করিতে অথবা জল প্রবেশ ও নির্গত করাইতে না পারে তাহা হইলে কেহই শস্য উৎপাদন করিতে পারেনা। ফলে — সকলের জমি পতিত থাকিয়া যায়। সেইরূপ শ্রেণীসমূহের মধ্যে অন্তরায় বা সীমা থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাহা শৃঙ্খলতার জন্য—বিরোধের জন্য নহে। যেন বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ।

এইগুলির মধ্যে কেহই আবশ্যকীয় নয়—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যের জন্য সৃষ্ট। কিন্তু একটীকে বাদ দিলে অবশিষ্টগুলি চলেনা —আকাশে সূর্য্য প্রধান জ্যোতিষ্ক কিন্তু তাই বলিয়া কি নক্ষত্রমণ্ডলী বাদ দেওয়া চলে ? চরণ বাদ দিলে কি শুধু মস্তক লইয়া লোকেরা যায় ?

অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যাহারা যে কাজে অনভ্যস্ত তাহারা কি সে কাজে পারদর্শী হইতে পারে ? অভ্যাস জন্মগত ও বংশগত হইলেও ব্যক্তিগত জীবনে

তাহা অনেকসময় সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়— তাহার প্রথম ও প্রধান সোপান অনুশীলন। অধ্যবসায় ও অনুশীলনের মত অঘটন ঘটন পটীয়সীবৃত্তি আর দেখা যায় নাই। এই দুয়ের ঐকান্তিকতার নিকট অনেক সময় অভ্যাস বা সংস্কার পরাস্ত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশেও ইহার উদাহরণ ভূয়সঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য দেশেও এই শ্রেণীবিভাগের লক্ষণ প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। এখানে অভিজাত ভাগ সাধারণ প্রজাগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে আহার অথবা বিবাহ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে সাধারণ ও বিশিষ্ট এই দুই দলের মধ্যে ভীষণ ঈর্ষা দ্বেষ ও বৈষম্য দেখা যাইত। তবে সে ভেদনীতির মূলে অর্থ নিহিত। অর্থই সেখানে উচ্চ নীচ শ্রেণীর সৃষ্টিকারণ। সুখের বিষয় বর্ত্তমান উদারনীতি ইংরাজশাশন গুণে ভারত ক্ষেত্র হইতে ক্রমে ক্রমে এই হিংসা সরিয়া যাইতেছে— পূর্ব্বে দ্বিজজাতীয়ের একচেটিয়া ছিল শাস্ত্রসমূহ বর্ত্তমান জাতীয়শিক্ষার তালিকা দর্শনে জানিতে পারা যায় যে সে একাধিপত্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৮৩৫ সালে সংখ্যায় কায়স্থ ১ম স্থান, ব্রাহ্মণ ২য়, সুবর্ণবনিক ৩য়, তন্তুবায় ৪র্থ, বৈদ্য ৫ম, মাহিষ্য ৬ষ্ঠ, নাপিত ৭ম, কর্ম্মকার ৮ম, তিলি ৯ম, গোপ ১০ম, স্বর্ণকার ১১শ ইত্যাদি—

১৮৩৬ সালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায় সুবর্ণবনিক বৈদ্য মাহিষ্য ক্রমেক্রমে ক্রমানুসারে স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১৮৩১সালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ২য়, সুবর্ণবনিক ৩য়, তন্তুবায় ৪র্থ তিলি ৫ম বৈশ্য ৬ষ্ঠ ইত্যাদি। ১৫৪০ সালে কায়স্থ ১ম ব্রাহ্মণ ২য় বৈশ্য ৩য় মাহিষ্য ৪র্থ তন্তুবায় ৫ম সুবর্ণবনিক ৬ ষ্ঠ ইত্যাদি। ১৮৫০ সালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাহিষা বৈশ্য ইত্যাদি।

এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষা বিষয়ে তথা-কথিত ছোট জাতভাইরা ক্রমেক্রমে অগ্রসর হইতেছে এবং উচ্চজাতিকে পরাস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছে। এঅবস্থায় আর তাহাদিগকে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য ইত্যাদি না কহিয়া যাহাতে তাহাদের সত্যিকার পুরুষ ফুটিয়া উঠে তাহার চেষ্টাকরা ও যে অধিকার পাইবার দাবি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাহা ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ ঘৃণার পরিবর্ত্তে স্নেহ করিলে, তাহাদের গর্ব্বস্ফীত মস্তক সমাজের পায়ে লুইয়া পড়িবে, তখন তাহাদিগকে আমরা প্রীতির কটাক্ষে পরাজিত করিতে পারিব, নতুবা তাহাদের "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" দিলে তাহারা আরও গর্ব্বস্ফীত হইবে এবং শান্তির কণাতে গড়া সমাজমধ্যে অশান্তিবহ্নি প্রজ্বলিত হইবে। আসুন আমরা এ শান্তির শুভ মুহূর্ত্তে নূতন পুরাতনের সন্ধিক্ষণে আমাদিগের ছোট জাতভাই দিগকে স্নেহালিঙ্গনে নিজের করিয়া লই, তাহাহইলে তাহারা অসূয়া পরিত্যাগ পুর্ব্বক আমাদের সেবা করিতে ভুলিবেনা, আসুন আমরা আর একবার বেদমন্ত্রে সামতন্ত্রে গাইয়া উঠি, ভগবানের রাজ্যে কেহই হীন ঘৃণ্য উপেক্ষনীয় নহে। পরস্পর পরস্পরের উপকারার্থে নিযুক্ত। সকলে সেই অমর বিশ্বপাতার নিয়োজিত কর্ম্ম করি আসুন এবং স্ব স্ব শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁহার চরণ-প্রান্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি আসুন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া বি, এ,

যোগী ও গৃহী।

জনকলকণ্ঠরোল যেথা নাহি পশে—দূর
সুগভীর বনে
বাঁধিয়া আশ্রম ক্ষুদ্র এক যুবা যোগী রত
পরম চিন্তনে।
কভু পদ্মাসনে, কভু বাম পদে বৃদ্ধাঙ্গুলে
কেবল নির্ভর,
দুটী বাহু ঊর্দ্ধে স্থিত কভু হেট মুণ্ড, পদ
আকাশ উপর।
গ্রীষ্মে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি, বর্ষায় বৃষ্টির ধারা
লইয়া মাথায়,
শীতে বস্ত্রহীন হয়ে, অহর্নিষ যোগমগ্ন
বিগত নিদ্রায়।
অন্ন—দিনে একবার, ভিক্ষালব্ধ মুষ্টি চালে,
ঘৃত ও কলায়,
কভু দুটী বনফলে, কোনমতে ধরি প্রাণ
বাঞ্ছিত আশায়।
কত রবি শশী তারা উঠে দিন অস্ত যায়
আশ্রম উপর
কঠোর সাধনা মাঝে এক, দুই, তিন গত
বারটী বছর।
কুটীর সম্মুখে এক বিশাল বকুল, শত
বাহু ছড়াইয়া।

স্নিগ্ধ সুশীতলচ্ছায়— শত স্নেহনীড় রচি
আছে দাঁড়াইয়া।
কৃচ্ছ্র সাধন শ্রান্ত ক্লান্ত অতিশয় যবে
আকুল অন্তর,
শান্তিভরা নীড়বক্ষে ব্যাকুল ছুটিয়া আসে
ক্ষুব্ধ যোগীবর,
তরুবর নিজবুকে দিয়া ফুলদল রচে
শয্যা সুকোমল,
আসি তার'পরে যোগী ঢেলে দেয় তপ্ত বুক
তনু সুনির্ম্মল,
অমনি নিরুদ্ধ স্নেহ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠে
চক্ষু ছল ছল,
ঝুর ঝুর পড়ে ফুল যোগীশিরে মুখে বুকে
নয়নের জল;
ব্যজনি বাতাস করি মুছে দেয় মুখঘর্ম্ম
কপোল সুন্দর,
মাতৃস্নেহ সুধাক্ষীর সৌগন্ধে উথলি পড়ে
ছাপিয়া অম্বর।
প্রাণভরি করি পান বড় তৃপ্ত ভুলে যোগী
সংসার স্বরগ,
মদিরমাখান তানে যোগীরে পাড়ায় ঘুম
ভ্রমর বিহগ।
মোহন প্রভাতে এক বসি তরুবর তলে
তাপস যুবক

সৌন্দর্য্যের শত উৎস হেরিছে বনানি শোভা,
আঁখি নিষ্পলক।
তরুণ অরুণ রশ্মি সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে দিছে
মধুর স্বপন,
হেমনিভ যোগী দেহে লাবণ্য তরঙ্গ যেন
করিছে নর্ত্তন।
টুপ টাপ পড়ে ফুল বকুলের ডাল হতে
আশীষ মধুর,
ফুলময় যোগী অঙ্গে সমীর পরশে উঠে
গন্ধ ভুর্ ভুর্।
হেথা—হোথা—দূরে কাছে পাখীর অমিয় তান
শ্রবণ কুহরে
স্বরগ অপ্সরা গীতি ঢালিয়া দিতেছে যেন
লহরে লহরে;
মুগধ মোহিত যোগী, আপনারে হারাইলা
সৌন্দর্য্য মাঝারে,
কল্পনার আঁখি আগে সৌন্দর্য্য নির্ঝরে হেরে
মুক্তারাশি ঝরে।
অকস্মাৎ ঝর ঝর শুষ্ক পত্র রাশি রাশি
পড়ে শিরোপর,
উর্দ্ধে, চাহি দেখে যোগী— দুরদৃষ্ট কাক বক
বৃক্ষশাখা পর
সংগ্রাম নিরত, তাই ঘাত প্রতিঘাত চ্যুত
পল্লব সকল

পড়িয়া যোগীর শিরে হায় সে সোনার শান্তি
করিল চঞ্চল;
হল ক্রোধ উপজয়, কাক বকে সম্বোধিয়া
কহিলা তখন—
"আরেরে দুর্বৃত্তগণ! পুণ্যশিরে শুষ্কপত্র?
সাহস এমন?"
বিস্ফারিত রক্তচক্ষু, যেমনি চাহিলা যোগী
বজ্রাগ্নির প্রায়
যোগাগ্নি স্ফুরিলা ভালে হতভাগ্য কাক বক
হল ভস্ম তায়।
জীবন আহুতি ঢালা সাধনার ফল এই
লক্তির বিকাশে
বিস্ময় বিহ্বল যোগী দুকুল প্লাবিত বক্ষ
আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
গর্ব্ব বলে—ধন্য যোগী, ধন্য তব যোগবল—
অতুল জগতে!
একটী কটাক্ষপাতে ভস্মীভূত দুটী জীব!
কি শক্তি তোমাতে!!

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস।

কাহিনী।

কথক—শ্রীশ্রীপ্রদীপ।

তোমরা ইতিহাস পড়। দেশবিদেশের রাজরাজড়ার খবর রাখ। কিন্তু তোমার চিরসাথীর ইতিহাস শুনিবে কি?

আমি যে তোমার জীবনের চিরসঙ্গী! সেই যেদিন তুমি প্রথম সূতিকাগৃহে অবতরণ করিলে সেদিন নাভীচ্ছেদন কালে আমি তোমার পার্শ্বেই ছিলাম। আমারই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে তোমার মুখচন্দ্র দেখিয়া প্রসূতি গর্ভযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর আমিই গৃহকোনে আগুন জ্বালিয়া তোমায় উত্তপ্ত করিয়াছিলাম। জননী আমারই শিখার কালি কজ্জল করিয়া তোমার নয়ন রঞ্জিত করিতেন।

এইভাবে কতদিন যায়— আমি তোমা ছাড়া থাকিতে চাহিতাম না। তুমি বালক হইয়াও এখন বুদ্ধিমান ছিলে। আমার বিরহ তোমার সহ্য হইত না। তাই রাত্রিতে তুমি ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে আর কোনক্রমে আমি কাছে আসিলেই কান্না দূরে যাইত। আমার দিকে শুধু নিমেষহীন নয়নে চাহিয়া থাকিতে——যেন দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটিত না। তখনত তোমার সবই খেলনা। সারা বিশ্বই বুঝি খেলনা। তাই আমায়ও খেলনা ভেবে ধরতে ছুটতে।

এমনি করে আমার সঙ্গে থেকেই তুমি বাড়তে লাগলে।

* * * * * * * * *

তোমার অন্নপ্রাসনের দিনে কত আত্মীয় বন্ধু আসিল। তোমার জীবন মরণের সাথী আমি কি সেদিন তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারি ? আমি আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে একটা নূতন যায়গা দখল করিয়া বসিলাম। নিশ্চয়ই পুরোহিত ঠাকুর তোমার অন্নপ্রাসনের ফর্দ্দে আমার এ আগমনটার উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেটা একটা বিরাট হস্তবৎ। স্বয়ং পুরোহিত সাদরে আমায় সেথা বসাইলেন। বোধ করি তথায় আমার ন্যায় উচ্চ আসন কেহ পায় নাই। আমার পেটটা সেদিন ঘিয়েই পুরে ছিল। বুঝি তোমার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ঘিয়ে এমন পেট ভরতে পায় নাই!

মিলন পথে নিয়তই শত শত বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। দুটি নিষ্পাপ কোমল হৃদয় পরস্পর মিলনোন্মুখ হলে নিষ্ঠুর সংসার তাতে বাধা দিতে চায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। তোমার মাতা পিতা হইলেন মিলন পথে অন্তরায়। তাঁরা আর তোমায় আমায় একত্র থাকতে দিলেন না। দূরে থেকেই যা দেখা-সাক্ষ্যাৎ। অবশ্য তুমি দু একদিন আমায় আলিঙ্গন করতে এসেছ কিন্তু তিরস্কৃত হয়ে বিরহ-কাতর-স্বরে কত কেঁদেছ। তুমি কতদিনই সংসার মরুর আশ্রয় স্নেহময়ী মায়ের কোল থেকেও আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করেছ। আমি তোমার এমনি স্নেহের।

কিন্তু তখন সবে বালক তুমি শুধু রূপ খুঁজতে। গুণের আদর করিতে শেখ নাই। তাই আমার রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলে। ভাগ্যে তোমার মাতা পিতা সাবধান ছিলেন— নতুবা তুমি পুড়িয়াই মরিতে। যে গুণ ভুলিয়া শুধু রূপের আলোকে মজে তাহাকে এমনি মরিতে হয়।

তারপর তোমার তোমার শিক্ষা কাল। কোন শিক্ষার্থীই আমায় না ভালবাসিয়া পারে না। তাই তোমরাও আমায় কেন্দ্রে রাখিয়া চারিদিক ঘিরিয়া বসিতে।

তুমি যখন সত্য সত্য এক পড়ুয়া হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে, তখন গৃহত্যাগ করিলে— মাতাপিতা, ভ্রাতা ভগিনী আর প্রিয়তম খেলনাগুলি ছাড়িয়া প্রবাসে আশ্রয় লইলে— কিন্তু কই আমারত ছাড় নাই ?

পরীক্ষা আসিল। রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলে। নিশীথে সকলে ঘুমাইয়া পড়িত— এমন কি বিশ্ব প্রকৃতিও নীরবে নিদ্রা যাইত তখন শুধু আমিই তোমার সঙ্গে রাত্রি জাগিলাম। অবশ্য তুমি অকৃতজ্ঞ নও— পাশের পর তোমার ভোজের আনন্দেও আমায় তৃপ্ত করিয়াছিলে।

তারপর গেল— অনেকদিন।

তোমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন আসিল—— যেদিন তুমি জীবন সঙ্গিনীর উদ্দেশে মহা আড়ম্বরে যাত্রা করিলে, সেদিন আমারও একটা মহা আনন্দের দিন। আমি সেদিন বহুরূপী সাজিলাম। মঙ্গলদীপরূপে গৃহকোনে অবস্থান করিলাম। তুমি যানে আরোহন করিলে আমিও যানমধ্যে বহুরূপে চলিলাম। এইবারে আমি কত ভঙ্গী দেখাইয়া বরযাত্রীদের মনোরঞ্জন করিলাম ! তোমার গৌরব বার্তা বিমান পথ বাহিয়া স্বর্গে বিঘোষিত করিলাম— ক্ষুদ্র ফানুসের ভিতর বসিয়া। দশদিকে এ এ আনন্দের সংবাদ প্রচার করিলাম—— হাউই ও বোমাদির ধ্বনিতে। আর পাতালেও এ হর্ষ চিহ্ন জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই জলমধ্যে থাকিয়া নানাপ্রকার বিকট

রব করিয়াছি ।

তারপর আর কত বলিব,——

আসরটা আমিই জমকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কোথাও কাচের মধ্যে কোথাও মোমবাতির উপর আবার কোথাও দোদুল্যমান ঝাড়ের ভিতর গর্ব্বস্ফীত আননে ।

বাসর গৃহে দুইটী তরুণ হৃদয়ের মাঝখানে আমিই বসিয়াছিলাম । তোমায় লইয়া যতক্ষণ পুরবাসীগণ আমোদ আহ্লাদ করিয়াছে তাহা আমারই সাহায্যে । আবার সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সারারাত্রি পাহারা দিয়াছিলাম আমিই ।

তারপর ফুলশয্যার দিনেও আমি তোমার সহিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম । তখন ক্ষীণ নয়নে সততই আমি তোমার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছি । নয়কি ?

তারপর কর্ম্মজীবনের প্রতিনিয়তই আমার সহিত সদ্ভাব ।

* * * * * * *

এইভাবে কতকাল গিয়াছে । আজও আমি তোমায় ছাড়ি নাই । প্রবন্ধ, কবিতা, গল্পাদি লিখিবার সময় গভীর নিশীথে কল্পনার সহিত আমিও উপস্থিত হই । আমায় তুমি ছাড়িতে চাহিলে আর পারিবে না । অন্ততঃ তোমার মহামিলনের দিন পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গ লইবই ।

শ্রীবিহারিভূষণ সাঁতরা

দীনের কুটীর

(১)

একদিন এমন দিন ছিল, মনোহরপুর গ্রামে মন হরণ করিবার অনেক জিনিষ ছিল, ধনেজনে একেবারে মনোহর পূর্ণ থাকিত। কিন্তু আজ সেখানে দেখিবার কিছুই নাই! প্রকৃতিদেবী সেখানে শ্যামল অঞ্চল বিছাইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন বলিতে পারিনা। গ্রামখানির উপর দৃষ্টি দিলেই দেখিতে পাওয়া যায় কেবল দিগন্তবিস্তৃত মাঠ! তাহার মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু টিপিগুলি কতই দুঃখ ব্যথার করুণ স্মৃতি বুকে করিয়া মাথা তুলিয়া আছে! দেখিতে দেখিতে অতি অল্পদিনের মধ্যে গ্রামখানির এত সুখ সমৃদ্ধি কেমন করিয়া অপহৃত হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া একদল কেবল ভাগ্যের উপর দোষ দিয়া খান্ত হন আর একদল রেল কোম্পানির উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করেন।

ম্যালেরিয়ার ভিতর দিয়া বাঙ্গলার যে মরণ লীলা আরম্ভ হইয়াছে তাহার অন্ত অদূর আজ মনিষী সমাজ তাহা নির্ণয় করিতে হতভম্ব হইয়া যাইতেছেন। প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে গেলে এই ম্যালেরিয়া গ্রামখানিকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। একদিন এমন ছিল, গ্রামখানিতে বাসস্থানের ভিটা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, কিন্তু আজ শত শত বাসোপযোগী ভিটা ভগ্ন গৃহের দেওয়াল চুর্ণ লইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। সেখানে একজন ধনী গৃহস্থ ভিন্ন আর সবাই এখন নিঃস্ব। আবার সকলের চাইতে যে নিঃস্ব দিনান্তে যার মুঠা অন্নের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয় তার নাম দুলাল মাঝি। তার বাস গ্রামের এক প্রান্তে, যেখানে সুনীল অম্বর আকাশের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

(২)

" আর কেমন করে চলবে সোনার বাপ।"

দুলাল মুখের ভাতগুলা উদরস্থ করিয়া বলিল " আর কেমন করে চালাব সোনার মা, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে দুবিঘা চাষ করলাম তা বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কালের ভ্রুকুটীকে তুচ্ছ করে, দুরন্ত রোদের হাত হতে যদিও আবার বরোধান কটা রক্ষা করে এলাম, কিন্তু পাকা ধানের সময় ঝড়ে নষ্ট করে দিল।"

" আজ দুটা মুড়ির জন্য সোনা যেরূপ কাঁদছে দুদিন পরে ভাত না পেলে কি হবে?"

"কি হবে তার উত্তর কে দিবে সোনার মা? তুমি না আমি?"

এমন দেশ, যেখানে হাড় মাস কালি করেও দুমুঠা অন্নের সংস্থান করতে পারা যায়না, সেদেশ ত্যাগ করে পালিয়ে চল সোনার বাপ! অন্য কোন দেশে বাস করি গিয়ে।"

"এখান হতে সরে গেলে কি অদৃষ্টের লিখন বদলে যাবে সোনার মা"

" অদৃষ্টের লিখন নিয়েত বসে থাকলে চলবেনা, পরিশ্রম করবো খাবো। হয়ত অদৃষ্টে এমন লিখা থাকতে পারে, এদেশ ছেড়ে গেলে আমাদের সুখ আসতে পারে।"

" আমরা কি পরিশ্রম করিনি সোনার মা?"

সোনার মার রমণীহৃদয় সমবেদনায় উছলিয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠ ভার হইল। দুলাল বলিতে লাগিল,

" আবার সুখ আসবে সোনার মা, তুমি স্বপ্নে না কল্পনায় দেখতে পাচ্ছ? একদিন, আমাদের কি ছিলনা? গোলায় ধান ছিল, বাগানে তরি তরকারী ছিল, হাতে অর্থ ছিল। সেদিন ত এত পরিশ্রম করতে হত না, কিন্তু আজ একবার একমুঠা অন্ন পেটে দিয়ে এমন পরিশ্রম করেও

ছেলেটাকে দুমুঠা খাওয়াতে পারছি নে ? কাকে দোষ দিব সোণারমা ?" বলিতে বলিতে দুলালের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় সোণার মার অশ্রু আর বাঁধ মানিলনা।

একদিন যখন সময় ছিল,দুলাল দুধে ভাতে রহিয়াছে। দুমুঠা অন্নের জন্য কাহারও কাছে হাত পাতিতে হয়নি,বরং সে অনেকে অভাবে সাহায্য করিয়াছে। আজ বেশি দিনের কথা নয়, এই চার পাঁচ বৎসর আগে সে পাঁচ গ্রামকে শীতলা মার প্রসাদ খাওয়াইয়া সোণার অন্নপ্রাসন করিয়াছে। কিন্তু আজ গ্রামের মধ্যে নিঃস্ব সে; দুদিন পরে দুমুটা অন্নের জন্য হয়ত তাহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে ইহার জন্য দায়ী কে তাহা কে বলিবে ?

(৩)

মনোহর পুরের উপীন চক্কোত্তির পুত্র সুরেশ চকোত্তি পাঁচ গ্রামের মাঝে বড়লোক, কিন্তু বিজানি কেন সকলের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অবস্থার হ্রাস হইয়াছে ! এখনও যেরূপ অবস্থা আছে তাহাতে তাহাকে অবস্থাবান বলিতেই হইবে। সুরেশের স্ত্রী মনোরমা সন্তোষপুরের জমিদার মহেশ বাপুলির কন্যা। বাপুলিমহাশয়ের অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল,— সুরেশের মত পাঁচ জনকে কিনিয়া রাখিতে পারেন। বাল্যকাল হইতে মনোরমা বিলাসের ক্রোড়ে পালিত হইয়া,অথবা দু"একখানা ইংরাজী বই পড়িয়া অত্যধিক বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। সুরেশের অবস্থার অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু মনোরমার বিলাসিতা এক বিন্দুও কমে নাই।

সুরেশ অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়াও জীবনে দাম্পত্য সুখ এতটুকু

উপভোগ করিতে পারে নাই, মনোরমা অত্যধিক মাত্রায় বিলাসী ও প্রচণ্ড মুখরা বলিয়া। মনোরমা যাহা বলিয়াছে সুরেশ তাহা আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহারি মাঝে এতটুকু ত্রুটী বাহির করিয়া, এক একদিন মনোরমা এক একটা বিরাট কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছে। এমনি করিয়া তাহার জীবন দাম্পত্যপ্রণয়ের বৃথা প্রয়াস করিয়া দিনদিন আরও শোচনীয় ও দুঃখময় হইয়া পড়িতেছিল।

* * * *

সুরেশ ঘুম হইতে উঠিয়া বিকালে যখন মোকদ্দমার কাজ শেষ করিয়া জেলা হইতে আনীত দ্রব্যের বেগটা খুলিয়া এক একটা জিনিষ সাজাইয়া রাখিতেছিল, তখন মনোরমা দেখিল তাহার বার বার বলা সত্বেও সুগন্ধি তৈলশিশি আসে নাই।

মনোরমা কোথা হইতে আসিয়া স্বামীকে শুনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল "এমনি যাহোক পোড়া কপাল জুটেছে আমার—"

"আবার কি হল মনোরমা!" বলিয়া সুরেশ হাঁ করিয়া মনোরমার রাঙ্গা মুখটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

"এম্নি একচোখো ভগবান যাহোক। তাও বলি আবার বাপমারও এমনি বিচার, যে করে হৌক একটা অযোগ্যি বোকা হতভম্বের হাতে দিয়ে তাঁদের গোলায় জল চলল, আমি যেন কত বুড়ো হয়ে ছিলাম, দেয়েই তার পর রক্ষা।"

"কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলনা, অমন করে আসল কথা চেপে রাখবার বা দরকার কি? সামান্য একটুকরা কথা নিয়ে তুমি কিন্তু বড় ঝগড়া কর।

"হাঁ আমি বা আসল কথা চেপে রাখি, আর দিনরাত কেবল ঝগড়া করি, কারো একটু সস্থি দেইনা" ঝড়ের মত কথাগুলা বলিয়া

দিয়া মনোরমা রাগে গর গর করিতে লাগিল।

"ও রকম গায়ে পড়ে ঝগড়া কোরনা বলে দিচ্ছি" বলিয়া সুরেশ অতি ক্ষিপ্রভাবে জিনিষগুলা ছড়াইতে লাগিল।

তারপর, তার পর বর্দ্ধিত হইয়া ঝগড়া বিরাট আকার ধারণ করিল এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া সুরেশের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

(৪)

এরি মাঝে বোধ করি যুগযুগান্তর-সদৃশ দীর্ঘ কয়েকটী মাস অতীত হইয়াছে। বাঙ্গলার দুঃখের কষ্টের অভাবের মাস। বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া নিষ্পেষনের কাঁদিবার মাস অগ্রহায়ণ মাস আসিয়া তাহার স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। দুলাল যাহা উপায় করিত তাহার দ্বারা যেকোন প্রকারে চলিয়া যাইত। সে যতদূর কষ্টের কথা ভাবিয়া হতাস হইয়া পড়িত কিন্তু সোনার মারগৃহিনীপনায় তাহাকে ততদুর কষ্ট পাইতে হইত না। তাই তার বাইর ঘরে কলহ বিবাদের ঘটা হইবে কি কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তি সর্ব্বদা তাহার গৃহে বিরাজমান থাকিত। যদিও সে বৎসর দুলালের বাড়ীতে ম্যালেরিয়া ঢুকেনি কিন্তু সোনার মার শরীর দিন দিন কেন যে শুকাইয়া আসিতে লাগিল তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে দুলালকে বলিত" শরীরের উপর মনুষের কি হাত আছে সোণার বাপ"

একদিন অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য যখন মাটিতে পড়িয়া সোনার মা সজ্ঞাশূন্য হইল, তখন সোণা মামাবলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উঠানে দুলাল কাজ করিতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া চোখে মুখে জল দিয়া তাহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিবার জন্য বাতাস দিতে আরম্ভ করিল! কিছুক্ষ পরে সোনার মা চক্ষু মেলিল। বলিল কেও সোনার বাপ, সোনাকে দেখো

আমিতে—" বলিয়া সোনাকে ধরিয়া বুকের উপর জড়াইয়া রাখিল। সোনা কাঁদিতেছিল, মার বুকে গিয়া স্থির হইয়া নির্জ্জিবের মত পড়িয়া রহিল।

দুলাল কিছু বলিতে পারিলনা, কেবল তাহার অন্তরাত্মা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এমনি দুর্ভিক্ষের সময় যখন ভাত কাপড়ের সংস্থান করিতেও অসমর্থ, তখন কেমন করিয়া ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ কিনে তাহাকে বাঁচাইবে। অনাথ-নাথ ভগবানের চরণে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল — "হরি অসহায়ের বন্ধু, তুমি না রক্ষা করিলে কে করিবে নাথ"

যখন ভগবান তাহার ডাক শুনিলেন না, সোণার মা ক্রমে ক্রমে মরনের দিকে অগ্রসর হইল তখন সে মাহেশপুরের ছিনাথ ডাক্তারের কাছে গেল,— মাত্র সম্বল আধুলিটী লইয়া। ছিনাথ কেমন ডাক্তার জানিনা, তবে তিনি কোন গুরুর নিকট অধ্যয়ন না করিলেও হোমিও শাস্ত্রে তাঁহার এত অগাধ জ্ঞান হইয়াছে যে, সিমটম মিলাইয়া এক ডোজ দিলে ভাল হইতেই হইবে, এবং নানাস্থানে অনেক সিরিয়াস কেসে এম, বি, ডাক্তারেরা ছাড়িয়া গেলে সে বহুদর্শীতা দ্বারা ভাল করিয়াছে বলিয়া কেবল তাহার নিজের মুখে উপন্যাসের চেয়েও বেশী ঘটনাবৈচিত্রে শুনা যায়।

ছিনাথ ডাক্তার পৌছিয়াই রোগী পরীক্ষা করিতে না করিতে ঔষধ আন্ জল আন্ ইত্যাদি প্রকারে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু, সোনার মার সূক্ষ্ম আত্মা, তাহার সমস্ত কষ্ট ব্যর্থ করিয়া কোন অসীমের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে।

দুলাল যখন "কোথায় গেলিরে সোণার মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন ছিনাথ ডাক্তারও সেই সঙ্গে সঙ্গে "হার্টফেল" "হার্টফেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া এবং ঔষধের বাক্সটী নিজের বগলের নীচে পুরিয়া; আধুলিটী লইয়াছে না ভুল করিয়াছে বলিয়া জীর্ণ পিরানের বহুকষ্টে রক্ষিত পকেটটী অনুসন্ধান করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া বাঁচিল।

সোণার মা কেন মরিল, ছিনাথ ডাক্তার কি জানিবে, তার স্বামীপুত্র পর্য্যন্ত তার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। তাহার পতি-পুত্র কি খাইয়া বাঁচিবে তাহা ভাবিয়াই সে আকুল হইয়াছিল। অনাহারে অনাহারে দুদমনীয় ক্ষুধায় তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে কিন্তু একমুঠা অন্ন দিনান্তেও খাইতে পারে নাই— না জানি পতিপুত্র অনাহারে কষ্টপাইবে বলিয়া। তাহার নিঃস্বার্থ পত্নীপ্রেম অগাধ পুত্রস্নেহ, শাকডাঁটা সিদ্ধ, ভাতের জল ও ফেন আধপেটা করিয়া খাওয়াইয়া তাহাকে বিমল সুখশান্তি প্রদান করিয়াছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট করিতেছে, দুটা ভাত হইলে যে, সে রক্ষা পাইতে পারিত, তাহা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই না জানি পতিপুত্রের আহারের ব্যাঘাত হয়! এমন কত সাধ্বী রমণীর পুণ্য চিতাভস্মে অভাবক্লিষ্ট বাঙলার শ্মশানায়মান পল্লীশ্মশান স্বর্গে পরিনত হইতেছে তাহা কেহ দেখিয়াছেন কি? কিন্তু গ্রাম নগরে যেখানে বিলাতী শিক্ষা-সভ্যতার আলোক আসিয়াছে সেখানে নয়। কে বলে অতীতের নীরবে গৌরব, মহিমা সকলই কাল জলধিজলে ডুবিয়া গিয়াছে?

(৫)

এখন সুরেশের আর সে অবস্থা নাই। পর পর দুর্ভিক্ষে তাহার অবস্থা যতটানা হ্রাস হইয়াছিল, ততোধিক তাহার পত্নীর বিলাস-ব্যয়ে। তবুও

সুরেশ জীবনে সুখী হইতে পারে নাই। সুরেশ যে দুপয়সা উপায় করিয়া কত সুখের আশায় ঘরে আসে কিন্তু মনোরমার জন্য সে একটীদিনের জন্য সুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই।

পত্নীর মুখে একটু হাসিরেখা দেখিয়া, আবার সুখের দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত হইল ভাবিয়া সুরেশ আকুল ও দিশেহারা হইয়াছে, কিন্তু আবার পত্নীর কলহে তাহা মরুভূমিবক্ষে এক ফোঁটা জলের ন্যায় শুকাইয়া গিয়াছে। পত্নীর একটু আদর দেখিলে, পূর্ব্ব স্মৃতি সমস্ত ভুলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই।

একদিন নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া সুরেশ যখন মনোরমাকে বলিল "তোমার জালায় আর ঘরে টেকা দায়, কোথায় পালিয়ে না গেলে আর শান্তি নাই।"

মনোরমা তেমনি উত্তেজিতভাবে জবাব দিল, তুমি যদি পালাবে, আমায় জ্বালাবে কে? হায় আমার এমন সৌভাগ্যও হবে।

* * * *

সুরেশ নিরুদ্দেশ। পত্নীকে সে ডাকে লিখিয়াছে,— তোমার চক্ষুশূল হয়ে আর আমি থাকতে চাইনে, আমায় ত্যাগ করতে পারলে তুমি সুখী হবে জেনেই আজ চললাম। ঘরবাড়ী তোমার সব রইলো দেখে নিয়ো। এজীবনে আর দেখা হবে কিনা জানিনে"—সুরেশ।

চয়ন

স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

* * স্ত্রীশিক্ষায় যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বিকৃত শিক্ষার ফল সুফল হইতে পারিবেনা। নারীকে পত্নী মাতা থাকিতে দিয়া তাঁহার যত কিছু উচ্চশিক্ষার (তাই এডুকেশন) বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাকে আমি উচ্চ শিক্ষা বলিব না। অনেক আধুনিক শিক্ষিত অর্থাৎ পাশকরা ছেলে মেয়ে দেখিয়াছি, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এই শিক্ষা পাইয়াও এত সঙ্কীর্ণ থাকিয়া গিয়াছে যে পাশ-না-করা অনেকে তার চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ শিক্ষিত বলিয়াই মনে করি। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ হয়না ঠিক উচ্চ শিক্ষা নয়। পাশকরান বিদ্যা মাত্র। পুরুষোচিত স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হউক * * । শিক্ষিতা স্ত্রী, স্বামীকে সুখী করিবেন, সন্তানকে সুপালন করিবেন ও সুশিক্ষা দিবেন— তা না হইলে স্ত্রীশিক্ষার কোন উপকারিতাই রহিল না। * * পুরুষের সহিত সমকক্ষতা করাই কি অতঃপর স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল ?

* * যদি চেষ্টা করিতে হয়, তবে চেষ্টা মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব, সেইটার জন্যই করা উচিৎ। যা করিলে স্বাস্থ্যহীন ধ্বংসোন্মুখ জাতির ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারে, ধর্ম্মোন্নতি ঘটিয়া মনুষ্যত্ব লাভের সহায়ক হয়, সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তন জন্য সমবেত চেষ্টা

ও যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। মানুষ এখনও পরানুকরণের দ্বারা স্বাধীন হইতে পারেনা। ভিন্নজাতির ভিন্ন সমাজের অনুকরণে সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াই সম্ভব।

* * হুকুম দিয়া বাহিরের স্বাধীনতাই লোপ করা যায়, অন্তরের স্বাধীন বৃত্তিগুলির উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তা যদি পারিত তাহাহইলে প্রাচীন ভারতে বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং এই সেদিন মাত্র যে বিপ্লবময় যুগের অবসান হইল, সেই সকল যুগেই প্রথিতনাম্নী শৌর্য্যবীর্য্য শালিনী মহিমাময়ী মহিলাগণের অভ্যুদয় হইতে পারিত না। মেয়েদের স্বাতন্ত্র বর্জ্জিত হইতে নিষেধ করিয়া শাস্ত্র তাঁহাদের স্বাধীনতার পথে যে কাঁটা পুঁতিয়া দিয়াছেন, এমনও প্রমাণ পাইনা।

* * মেয়েরা শিক্ষিত হউন,— পারেনত পুরুষের চেয়ে অধিকতরই উচ্চশিক্ষিতা হইতে চেষ্টা করুন, সেত খুব সুখের কথা। কিন্তু তাঁর পুরুষ হইয়া কাজ নাই, সংসারের কর্ত্তার তিনি সহকর্ম্মিনী না হইয়া সহধর্ম্মিনীই থাকুন। ছেলেদের গর্ভধারিনী মাত্র না হইয়া মা হোন। আর ইহাতেই সংসারের শান্তি নির্ভর করিতেছে। * * যে সমাজ যত উন্নতিলাভ করে সূক্ষ্ম ভবিষ্য দৃষ্টি তাহার ততটাই বৃদ্ধি পায়। তাই ভারতবর্ষীয় সমাজসংস্কারক তাঁর দূরদর্শন শক্তির দূরবিক্ষণ সাহায্যে অনেকখানি বিবেচনার সঙ্গেই নরনারীর কার্য্যক্ষেত্রকে এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সকলদেশেই উন্নতির সহিত সমাজবন্ধনের দৃঢ়তা একান্তভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। যেজাতি যতটা বেশী উন্নতিলাভ করিয়াছিল তারই সমাজে তত বেশী আঁটাআঁটি দেখিতে পাওয়া যায়। * * পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া এ চাকরী সমস্যার দিনে চাকরীর চেষ্টায় না ফিরিয়া যে জিনিষটা এদেশে প্রধান আবশ্যক * সেই কুটীর শিল্পের দিকে তাঁহারা মনযোগী হইলেই ত পারেন? পূর্ব্বোক্ত ভদ্র ঘরের মেয়েরা খুব মিহি সূতা তৈরি করিত।

* * ইচ্ছা করিলেই অনেক মেয়ে শুধু সখের জন্য নয়, প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেও এইকার্য্য ও ঐইরূপ অনেক কার্য্যই ঘরে বসিয়া বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। ইহাতে আত্মীয়ের বা কালেকটর সাহেবের বা বড়বাবুর ছোটবাবুর কাহারই অধীনে থাকিবার প্রয়োজন ঘটিবেনা, অথচ হাতেও দুপয়সা আসিবে, দেশেরও মঙ্গল।

* * আর এদিকে সবারই শক্তিও সমান থাকেনা, —প্রবৃত্তিও থাকেই না। * * কাটা কাপড়ের বোতাম তৈরির, মোজা গেঞ্জি; জুতার ফিতা, মাথার ফিতা বুনিবার কলের দাম খুব বেশী নয়। সেই সব কল আনাইয়া তাহার সাহায্যে এদেশে শিল্প বৃদ্ধির চেষ্টা এবং নিজেদেরও অভাব মোচন হইতে পারেনা কি? * * লেডিডাক্তার এখনও সর্ব্বত্র সুলভ নহে, অথচ ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কতই অধিক। বালিকা বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপাল টিচার প্রভৃতিরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল ও আছে।

* * বিচার সমষ্টি ধরিয়াই করিতে হয়! পতীর পত্নী এবং সন্তানের মাতা যখন তাঁহার হওয়া অনিবার্য্য তখন গৃহিনী ও জননীর কর্ত্তব্য না শিখিয়া তাঁহার উপায় কি? ওই দুটী পদের কর্ত্তব্য কি এতই সামান্য যে সে সম্বন্ধে কিছু না শিখিলেও উহার সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায়? তবে সংসারে এত অশান্তি কেন? * * সন্তান বাল্যাবধি ধর্ম্মশিক্ষার ও নীতিশিক্ষার অভাবে কুসন্তানে পরিনত হয় কেন? পত্নী এবং মাতা যদি অশিক্ষিতার পরিবর্ত্তে অকলা বিদ্যায় শিক্ষিতা হইলেন তাহাতেই বা তাঁহার পতিপুত্র কতখানি লাভবান হইবেন? তাই বলি মেয়ে বিদুষী হউন, কিন্তু তাঁরা মেয়ে থাকুন, তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই— এইটুকুমাত্র তাঁদের কাছে অনুরোধ।

* * এদেশে শিশুমৃত্যুর হার বড় বেশী বলিয়াই জানা যাইতেছে।

তাহার ফলে জাতির ধ্বংশ অনিবার্য্য, যাহাতে জননীগণ সুস্থ ও সবল শিশু পালনে অভিজ্ঞ হইয়া এদেশের এই শোচনীয় মহামারী নিবারণের চেষ্টায় প্রাণোৎসর্গ করিতে পারেন, সেই চিন্তা ও ত্যাগের জন্য যত্নবতী হউন। * উন্নতি কই? নারী যে সকল অধিকার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন, তাহারই মর্য্যাদা কি পূর্ণমাত্রায় রাখিয়াছেন যে অধিকতর দাবী করিবেন।
* জ্ঞানপিপাসা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই গৃহের কল্যাণ। * সেই শিক্ষাটা আগাগোড়া পুরুষোচিত না হইয়া মেয়েদের জীবন যাত্রার উপযোগী ভাবে কতটা বিহিত হয় এইটুকু আমরা চাই ও উচিত বলিয়া মনে করি *

* * যদি সত্যই নারী হইতে চাহেন তবে নারীর কর্ত্তব্য শিক্ষা গ্রহণ করুন, নারীর ব্রত ধর্ম্ম পালন করুন, নারীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন, নারীর ত্যাগ সংযম নিষ্কাম সাধনা ও আত্মবিস্মৃত প্রেমকেই লোকে দেবীত্ব দান করিয়া থাকে, তার রক্তমাংশের শরীরকে নহে।

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩০ শ্রীঅনুরূপা দেবী

আবহাওয়া

আগষ্টমাসে এলাহাবাদে "হিন্দু মহাসভা বসিবে যাহাতে হিন্দুগণ এক সূত্রে বদ্ধ হন তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। (অমৃত বাজার)

বৃটিস (ইমপিরিয়াল একজিবিসনে) সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে প্রিন্স অফ ওয়েলস সভাপতি হইবেন স্বীকার করিয়াছেন। ঐ

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য সভায় সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ভারতে প্রতিনিধি ও আলওয়ারের মহারাজা ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

শুদ্ধি আন্দোলনে মুসলমান যেমন হিন্দু হইতেছেন, অন্তদিকে ইসলাম প্রচার দ্বারা হিন্দু মুসলমান হইতেছেন। এরি মধ্যে ভূপাল রাজ্যে ৫০০ হিন্দু মুসলমান হইয়াছেন। হিন্দু মুসলমানে অসবর্ণবিবাহও চলিতেছে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পণপ্রথা নিবারণ জন্ম ১টী সমিতি গঠন করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তকরণে তাহার উন্নতি কামনা করি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আলবার্ট হলে কয়েকটী বক্তৃতায় বাঙ্গালীকে বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিবেন। বসুমতী

বৈষ্ণব সাহিত্যে রসজ্ঞ শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে বৈষ্ণব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঐ

আগামী শীতে ইডেন গার্ডেনে যে প্রদর্শনী খোলা হইবে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ১০ জন। তাহার মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড় একজন। বিশ্ববিশ্রুত ধনী রকফেলার ধনে হেনিরি ফোর্ডের দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। অমৃত বাজার

মাননীয়া অবলা বসু নারীশিক্ষা সমিতির জন্ম অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন শুনা যায় তিনি বিদ্যাসাগরের বাড়িটী কিনিবেন। হিতবাদী

নাভারাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে বলিয়া শিখমহলে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। তিনি এখন দেরাদুনে বাস করিতেছেন। ঐ

শোভনা

ভাদ্র

প্রথম বর্ষ) (দশম সংখ্যা

নশ্বরতা

কাননে হাসিয়া ফুল কাননে ঝরিয়া যায়।
স্বার্থপর মানবের লোচন খোঁজেনা তায়॥
চাঁদের মধুর রশ্মি ডাকি আনে কল্পনায়।
পড়িলে মেঘের কোপে সবে করে হায় হায়॥
যৌবনের সুখস্মৃতি মনে আসে নিতিনিতি।
বয়সের অবসানে শোকে তাপে পরিণতি॥
মানব দুদিন তরে কত হাসে কত গায়।
সকলি ক্ষণিক দেখা নিত্য কভু কিছু নয়॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া বি, এ,

জন্মাষ্টমী

অয়ি পুণ্য জন্মাষ্টমী,
করযোড়ে তোমা নমি,
কলুষ আঁধার যবে বসুধা করিল গ্রাস,
ধর্ম্ম-বিধু আনি দিলে, উঠিল বিমল ভাস।
ধন্য পুণ্য জন্মাষ্টমী,
করযোড়ে তোমা নমি,
বিশ্ব-প্রেম জাগাইতে বাঁশী এনেছিলে ভবে,
কালিন্দী উজানে বয় সে বাঁশীর গীত রবে।
অয়ি ব্রহ্ম তেজঃময়ী,
করযোড়ে তোমা নমি।
দুর্নীতির পদভরে ধরা যবে টলমল,
ব্রহ্ম সত্ত্ব তেজঃ আনি হরিলে তাহার বল।
আর্ত্তের শরণ তুমি,
করযোড়ে তোমা নমি,
অনাথ রোদনে যবে বসুন্ধরা অশ্রুপ্লুত,
সান্ত্বনা-নিলয়ে আনি মুছাইয়া দিলে দ্রুত।
আর্ত্ত-জন-ত্রাণ ভূমি,
করযোড়ে তোমা নমি,
ব্রহ্ম-নিষ্ঠ-নিরাশ্রয়— কাতর-রোদন-রবে,
তাহার শরণ লাগি, কল্পতরু দিলে ভবে।
অয়ি ব্রহ্ম তেজঃ ময়ী,
করযোড়ে তোমা নমি,

বদ্ধের আলয়ে মুক্তি তুমিই আনিয়া দিলে,
অনন্তকে শান্ত করে ভবধামে দেখাইলে।
এস কাল চক্র ভ্রমি,
কর যোড়ে তোমা নমি,
একবার এনেছিলে নিখিল জগৎ সার
আরকি আনিবেনা গো? নমি তাই বার বার।
অয়ি পুণ্য জন্মাষ্টমী
কর যোড়ে তোমা নমি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।

মরণের দিক

চতুর্দ্দিক দিয়ে আমাদের মৃত্যুর যে তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে রোধ করবে কে? দেশের এমন দুর্দ্দিন পড়েছে, জাতি এমন নীচে নেমে এসেছে, আমাদের ধ্বংশের আর কতদিন বাকি তা পণ্ডিতগণ অঙ্কপাত করে বলে দিতে পারেন। এমন কোন জাতির হয়েছে বলে শুনিনা বা হতে পারে বলেও বিশ্বাস হয়না। মনীষিসমাজ-কে আর নীরব থাকলে চলবে না। চিন্তা গবেষণা ও অনুসন্ধান করে জাতির বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিতে হবে। কোন পথে, জাতি মুক্তি পাবে সমাজের দুষ্টব্রণ সেরে উঠবে, দেশ "যশঃ অর্থ-মান" ফিরিয়ে পাবে, তা

নির্দ্দেশ করে দিতে হবে। আবার আম্র-কাঁঠাল-বংশ বৃক্ষ শোভিত শ্যামায়মান গ্রাম নগরী ধনে ধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। আবার অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষ ছায়াতলে, রাখাল বালকগণ আনন্দ সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। বুভুক্ষু, ম্যালেরিয়া মহামারীর তিল তিল করে উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। বাঙ্গলার স্বাস্থ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আবার দেবস্থানে সাধু মহাত্মাগণের বেদপাঠে ধ্যানধারণায় দেবতাগণ পুনরায় ফিরে আসবেন আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিতে। আবার প্রত্যেক গ্রামের ছাউনি তলায় ধর্ম্মালোচনায় বৈঠক বসে সান্ধ্য গগন মুখরিত হয়ে উঠবে, আবার খোল মৃদঙ্গের তালে তালে বৈষ্ণবসঙ্গীতে পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত হবে — পল্লী প্রাণে প্রাণে আবার উদার ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হবে— ধর্ম্মের সমস্ত গ্লানি, কালিমা ও ভণ্ডামী মুছে যাবে! আবার এই আম কাঁঠাল বনে শত শত মন্দির মাথা তুলে দাঁড়াবে, শত শত পুকুর প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হবে।

নৈতিক দিক দিয়ে আমাদের যে মরণ হয়েছে তাকে সঞ্জীবিত করতে বিশ্বামিত্রের মত ঋষি চাই, বিদ্যাসাগরের মত শিক্ষাগুরু চাই! যে বলে "আমরা পূর্ব্বকাল হতে অনেক সুখশান্তিতে আছি" সে হয় চাটুকার নয় ভুল বুঝেছে। বাইরের যুদ্ধ বিগ্রহগুলো কমেছে বলে আমরা সুখে থাকিনি, এবং স্বীকার করিনা যে সব যুদ্ধ বিগ্রহগুলো কমেছে আজ আমাদের ভিতরে যে যুদ্ধ সুরু হয়েছে, তা বাইরের শত শত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের চাইতে ভীরাত্মক বা ভীষণতায় কোন অংশে কম নয়। আজ নীতির বিরুদ্ধে, রিপুগণের যে বিজয়ঘোষণা তা কোন অংশে বিজাতীয়গণের স্বাধীনতা হরণের চাইতে কম নয়। হিন্দুরাজ্যের দু'এক খানা ইতিহাস থাকলেও মনগড়া বলে তার সত্যাসত্যের প্রতি তেমন বিশ্বাস নাও হতে পারে কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং

এর লিখিত বিবরণ হতে জানতে পারি, তখন আমাদের ধর্ম্মে, এমনি সুমতি ছিল, শাস্ত্রে এমন প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, নীচকর্ম্মে এমন অত্যধিক ঘৃণা ছিল, তালাচাবির জন্য আমাদিগকে একটী পয়সাও ব্যয় করিতে হোত না। আজ লৌহ সিন্ধুক ভগ্নের দিনে সেদিনের কথা স্বপ্নের মত বোধ হলেও তা অবিশ্বাস্য নয়। সেদিনের শাস্ত্র, সেদিনের নীতি ধর্ম্ম আজ আমরা ব্রাহ্মণ চাউল করায় চাবিয়ে রাখছি, আর আমরা অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণেতর) ইহাকে ব্রাহ্মণগণের স্বার্থের জন্য একটা ফন্দী বলে ঘৃণায় অবজ্ঞায় দূরে নিক্ষেপ করছি। এর জন্য অন্য কিছু বেশী দায়ী হক না হক বিদেশী শিক্ষা সভ্যতার অনুকরণ-মোহটাই বেশী দায়ী। আজ দেশী পরদেশী রমণীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার, নিরীহ পথিকগণের উপর গুণ্ডাগণের অমানুষিক দৌরাত্ম্য, জাল জুয়াচুরির শত শত মামলা, গ্রামে গ্রামে এমনকি গৃহে গৃহেও পর্য্যন্ত দলাদলি-—ইত্যাদি অফুরন্ত দৈনন্দিন ঘটনাবলী আমাদের নৈতিক পথে হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

"আমাদের ধর্ম্ম বড়" "এমন ধর্ম্ম কোন দেশে নাই" "এ ধর্ম্মের কখনও লোপ হবেনা" ইত্যাদি অহমিকাপূর্ণ গর্বে যে আমরা বিভোর হই তা সংস্থানে অন্তরা কতদূর অন্তঃসার? কোন ধর্ম্মের চাইতে হিন্দু ধর্ম্ম যে খাট নয় বা তাহার দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার একটা গুণ নাই, একথা আমরা আদৌ স্বীকার করিনা। তা হলেও ধর্ম্মের পীঠস্থানে যে সকল বীভৎস লীলা আরম্ভ হয়েছে তাতে আদৌ মনে হয় না আমরা ধর্ম্মের দিক দিয়ে জীবিত। কালিঘাটের মহাত্মাজী যে কাণ্ড করে বসেছেন তা বোধ হয় কারো অজ্ঞাত থাকতে পারে না। এরূপও কেবল দু এক স্থানে ঘটেনি, প্রায় সর্ব্বত্রই এমন কাণ্ডের অভিনয় হচ্ছে! সমাজ তা দেখেও দেখছেনা, বরং কেউ কেউ তার

প্রশ্রয় দিচ্ছেন, অর্থের বিনিময়ে। আজ প্রায় সকল তীর্থস্থান দেবস্থান গুণ্ডার এক একটী ছোট বড় কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম্মের ভিতরে এমন জুয়াচুরি, ভণ্ডামী যে কেউ দেখছেন না এমন নয়, তার প্রতিকারের কেউ চেষ্টা করছেন না। অনেকে যৌবনে কুৎসাময় দৌরাত্ম অত্যাচার করে প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যে টিটা ফোঁটা কেটে বা কাঠের মালা ঘুরিয়ে "বক ধার্ম্মিক"বৎ সমাজের মাঝে যে অমঙ্গল, উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাঝে যে গ্লানি এনে দিচ্ছেন তা সুধিসমাজের দৃষ্টির বাইরে পড়বে না। নিস্বার্থ দেবপূজার মাঝে মানুষের স্বার্থ ঢুকলে দেবতা স্থায়ী হতে পারেন না। একদিন, একটু একটু করে মানুষের স্বার্থ, দেবতার সবটুকু পূজা অর্চ্চনা দখল করে বসবে; তখন দেবতাকে আপনা হতে পলাতে হবে। যে পবিত্র দেবস্থানে নিস্বার্থ ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী মহাত্মগণ সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে দেব চর্চ্চনে নিরত থাকতেন, আজ সেখানে লম্পট বাকপটু চরিত্রহীন কাপুরুষগণ গৃহস্থাশ্রম নির্ম্মান করে বংশপরম্পরায় দখল করছেন। এসব কাণ্ড দিন দিন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে কিন্তু আমরা দেখেও দেখছি না।

বিদেশী সাজ সজ্জায়, বিদেশী আচার ব্যবহারে আজ আমাদের স্বাস্থ্যের নদীতে যে ভাঁটা আরম্ভ হয়েছে তা রোধ করবার কি আমরা কোন চেষ্টা করছি। বরং তাতে মুগ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ ভুলতে যাচ্ছি। একদিন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ধর্ম্মে কর্ম্মে এমি মতিবান ছিলেন, লোকসেবায় এমি মুক্তহস্ত ছিলেন, গ্রামে গ্রামে পুকুর প্রতিষ্ঠা হত পানীয় জলের জন্য কোন কষ্ট পেতে হোত না। কিন্তু আজ পানীয় জলের জন্য যে এতগুলা লোক মরছে, তাতে কি ধনীগণের বা জমিদারগণের ঘুম ভাঙ্গছে! তাঁরা বরং প্রজার নিকট হতে অলোকার যে অর্থ শোষণ করছেন তা দিয়ে নিজেদের সুখ সচ্ছন্দের জন্য সহরের

মাঝখানে ব্যয় বহুল দোতল বাড়ী তৈরি হচ্ছে; নয়ত মোকর্দ্দমা জিতে নাম নিবার জন্য জলের মত ব্যয় হচ্ছে। রেল কোম্পানির দৌলতে দেশে অত্যধিক জল জমে অভাগা গ্রামবাসীকে যে পচে পচে মরতে হচ্ছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। যা কখনও পূর্ব্বে শোনেননি এম্নি সব নূতন নূতন রোগ আমদানী হচ্ছে বিলেতি সাজ-সজ্জা ও বিলেতি আহারের মধ্য দিয়ে। আজ শত শত মশক বাহিনী ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে ফেরী দিচ্ছে। তার কোন উপায় না করে চড়চাপড়ে দু একটার রক্তপাত করে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আমাদের রক্ত যে তারা দিবারাত্র চুষে খাচ্ছে তার দিকে ভুলেও ভ্রুক্ষেপ করিনি। এম্নি করে আমরা দিন দিন কঙ্কালসার হয়ে পড়ছি। এইরূপে আমরা দেহের বদলে দুখানা হাড় লয়ে সমাজে যে প্রেতের মত ভ্রমণ করছি, কোন সভ্য জাতি তা দেখে আমা-দিগকে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে জীবিত বলতে সাহসী হবে কি? বা আমাদের গর্ব্ব করার কি আছে?

আমাদের কর্ম্মময় জীবনে যে ঘুন ধরেছে, আমরা তা তাড়াতে না পারি অপরে তা দেখে হাসছে। আমরা দুটা পাশ করেছি, চারটে পাশ করেছি বলে বিদ্যার দৌড় দেখাই বটে কিন্তু কর্ম্মজীবনে বা অর্থ সংগ্রহে তা আমাদের কতদূর সাহায্যকারী? সকলেই ছুটেছেন আজ কেরাণীগিরি করতে। আমাদের স্বাধীন জীবিকা ব্যবসা বাণিজ্য নাই বললেও চলে। ব্যবসায়ী ইউরোপীয়দিগের কথা ছেড়ে দিন, বাঙ্গলার ব্যবসাদার বাঙ্গালী নয় অন্য জন। বড় বড় ব্যবসার বিরাট আড়ত হতে আরম্ভ করে পানবিড়ি দোকানটীর পর্য্যন্ত হস্তগত থেকে বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করেছে মাড়োয়ারী, ভাটীয়া হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী প্রভৃতি। এত দেখে শুনে এত বুঝেও আমরা কিন্তু তাদের দোকানের কেরাণীর কাজে ঢুকি ও দিবারাত্র তাদের নিষ্পেষণ সহ্য করি, কোনদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহস করিনি—

আমরা ব্যবসাদার হব, ছোট হক বড় হক এক একখানা দোকান চালাব, বিদেশী ব্যবসাদারগণকে বাঙ্গলা থেকে খেদিয়ে দিব। বলতে লজ্জা হয়, কেরাণীগিরি করে আমাদের সাহস এম্নি বেড়েছে মধ্যপ্রদেশে বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে একটা কেরাণী চাই শুনলে দলবেঁধে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি আবার কেউকেউবা চলেও যাচ্ছি। ধনোপার্জ্জনের লোভে জন্মভূমির কোমল অঙ্ক পরিত্যাগ করে আমরা প্রবাসী হচ্ছি বটে, কিন্তু আমরা কি প্রকৃত অর্থের সন্ধান করতে পারছি ? আমরা কেরাণী গিরি করে বিদেশ হতে যত অর্থ আনছি তার চতুর্গুন বিদেশীরা, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে লয়ে পালাচ্ছে। একদিন আমাদের পরিশ্রমে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের পূণ্য আশীর্ব্বাদে প্রত্যেক বাড়ীতে ছেলে মেয়ে হতে সবাই পবিত্র খদ্দরে ভূষিত হতেন। একদিন আমাদেরি চেষ্টায় সোণার গ্রামের সূক্ষ্ম বস্ত্র, কেবল ভারতে নয় সারা জগতের শ্রেষ্ঠ আসন টেনে নিয়েছিল। বলতে কি, কর্ম্মে আমরা এমনি নীচের ধাপে নেমে এসেছি, ভাত কাপড়ের সংস্থান করতে, এ সোণার বাঙ্গলায় আমরা পেরে উঠছি না — যে দেশ থেকে বিদেশীরা ভারে ভারে রত্ন লুটে নিচ্চে।

* * * *

এম্নি করে যে জাতি, কর্ম্মে কেরাণীগিরিতে সন্তুষ্ট, ধর্ম্মে নিয়ত ব্যাভিচার অত্যাচারে ব্যাপৃত, স্বাস্থ্যে কঙ্কালসার হইয়া জীবন্মৃত, মনে বিদেশীর অধীনে থেকে আপ্যায়িত, অর্থে নিয়ত দুর্ভিক্ষ-পীড়নে নিষ্পেষিত, সে জাতি মরণের পথে নয় এ বললে হয় ভুলকরা হয় নয় নিজেদের জাতির সম্বন্ধে গর্ব্ব করা হয়।

বাঙ্গলার পল্লী।

"বন্দেমাতরম্

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্

ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মাতৃভক্তের চক্ষে বাঙ্গলার এই মাতৃমূর্ত্তি—

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!

গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!

অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধুলি

ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গৃহগুলি,

পল্লব ঘন আম্র কানন, রাখালের খেলা গেহ

স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ!

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।"

ভাবুক কবির চক্ষে জননী বঙ্গভূমির এই মূর্ত্তি প্রতিভাত। আর বাস্তবের রাজ্যে বাঙ্গলার যে মূর্ত্তি সন্তানের সম্মুখে জাগ্রত হয় তাহা 'হৃতসর্ব্বস্বা, নগ্নিকা, কঙ্কালমালিনী কালিকামূর্ত্তি।' আজ সেই শান্তির নীড়গুলি নানাপ্রকার ব্যাধির আকর! আজ পতি-পুত্রের রোগজীর্ণ দেহদর্শনে ব্যথিতা বঙ্গবধূর "অন্তরভরা মধু" শূন্য-প্রায়। আজ মশকের "ঐকতান বাদনের" মধ্যে ও জলাভাবে ক্লিষ্ট মরুভূমি-সম তৃষ্ণার্ত্ত গ্রামগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া কোন প্রাণে বলিতে পারি—— "সুজলা সুফলা মাতাকে বন্দনা কর"

আমাদের অবস্থা কেন এমন হইল তাহা ভাবিয়া

-ছি কি? কেন সোনার বাংলা শ্মশান বাংলা হইতে চলিয়াছে তাহা কি আমাদের চিন্তাকে এখনও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে নাই? গত ১৯২১ সালের লোকগণনার ফলাফল অবগত হইয়া নিদ্রার ঘোরেও শিহরিয়া উঠিনা, ইহা কি আমাদের জড়তার চূড়ান্ত নমুণ নহে?

বাঙ্গলার পল্লী কৃষকের বাসভূমি। সেখানে শিক্ষার বিস্তার যৎসামান্য মাত্র। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অজ্ঞতায় ও কুসংস্কারে পল্লীর প্রতিগৃহ পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সভ্যতার কিছু কিছু অসার অংশ পল্লীর শান্তি ও পবিত্রতা বিনাশ করিয়াছে মাত্র। ভাল এমন কিছু প্রদান করে নাই যাহা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ কথাও বলা চলিবেনা যে পূর্ব্বে পল্লীর লোকে বেশী জ্ঞানী ছিলনা বা তাহাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞতা ছিল। অন্ততঃ বাহিরের শিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কালে স্বাস্থ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হই-বার কারণ এই যে পূর্ব্বে অন্নবস্ত্রের কষ্ট ততখানি ছিল না যতখানি বর্ত্তমান সময়ে হইয়াছে। দিনে দিনে আর্থিক সম-স্যার পরিবর্ত্তন ঘটাতে পল্লীবাসী কৃষিবলগণের অবস্থা শোচনীয়-তর হইতেছে। বৈদেশিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পসমূহ একে একে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগমনের সঙ্গে সরলচিত্ত গ্রামবাসিগণের হৃদয়স্থিত শাস্ত্র-বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রবিধি সমূহ পালনের জন্য অজ্ঞাত-সারেও যে সকল উপকার লাভ করা সম্ভবপর হইত তাহাও এখন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে নব্য বিজ্ঞানের উপর তাঁহাদের তাদৃশ আস্থা জন্মে নাই। সুতরাং বিজ্ঞানসম্ম-

উপায়াদি অবলম্বনে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনও তাঁহাদের দ্বারা ঘটিয়া উঠেনা। এইরূপ সমস্যার মধ্যে পড়িয়া দেশের স্বাস্থ্য যে উৎসন্ন যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমাদের কর্ত্তব্য পথ পরিষ্কার। এই শতাব্দীর হীনতার গরল গণ্ডুষে পান করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের পথ মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ঔপ-ন্যাসিক শরৎচন্দ্র গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য করিবার মত সাহসে আমরা বুক বাঁধিতে পারিব কি? দেশের ছাত্রগণের প্রত্যেকে যদি দুইজন মাত্র নিরক্ষরকে এই সর্ত্তে বিদ্যাদান করে যে তাহারাও প্রত্যেকে দুইজন করিয়া লোককে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবে তাহাহইলে বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা মূর্খলোক শূন্য হইবে! প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার না হইলে ভগ্নপ্রায় সমাজের উদ্ধার সাধন অসম্ভব। অন্ধবিশ্বাসের দিন আর নাই। কুট শাস্ত্রতর্ক দেখা-ইয়া দেবরোষ বা স্বর্গচ্যুতির ভয়ে বর্ত্তমান বঙ্গবাসীকে বিন্দুমাত্র ভীত করা যাইবে না। আসল কথা—— বর্ত্তমান জড়তা দূরীভূত করিতে হইলে ভাবের বিপ্লব প্রয়োজন, নতুবা সভ্যতা-নিপীড়িত বাঙ্গালীর নিকট শাস্ত্র প্রদর্শন ও অন্ধকে দর্পন প্রদান উভয়ই একই কর্ম্মে পর্য্য-বসিত হয়।

শ্রীরমণীমোহন মাইতি।

রত্ন-কণা।

পরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সামর্থ জন্মিলেই মুক্তি হইল না,—— নিজের শত প্রকারের নীচতা, সহস্র প্রকারের দুর্ব্বলতা, লক্ষ প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতার যেদিন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে, সেই দিনই মুক্তি আসিবে। * * * দুঃস্থ, দুর্গত প্রতিবেশীর মস্তকে নিষ্ঠুর পদাঘাত করিয়া মুক্তির অহঙ্কার করিও না। জননীর জাতিকে শত লাঞ্ছনায় নিপীড়িত করিয়া মুক্তির দম্ভ রাখিও না। * * * যদি মুক্ত হইতে চাও, পতীতকে টানিয়া তোল, ঘুমন্তকে জাগাইয়া দাও, অলসকে কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত কর। নিজের প্রাণের মুক্ত বাঁশীর রব নির্ব্বিচারে, নিঃসঙ্কোচে প্রাণে প্রাণে ঢালিয়া দাও। কাহাকেও বাদ না দিয়া, কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া, যেদিন মুক্তি আসিবে, সেই দিনই মুক্তি তাহার স্বরূপে আসিবে।

[স্বামী স্বরূপানন্দ]

আমাদের যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাব ধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে তাহার বলেই হইবে! বিলাতের সমাজ-শক্তির বলে আমাদের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবেনা,—— হইতেই পারেনা। দুইটা জিনিস যেমন আঠা দিয়া জোড়া লাগান যায়, ঠিক তেমন করিয়া বিলাতের ভাবটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগান যায় না। এযে জীবনের লীলা, জীবন বিকশিত হয়। তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সেত তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

[চিত্তরঞ্জন]

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ সচ্চিদানন্দ প্রভু! হে অনন্ত-হৃদয়-গগন-বিহারী! হে আমার উপাস্য আরাধ্য দেবতা! হে আমার ধ্যানের ধারণা, আমি ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব চাইনা, আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চাইনা, আমি সার্ব্বভৌম পদ চাইনা; আমি পাতালের আধিপত্য চাইনা, আমি যোগসিদ্ধি চাইনা, মোক্ষ চাইনা, আমি তোমাভিন্ন আর কিছুই চাইনা, আমাকে চরণে স্থান দাও।

হে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-সংঘটনকারি! আমার পাপ হৃদয়সংসারে প্রলয় সংঘটন কর, হে কেশব কালীয়দমন! আমার মানষ-হ্রদে কলুষ কালীয় নাগ দমন কর। হে কৃষ্ণ কংশনিধনকারি! আমার মনের অহঙ্কাররূপ ভীম কংশ নিধন কর। হে প্রভু হিরণ্য কশিপু নিধনকারি! আমার জ্বালাময় হৃদয়ের হিরণ্য নিধন কর। হে হরি মধুকৈটভ সংহারি! আমার প্রাণের পাপ তাপ মধুকৈটভ নিধন কর। হে রাজীবলোচন, রাবণ শমন! আমার প্রাণের হিংসারূপ রাবণ নিধন কর।

* * * * * *

হে দীন দুনিয়ার মালেক! হে মেহেরবান খোদা! হে আসমানবিহারী নবাবজাদা! হে খোদাহ আল্লাহতালা! আমি জিব্রিল হইতে চাইনা, আমি পয়গম্বর হইতে চাইনা, আমি ফেরেস্তা হইতে চাইনা, জীন হইতে চাইনা, আমি দৌলত চাইনা, মালিকানী চাইনা, আমি চাই কেবল তোমার কদমের নীচে পড়ে রইতে। এ শয়তানের মনের তকলিপ দূর কর, বেইমানের মেজাজ শরীফ রাখ, গোনাহ্ হতে জাহান্নাম হতে উত্তার কর।

"শ্রী——"

সুদ-সমস্যা

কেন তেন মনে হয়

মোদের দেশের উত্তমর্ণ ধনী ভাই নয় সহৃদয়।
নিকৃষ্ট জীবেরা করে হানাহানি ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে,
সেই স্বার্থ যদি বেশী বুঝে ধনী, উচ্চ কিসে নর হয়ে?
দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেমের বাঁধন নিয়েত সুখের ঘর,
বাঁধন বিহনে ঘর রতে পারে? ছেলেও হয় বাপের পর।

এইযে বিশাল দেশ

ধনবান আর গরীব নিয়েত? কোথায় শান্তির লেশ?
বিলাস বাসনে ধনী কত ধন উড়ায় গণনা যায়,
পাশের বাড়ীতে গরীবের ছেলে ক্ষুধায় কাঁদে কি চায়?
তবু কোন প্রাণে রোজ সেই ঘরে পিয়াদা বসায়ে রাখে?
আসলের বিশগুণ নিয়ে নয় তুষ্ট; ভেটে পড়েছে চোখে।

স্বার্থ মোহের নেশা

এতই করে অন্ধ মানুষে, বেড়ে যায় শুধু তৃষা।
আবদ্ধ তমস্থুকে ডিউ সুদ কড়া ঋণীর সর্ব্বস্ব টানে,
হ্যাণ্ডনোটেও সুদের সুদ হিসাবে টানিয়া আনে।
চাউলে বাজারে চটাসুদ ব্যাপারীর ফাঁসিটী দেওয়া,
অন্নকষ্টদিনে * টাকায় দুআনা সুদ কোন প্রাণে ধরে নেওয়া;

ধনী ভাই একটু থামো,

সুদের হারটা একটু কমাও, একথায় যেন না ঘামো।

---

* অন্নকষ্ট দিনে অর্থাৎ ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে।

দৈন্য দুঃখের জ্বালায় অকালে মরছে কত বোন ভাই,
এ দেখেও কি তোমাদের একটু দরদ জন্মে নাই ?
একই দেশে জন্ম সবার, একই দেশে বাস,
একটু কই সহানুভূতি ? কিসে হবে দুঃখের হ্রাস।

যদি চাও শান্তি দেশে
ভালভাব নিয়ে একটু ভাব, চল ভাই ভাই মিলে মিশে।
একই ধাতার ছেলে মোরা কেউ ধনী, কেউ দীন,
তবে কেন এত ছাড়াছাড়ি এতই স্বার্থাধীন ?
পশু মানুষের মাঝে আছে প্রভেদ কি ভাই তবে ?
যথায় দয়া ভালবাসা, তথায় শান্তি ভবে।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র দাস।

আত্মসমর্পন।

তোমারি হাতের গড়া কলের পুতুল আমি,
তুমি পাঠায়েছ হেথা, তাইত এসেছি স্বামী।
তুমি শিখায়েছ বুলি তাই দেব কথা বলি,
তুমিই দিয়াছ শক্তি তাই সদা করি রণ—
সংসার সমরাঙ্গনে প্রাণপনে অনুক্ষণ।
জেনেছি সংসারে এই সুখ নাই শান্তি নাই,
শুধু কুটিলতা ভরা— মোহময় এ ভুবন
করেছি তোমার পদে তাই আত্ম সমর্পন!
বুঝেছি ফুরায়ে যাবে জীবন-- স্বপ্নের খেলা!
একদিন ভেঙ্গে যাবে বিশ্বের এ মহামেলা;
তোমার অনন্ত লীলা তোমাতেই হবে লয়,
বিশ্ব মোরে ভেঙ্গে দিও যখনি বাসনা হয়,
আমিত আমার নহি— নহে প্রাণ, নহে মন,
করেছি তোমার পদে তাই আত্ম সমর্পন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী সিংহ।
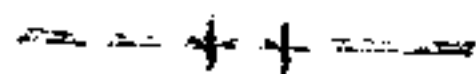
গো পালন।

আমাদের পালনকর্ত্তা কে? "গোপাল।" এ গোপাল স্বয়ং সেই ভগবান না হয়ে এ তাঁরই অংশজাত বা দেবতার স্থলাভিষিক্ত "গো সমূহ" যারা আমাদের কৃতজ্ঞতায় জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা গৃহস্থ মানুষ, একদিনের জন্য ভাবি নাই যে এদের এই দশা হওয়াতে আমাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়েছে। যেদিন দেশ গোশূন্য হবে, সেদিন মানুষ তুমি কার বলে বেঁচে থাকবে? অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ দেহে তোমাদের শত দৌরাত্মেও নীরবে অশ্রুবারি দিয়ে কে তোমাদের এই সোনার বাঙ্গলা সদা সোনার ফল পুষ্পে সুশোভিত করে শস্যশালিনী রাখবে? কে তোমাদের শুষ্ককণ্ঠে অমৃত দুগ্ধধারা দিয়ে জরা জীর্ণ দেহে শক্তি সঞ্চার করে দিবে? পূর্ব্বে যে দিন প্রত্যেক গৃহস্থের গোয়ালপূর্ণ গরু ছিল, যেদিন গৃহস্থেরা তাদিগকে দেবতা বলে সেবা করত, তার ফলে (কথায় বলে) তাঁরা দুধে মুখ ধুতেন। সেদিন তাঁহাদের সাংসারিক ও শারিরীক অবস্থা কিরূপ ছিল? সকল প্রকারেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি ছিল। একটু ভাল করে চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যায়, গো জাতির দুর্দ্দশাতেই আমাদের দুর্দ্দশা। আমাদের পল্লী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়, প্রতি বৎসর জন্মানর হার থেকে ধ্বংসের হার বেড়েই চলেছে। ধ্বংসের প্রধান কারণ দুটী। — ব্যাপারীর নিকট গো বিক্রয় ও শুশ্রূষার অভাব। যে সব গাই বাছুর বিক্রীত হয়ে গোখানায় চালান যাচ্ছে তদ্দ্বারাই দেশে জন্মাবার হার কমে যাচ্ছে। যেগুলি আমাদের পল্লী অঞ্চলে থেকে যায় সে গুলি দলের সেরা। তাহার কারণ আজকাল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে ভাল গাই বাছুর বড় একটা দেখা যায় না। থাকে গরীব দুঃখীদের বাড়ীতে।

তাঁরা প্রাণ দিয়ে ভালবেসে পালন করেন অবশেষে দেনার দায়ে মহাজনের গুঁতোর চোটে ব্যাপারীদের হাতে তুলে দেয়। এর দ্বারা দেশের সেরা গরু গুলো দেশ থেকে উজাড় হয়ে যাচ্ছে! তা ছাড়া গৃহস্থেরা তৈল লবন কেনার জন্য যে সব গরুকে বুড়ো বলে ভাল করে দুই চারি টাকা নিয়ে ব্যাপারীদের হাতে তুলে দেয়, সে গরু গুলি প্রকৃত পক্ষে বুড়ো নয়! শুধু দয়াময়দের যত্নের গুণেই তাদের ঐ দশা। সহর থেকে সভ্যতাব্যাধির কীটানু সমূহ দমকা উড়ো হাওয়ায় এসে আমাদের পল্লীর গৃহস্থের শরীরে ঢুকে এমনই বাবু করে তুলেছে যে নিজ হাতে গোসেবাত দূরের কথা, চাকরেরা রীতিমত খড় জল দিল কি না এইটুকুর খোঁজ নিতেও নিজেকে অপমান জনক বিবেচনা করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তাস পাশা খেলায় কাটিয়ে দেন। পূর্ব্বে গোসেবা কর্ম্ম স্ত্রীলোকদের উপরই অধিকাংশ সময় নির্ভর করিত। তখনকার পুরুষেরা অকর্ম্মণ্যের মত শুধু তাস পাশা খেলে বাজে গল্প গুজব করে সময় নষ্ট করেন নাই। এখনকার বাবুরা স্ত্রীলোকদিগকে ও সব কাজে হাত দিতে দেন না। ফলে এখন এই দাঁড়িয়েছে যে পল্লীতে বিশ বৎসর আগে টাকায় দেড় সের পর্য্যন্ত ঘি; দুই পয়সায় একসের দুধ মিলিত এখন সেই পল্লীতে টাকায় দেড়পোয়া ঘি, দুই আনায় একসের দুধ মেলা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দুধের অভাবেই কত শিশু কত রোগী অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।

চাষের ব্যবস্থাও চূড়ান্ত! কৃষকেরা সকাল পাঁচটার সময় উঠে হাই তুলতে তুলতে গা ভাঙতে ভাঙতে গোয়াল ঘর হতে মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হেলেকে দড়ি ধরে টেনেটুনে

ঠেলে ঠুলে গুঁতোতে গুঁতোতে কোনও ক্রমে ক্ষেতে নিয়ে যায়। জমিতে একটি বা দুটী চাষ দিয়ে (যদি শেষ পর্য্যন্ত গরু টিকে, কারণ অনেক গরু ঐরূপ অবস্থায় জবাব দেয়) কপাল ঠোকে ধান্য রোপন করে বাড়ীতে বসে বসে দিন গনতে থাকে! আর এই সোনার বাঙ্গলার মাটীর উপরে বর্ষা দেবীর কিছু কিছু কৃপাদৃষ্টি আছে। সুতরাং কিছুনা কিছু হবেই! যে বৎসর বর্ষাদেবী কিঞ্চিৎ বাম,— সে বৎসর কান্না কাটি। যদিও নদী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তবু কাজের গঙ্গা মিলেনা! কারণ খাল নালার সমস্যা বড় বিসম। প্রজাদের কান্নাকাটিই সার।

* * * * * * * *

এখন গোজাতির এই দুর্দ্দশা দেখে কোন হিন্দু যেন চুপ করে না থেকে দুর্দ্দশার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন নিজেদের ইষ্ট চিন্তা করেন। পূর্ব্বপুরুষগণের গোরক্ষা, গোবংশবৃদ্ধি, গোপালন-নীতির অনুসরণ করেন।

শ্রীবিধুশেখর দাস।
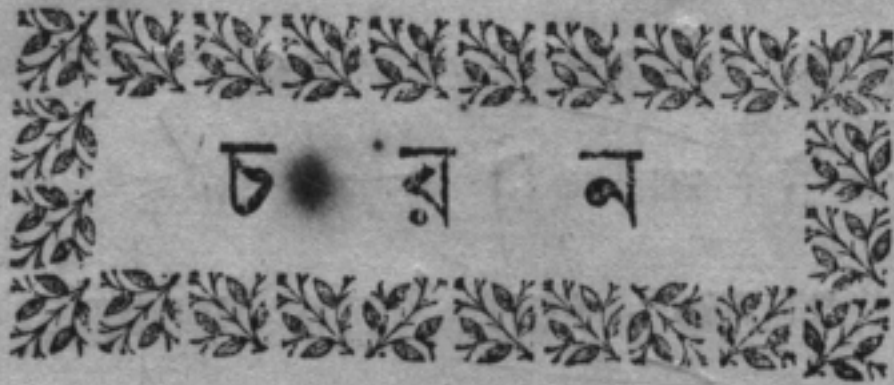
সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার।

* * দেশের যে এখন ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আর কাহারও উপলব্ধি করিতে বাকি নাই। এই বোধই আমাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত করিবে। দেশবাসীর মনে আজ যে ব্যাকুলতা আসিয়াছে, তাহাতেই শেষে সাফল্য আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাই চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশ হইনা। * * বাহ্যিকভাবে দেখিতে গেলে আমাদের সমাজের উদারতা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, "সমাজের" "মনের" বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই!

আমাদের অনেক ব্যাধি। শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জিভূত অনাচারের নাগপাশে সমাজদেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে। * * আজকাল চা প্রায় সকলেই পান করেন— যদিও এই চাই আমাদের দেশের অজীর্ণতা ও দৃষ্টিক্ষীনতা প্রভৃতি আধুনিক ব্যাধিগুলির অন্যতম কারণ। এই চার সঙ্গে বিস্কুট খাওয়াও আজকাল ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * * বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি বলিতে পারি এই বিস্কুট আমাদের দেশের মুড়ি অপেক্ষা কোন মতে খাদ্যরূপে উৎকৃষ্ট নহে! * * কিন্তু মুড়ির নামে কে না নাসিকা কুঞ্চিত করেন? ইহার মধ্যে কি সাহেবিয়ানা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? ভদ্রলোক অতিথিকে বিস্কুটের পরিবর্ত্তে মুড়ি দিয়া অভ্যর্থনা করিবার সাহস নাই কেন? * * এই তথাকথিত সাহেবি সভ্যতার বাহিরের পরিচায়ক চিহ্ন কি? অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, ইহা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যোগী ও গৃহী

বিহগ বন্দনা গীতে উষা আগমন ঘোষে,
ত্যজিয়া শয়ন
প্রাতঃকৃত্য করি শেষ স্কন্ধে ঝুলি চলে যোগী
নগর সদন।
গেরুয়া বসনে ঢাকা দিব্য সেই গৌর কান্তি,
হেরিয়া তাহারি
লোকে ভাবে "শাপভ্রষ্ট দেবতা কি ছদ্মবেশী
রাজার কুমার।"
কত মুগ্ধা কুলনারী মুষ্টি ভিক্ষা স্বর্ণে আনে
ভরি থালা ভরি।
বড় প্রীত চলে যোগী গৃহ হতে গৃহান্তরে
গ্রাম গ্রাম ঘুরি।
ক্রমে দেব দিবাকর বাল্য কৈশোর ছাড়ি
ধরে পূর্ণ কায়,
নধর নলিন কান্তি হইল মলিন, যোগী
ঘর্ম্মাপ্লুত তায়।
দীপ্ত সূর্য্য শিরোপর তপ্ত ধূলি পদ নিম্নে
চলে না চরণ,
জ্বলিছে জঠরানল তৃষায় ফাটিছে বুক
বহুদূর বন।
অদূরে কুটীরে এক রুগ্ন স্বামী শয্যাপাশে
পতিপরায়ণা
স্বামীপরিচর্য্যারতা, দিবারাতি ক্ষুধা তৃষ্ণা
ভুলিয়া আপনা,
সে কুটীর দ্বারে আসি উপনীত হয়ে যোগী
ডাকে উভরায়—

"ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী দ্বারে, ওমা লক্ষ্মি! ত্বরা করি
কর প্রীতি তায়।"
"এক কর্ম্ম হাতে মোর" ধ্বনিল রমণী কণ্ঠ
"সাধুর বচন—
কর্ম্মান্তরে ঘটে পাপ, কিছু অপেক্ষায় দেব
তাই নিবেদন।"
অপেক্ষা? উপেক্ষা মোরে?" রুদ্ধফণি গর্জ্জি উঠে
হৃদয়ে তখন।
"রে পাপিষ্ঠে! এত স্পর্দ্ধা?" স্বগত কহিলা যোগী
"স্মরিলি মরণ?"
কুটীর মাঝার হতে অমনি রমণী কণ্ঠ
করিল উত্তর—
"ত্যজ আত্ম অহঙ্কার, নহি কাক বক, যুবা
কি দেখাও ডর?"
বিদ্যুৎ চকিল মেঘে! সবিস্ময়ে কহে যোগী
অদ্ভুত রমণী!
একিগো জাগ্রত স্বপ্ন?! যোগীর আসন উর্দ্ধে,
বসিয়া রমণী!
অন্তরযামিনী নারী! রে গর্ব্বিত পরাজিত
তব যোগবল!
দ্বাদশ বৎসর ধরি এ রুচ্ছ সাধনে তবে
কি লভিলি ফল?
বিস্ময়ের সীমা নাই, চিন্তার শেষ নাই,
অকুল পাথার।
স্থির অচঞ্চল নেত্র নির্ব্বাক বসিয়া যোগী!
না জানে সাঁতারে।

(ক্রমশঃ) শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস

* * বিলাতের অনুকরণ স্পৃহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত। * * ইংরাজের কাজ করিবার পদ্ধতির অনুকরণ করিবার জন্য আমরা যত্নবান নহি। তাঁহাদের ব্যবসায়ে কৃতী হইবার জন্য যে সব অধ্যবসায় আছে তাহা আমাদের নাই। কিন্তু বাহিরের আড়ম্বর ঠাট ও জাঁক জমক নকল করে আমরা সফল হইবার আশা করি।

বাঙ্গলার হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ। * * শুধু আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকা যায় না। সামাজিক দুর্নীতিসকল কুটতর্কে দূর হয়না হিন্দুদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেই জগতে আমাদের স্থান হইবে না। আমরা যদি অচিরে সমস্ত সামাজিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান না করি তবে আমাদের ভবিষ্যত যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন তাহা না বলিলেও বুঝা যাইতেছে।

* * আর একটা বড় ব্যাধি আসিয়াছে জুয়া। * * রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টায় সহরে ঘরে ঘরে জুয়া খেলা। তুলার খেলায় অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আবার ঘোড় দৌড়ের নেশা নাকি অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

* * অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ রাখিলে রোগ সারিবেনা। এই অধঃপাতিত জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন বিষাদে আক্রান্ত হয়। জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত একাসনে বসিবার স্থান পাইতে হইলে সমাজদেহের ক্ষতগুলির উপর অস্ত্রোপচার করিতে হইবে।

আজ আমাদের হৃদয়ের অবসাদ দূর হইয়া এই জাতি নববলে বলীয়ান হইয়া উঠুক এবং অন্তরে জাতীয় জীবনদেবতার আহ্বান-ভেরী শুনিয়া আমরা জাতিগঠনে আমাদিগকে নিয়োজিত করি।

বসুমতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ব্রাহ্মণ।

কোথায় ভূদেব তুমি এ মর্ত্ত্যে অমর ভূমি
তোমার চরণ রেণু করিয়া পরশ,
জ্ঞানে করি আত্ম জয় নাশিয়াছে ভবভয়,
সংসারে ঢালিয়া দেছ অপার হরষ।
তপঃপূত তব মূর্ত্তি, প্রদানিছে নব স্ফূর্ত্তি,
বিহ্বল মানব হৃদে — শুভ আশীর্ব্বাদ,
গর্ব্বের খর্ব্ব শৃঙ্গ, শাপবজ্রে করি ভঙ্গ
ঘুচায়ে দিয়াছ, চক্ষু কর্ণের বিবাদ
দেখায়ে দিয়াছ, আছে, এ মর্ত্ত্য জীবন পাছে
অমর জীবন স্রোতঃদূর প্রসারিত।
তারি সমাচার লয়ে, আসিয়াছে ঘর বয়ে,
অগ্রদূত হয়ে দেব, হৃৎপ্রধাবিত।
হে ব্রাহ্মণ কেন তবে, উচ্চারিত উচ্চ স্বরে,
প্রণব ঝঙ্কারে দিক নহে মুখরিত?
ভুলে বর্ণ পরিচয়, "অক্ষয় অসত্য হয়,
এবিষম ভ্রমে কেন হইলে পতিত?
তুমি গো সুখের দ্বেষী, এবে যদি সুখান্বেষী,
ডুবে যাক তবে এই পুণ্য আর্য্য স্থান।
তন্ত্রমন্ত্র শাস্ত্ররাশি, যাউক সাগরে ভাসি
"মর্ত্ত্যের গীর্ব্বাণ" নাম হউক নির্ব্বাণ।

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ কবিভূষণ

শোভনা

আশ্বিন।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা

আগমনী

শঙ্খ-উলু উলু চারিভিতে।
পড়েছে কিএক জাগরণ-সাড়া আজিকে মধুর প্রভাতে।
কত বরষের তমঃ- যবনিকা
সরায়ে যেন আলোক-কণিকা
ধরার বক্ষে ধীরে ফুটে পড়ে,ঝ'রে পড়ে তরু-লতাতে;
আধ ফোটা ফোটা ফুল বধূগুলি
চায় আড়ে আড়ে গুণ্ঠন খুলি,
বিহগ কণ্ঠে আগমনীগীতি সঞ্চরে পুলক হিয়াতে।

ঝ'রে বেদীপরে সেফালি।
মণ্ডপ লতানে অপরাজিতা, লবঙ্গ তোরণে কিলমিলি।
কাশগুচ্ছে বায়ু চামরের মত
বীজনয়, তরু-বীথি শিরনত,
ফল ফুল নিয়ে দাঁড়ায়ে, এহেন প্রকৃতির ভেট, অঞ্জলি।
শ্যামল ধান্য-ক্ষেত্র উপরি
ঢেউ খেলে যায় লাবণ্যলহরী,
বিলম্বে বরষা দু'একটি তাই নমে ধান্য-শীষ সোণালি।

আর ওমা ! রাজ রাজেশ্বরি
বাহিরে লীলাময়ী প্রকৃতি ছটা, ভিতরে একিগো নেহারি,
হেথা হোথা পল্লী বুকে নগরে
কত ভগ্নসৌধ স্মৃতি চিহ্ন ধরে,
তোর পূজা দালান, নাট মন্দির স্তম্ভে, কইসে মাধুরী ?
কোথাও অরণ্য মাঝে যায় দেখা
গড় পরিখা ভগ্ন, মাটি ঢাকা,
কোথাও হতশ্রী জীর্ণ মন্দির, বিহরে পেচক ফুৎকারি

কৈ দয়া ? আয়মা পাষাণি।
মণ্ডপে কৈ তোর মুরতি অঙ্গে সে মাতৃত্ব শোভা মোহিনী?
দামামা কাড়া ঢাক ঢোল কাঁসি
বাজেনাত কই হৃদয় উলসি,
ভুজ্যতাং দীয়তাং কই ? যেন এবে সেসব স্বপ্নকাহিনী।
বরষ বরষ তোর আসা যাওয়া
কি ফল ? এযেন মরীচিকা-মায়া,
তোর দোষ নয়, সকলি মোদের, সেকাল নাইত ঈশানি !

সাধে কি সেকাল নাই মা !
বছরের পর তোর পূজাদিনে রতকি অন্তরে কালিমা ?
ধনী খোলা প্রাণ কৌটিল্য শূণ্য
খাওয়াতে সবে প্রসাদান্ন,
বিজয়ার দিনে প্রীতি আলিঙ্গন, ঝরিত স্বরগ সুষমা।
জমিদার প্রজা, উত্তমর্ণ ঋণী,
করিতনা মামলা এতো খুনো খুনি
পরস্পর ছিল মমতা-বাঁধনে; তাই ছিল সুখ-গরীমা।

ছিল সন্তানের মধুরতা,
সম্পদে ধীরতা, দৈন্যে শীলতা, সরলতা, সত্যবাদীতা ;
ছিল সাধনা, সংযম, শকতি,
অগাধ ভকতি দেব দেবী প্রীতি,
পর্ণ কুটিরেও শঙ্খধ্বনি, ফোঁটা, তোর আগমনীবারতা।
বঙ্গ ব্যাপিয়া হত কি উৎসব,
রোসনাই, পতাকা, কল্ কল্ রব;
কোথায় সেদিন ? তাণ্ডব নৃত্য নিয়ে এল স্বার্থপরতা।
কেমন কুগ্রহ-ছলনা ?
ভায়ে ভাবে নাই সহানুভূতি, একটু নেওয়া বেদনা।
যদি ধনী চাহ দীন ভাই পানে,
কৃষি শিল্প-বানিজ্যে উৎসাহ দানে
ভাগ্যশ্রী তাদের ফিরিতে পারিত, এনয় কবি-কল্পনা।
এতটা অভাব রহিতনা আর,
দূরে যেত অন্নকষ্ট-হাহাকার
তা হলে হত কি সুখের এ পূজা উঠিত কি প্রীতি বাজনা।
আয় শিবে সুজ্ঞান দায়িনি !
আন্ জাগরণ অসাড় জীবনে অপসরি মোহ রজনী।
স্বার্থ-অর্থ নিয়ে হিংসা-রোষভরে
দেশের লড়ায়ে ভাই পরস্পরে
আনে নাই যেন অশান্তি আগমা ! নরকাগ্নি তীব্র জ্বালানি
স্নেহে কোলে নিয়ে কর আঁখিদান,
নবালোকে হোক উদ্ভাসিত প্রাণ,
ভুলে দ্বেষ দিক্ কর্ম্মে সবে মতি পূজে তোর পদ দুখানি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

শারদীয়া মহাপূজা।

আশ্বিন মাস সমাগত। মা আসিতেছেন। মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল শারদাকাশ মায়ের আবাহন করিবার জন্য জগন্মণ্ডপে চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। সেফালি স্বীয় অমল ধবল হৃদয় বিছাইয়া মায়ের চরণ স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রভাত সমীরণ কুমুদ কহলার কমল-কাননকে কম্পিত করিয়া, যেন মায়ের জন্য সুগন্ধি উপহার হস্তে ইতস্ততঃ বিচরণের প্রয়াস পাইতেছে। শ্যামল প্রান্তর শস্যসম্ভারপূর্ণ হইয়া মায়ের অঞ্চলে স্থানলাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি বর্ষার আবিলতা নির্ম্মুক্ত হইয়া শুভ্র শারদ প্রভাতে মায়ের আগমনী গীতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিহগের কলকূজনে, পূর্ণযৌবন দৃপ্তা স্রোতস্বতীর কল-কল ছল-ছল লীলা বিলাসে, পুষ্প সম্ভারপূর্ণ বনোপবনের প্রফুল্লতায়, শস্যপূর্ণা ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চল চালনে সর্ব্বত্রই সেই মায়ের প্রতিকৃতি, সেই মায়ের সুখময়ী স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। বুঝি— প্রফুল্ল নীলোৎপলনয়না কুমুদহাসিনী শরৎ—তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনার জন্য প্রস্তুত হইতেছে,—বুঝি, ধর্ম্ম কামার্থ সিদ্ধিদায়িনী, দুঃখত্রয়নাশিনী, সচ্চিদানন্দলহরী, অদ্বিতীয় ব্রহ্মসংবিত্তি, মহাত্রিপুরসুন্দরী, কেশরীবাহিনী মাতার আগমন বার্ত্তা শ্রবন করিয়া সকলেই স্বস্ব নব নব বেশ ধারণ করিতেছে।—ঐ বুঝি জ্ঞানশক্তি স্বরূপিনী জগজ্জননী সন্তানগণের দশদিক হইতে আগত অজ্ঞানাত্মক বিপদ কুল নাশ করিবার জন্য দশভুজ ধারণ করিয়া, সপরিজনে আসিছেন।আহা ! কি মনোহারিণী শোভা—মার একপার্শ্বে সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিনী সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা ও তৎপার্শ্বে বীর্য্যের অধিষ্ঠাতা দেবাসনাপতি শক্তিধর ষড়ানন, অপরপার্শ্বে ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বীণাপাণি ও তৎপার্শ্বে সিদ্ধির অধিপতি গণপতি।

সন্তানবৎসলা মা আমাদের সম্মুখে দুইটিই রাখিয়াছেন— একটী মায়া জড়িত সম্পদ ও সাধনলব্ধ দিব্য বিদ্যা এবং যেন আমাদিগকে আমাদের রুচি অনুসারে একটী গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। মা'র একটী নাম দুর্গা বস্তুতঃ এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে বুঝা যায় যে, দুর্গা নামের মাহাত্ম্য দেবগণও প্রকাশ করিতে অশক্ত। পুরাণাদি শাস্ত্রে দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে,—

"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে মহাবন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥"

"দুর্গ" অর্থে দৈত্য, (দুর্গাসুরাদি) মহাবিঘ্ন, মহাবন্ধ, (সংসার মায়া বন্ধন) কুকার্য্য, (পাপ) শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, (বারংবার জন্মমৃত্যু অর্থাৎ আসা যাওয়া) মহাভয় এবং অতিরোগ বুঝায়. "আ" অর্থে হনন কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে হইবে. তাহাহইলে যে দেবী এই সমস্ত নষ্ট করেন, সেই দেবীকেই দুর্গা বলিয়া জানিতে হইবে। এখন পাঠকগণ একবার বুঝিয়া দেখুন যে দুর্গা নামের মহাত্ম্য কত? ব্রহ্মাদি দেবগণও যে "দুর্গা" নামের মহাত্ম্য বর্ণনে অশক্ত, সেই সর্ব্বমঙ্গলা নগনন্দিনী দুর্গতিহারিণী "দুর্গা"র নাম মহাত্ম্য তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের হৃদয়ের ধারণাও হইতে পারে না। "দুর্গা" এই নামটীর অক্ষরার্থ করিলে আরও মহাত্ম্য অধিকরূপে প্রকাশ পায়। দৈত্য নাশার্থ বাচক—দকার, বিঘ্নবিনাশক বাচক উকার, রোগঘ্ন-বাচক—(´) রেফ, পাপঘ্নবাচক—গকার, ভয় এবং শত্রুঘ্নবাচক—আকার, সুতরাং যিনি দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় এবং শত্রু বিনাশ করেন, তিনি দুর্গা, এইরূপ সদর্থ বিশিষ্ট দুর্গানাম মুখে উচ্চারণ, মনে স্মরণ এবং কর্ণে শ্রবণ করিলে দৈত্য, বিঘ্ন, পাপ, ভয় ও শত্রু প্রভৃতি নিশ্চয় নাশপ্রাপ্ত

হইয়া থাকে। এইরূপ অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইলে "দুর্গা"নামের মহাত্ম্য শাস্ত্রা-দিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। „প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষর দ্বয়ম্। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" ইত্যাদি চিরপ্রচলিত শাস্ত্র বাক্যেও দুর্গানামের সমধিক মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়।

জগজ্জননীর মহাপূজা যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণগোলকে রাসমণ্ডলে প্রথমে মার পূজা করেন, পরে মধুকৈটভ ভয়ে ভীতঃ ব্রহ্মা, ত্রিপুরাসুর বধকালে ত্রিপুরারি যোগেশ্বর, সুলভ কোপ মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে ভ্রষ্টসম্পৎ মহেন্দ্র দেবির পূজা করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবী—সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র কর্ত্তৃক বেদোক্ত উপচারে পূজিতা হইয়াছিলেন। পরে রাজ্যভ্রষ্ট মেধস-শিষ্য সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য নদী-পুলিনে যাইয়া চিন্ময়ী মার মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিয়া যথোপ্সিত বরলাভ করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মাবরদৃপ্ত দোর্দ্দণ্ড রক্ষরাজ দশাননের সংহারার্থে কনকপুরে অকালে কাকুস্থ করুণাময় রাম মায়ের পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যলোকে দেবীর মহাপূজার প্রচার হইল। এক্ষনে প্রতিবর্ষে ভারতের মধ্যে বিশেষতঃ বাঙ্গলার প্রায়ে প্রতি গ্রামেই মাতৃভক্ত হিন্দুগণ মার পূজা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা॥
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ॥

অর্থাৎ প্রতিবর্ষে শরৎকালে যে মহাপূজা করা হয় সেই পূজাই চতুকর্ম্মময়ী শারদীয়া মহাপূজা সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতেই ভক্তি সহকারে যথাবিধি এই চতুঃকর্ম্মময়ী শারদীয়া মহাপূজা প্রতিবর্ষেই আশ্বিন শুক্লপক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ মাতৃভক্ত হিন্দুদিগের সামর্থানুযায়ী করা যুক্তিযুক্ত। চতুঃকর্ম্ম বলিতে স্নান, পূজা, বলি এবং হোম কার্য্যই বুঝায়। হিন্দুজাতির

ধর্ম্ম কর্ম্ম মাত্রই যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার তখন এই শারদীয়া মহাপূজাও যে সেইরূপ তিন প্রকার হইতে পারে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ সাত্ত্বিকাদি পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসীচৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবী মনাস্তথা।
দেবীসূক্ত জপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পণম্॥

অর্থাৎ জপযজ্ঞাদি এবং নিরামিষ নৈবিদ্যাদি উপকরণ দ্বারা যে পূজানুষ্ঠান হয় তাহাকেই সাত্ত্বিকী পূজা বলে। পুরাণাদিতে এইরূপ সাত্ত্বিকী পূজা দ্বারাই মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মহাত্ম্য অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবীমহাত্ম্য (সপ্তশতী চণ্ডী) পাঠই জপ, এইহেতু দেবীমনা হইয়া চণ্ডীপাঠ দেবীসূক্ত জপ এবং সুসংস্কৃত বহ্নিতে তর্পণ করিবে। এইপ্রকার জপ যজ্ঞাদিরহিত পূজাই রাজসিকী পূজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

"রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবিদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরা মাংসাদ্যুপাহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনাতু যা॥"

অর্থাৎ যে পূজা উক্তরূপ জপযজ্ঞবিহীন হইয়া বলিদান, আমিষনৈবেদ্য এবং সুরা মাংসাদি পূজোপহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজসিকীপূজা বলে। আর তামসী পূজা বলিতে মন্ত্রব্যতীত যে পূজা তাহাকেই বুঝিতে হয়। এই তামসী পূজা কিরাতাদিরই সম্মত হইয়া থাকে। যথাঃ—

"বিনা মন্ত্রৈ স্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা।" এইরূপ সত্ত্ব-রজ স্তমো গুণ ভেদে স্ব স্ব অধিকার অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য সেবকগণ, এমনকি ম্লেচ্ছাচার সম্পন্ন দস্যুগণও এই মহামায়া দুর্গার পূজা করিতে অধিকারী। যথাঃ—

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ ॥"

অধিকার বিচারে নিজে কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারাও এই দেবীর পূজা করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত পূজকের অভাব হেতু পূজায় তাদৃশ ফল লাভ হইতেছেনা! অধিকাংশ পুরোহিত মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে একবারে অন্ধকারে ডুবিয়াছেন। আমাদের মন্ত্রার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, কর্ম্মে বাক্যেও মনে এক করিবার জন্যই মন্ত্রোচ্চারণ প্রয়োজনীয়! মন্ত্রের অর্থ না জানিলে—মন্ত্রনা বুঝিলে, হৃদয়ে কোন ভাবের উদ্রেক সম্ভবপর নহে। যথাঃ—

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চন স্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সন্নিধ্যমৃচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ পূজক ভাল হইলে অর্থাৎ তপঃপরায়ণ হইলে পূজার্চ্চনার গুনে পূজিত প্রতিমূর্ত্তির আভিরূপ্য হেতুই অভীষ্টদেবতা আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এই সমুদায় অভাব হেতু নব্যশিক্ষিতের দল স্বেচ্ছাচারী সমাজের সঙ্কল্পে একমত হইয়া ভারতবর্ষে এক মহাপ্রাণে একমহাজাতি গঠনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কাজেই আজকাল স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, হিন্দুর দেব দেবীর পূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উড়াইয়াদিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তাহারা জানেন না যে, হিন্দুজাতি যে প্রতিমা গড়াইয়া দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে, উহা হিন্দুগণের পুতুল পূজা নহে, উহা বাস্তবিকই চৈতন্যের উপাসনা। প্রকৃত পক্ষেও এক সেই শুদ্ধ নিত্য চৈতন্য আত্মার প্রতি বিম্বই যাবতীয় দেব দেবীগণ। প্রথম হইতে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্বকে আরাধনা করিয়া হিন্দুজাতি অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন, এইনিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রে উপাসনা মাত্রই প্রত্যক্ষে যে কোন দেব দেবীরই হউকনা কেন,

পরোক্ষে তাহা এক সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই পর্য্যবসিত থাকে। এইজন্যই আমরা চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি মহামায়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের উক্তরূপ যৎকিঞ্চিৎ সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া "শোভনার সহৃদয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার দিতেছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ, হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবী উপাসনাই যে একমাত্র সারলক্ষ্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই শারদীয় মহাপূজার মহোৎসবের দিনে সর্ব্বদা সেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়া ভগবতী মা দুর্গার পাদপঙ্কজে একান্ত ভক্তি রাখিয়া মনঃপ্রাণ খুলিয়া বলুন—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরি দেবি চরাচরস্য॥

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদতীর্থ।

আবাহনী।

এস, শুভ্রজাহ্নবীমৌলি আশুতোষবাসিনী!
এস, বীতমলশারদ সুধাকর সুবরণী!
এস, দীর্ঘজটউর্দ্ধম-পশুরাজবাহিনী!
এস, হিমতনয়ামধ-শতদলহাসিনী!
এস, চণ্ডবিকট শুম্ভ—নিশুম্ভ বিদলনী!
এস, অমরনিলয়-ত্রাসমহিষমর্দ্দিনী!
এস, দিব্য উজ্জ্বল দশপ্রহরণধারিনী!

এস, ঘনঘোর বিশ্বকল্মষ নিকরতারিণী !
এস, ভবজলধিনিমগ্ন রুগ্নবিমোচনী !
এস, তপনতনয় ভয়বারনকারনী !
এস, ভীতিসঙ্কুল বিশ্ববরাভয়দায়িনী !
এস, কলুষিতউদ্দাম রিপু দলমথিনী !

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পড়ুয়া বি, এ

স্ত্রী শিক্ষা

পাশ্চাত্যশিক্ষা ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিবার পর হইতেই ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে স্ত্রীশিক্ষা লইয়া তুমুল অন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। যখন ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনকল্পে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন অতি ভীরু অতিবিশ্বাসহীন সনাতনপন্থী ভারতবাসীগণ স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের পরিপন্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা নারীদিগকে দেবী ও লক্ষ্মী বলিলেও কার্য্যতঃ তাহাদিগকে জ্ঞানহীন সেবাপরায়ণ হীনজীবের ন্যায় জ্ঞান করিতেন ও সুগচ্ছিত মনিমুক্তাপ্রবালাদির ন্যায় তাহাদিগকে লোকদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। এইসকল স্বার্থপর ব্যক্তির বোধহীনতায় স্ত্রীসমাজের গণ্ডী সম্প্রসারিত হয় নাই। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী পুরুষমনোরঞ্জন, পুরুষসেবা, সন্তানোৎপত্তি প্রভৃতি

কার্য্যের জন্যই ঈশ্বর স্ত্রীজাতি সৃজন করিয়াছেন॥ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়া স্ত্রীদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা পর্দ্দানশীনা, অবগুণ্ঠনবর্তী করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্রেন কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য—যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রীস্বতন্ত্রতাম্॥"

মনুসংহিতার এই শ্লোক স্ত্রীদিগকে বাল্যকালে পিতৃবশে, যৌবনে স্বামীর অধীনতায় ও পরে পুত্রের নিকট থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেছে। গৃহকর্ম্মসম্বন্ধে পিতৃবশে ও স্বামীবশে থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। উহাতে স্বাতন্ত্র্য কামনা করা স্ত্রীদিগের অনুচিত। তাঁহারা পিতাকে, স্বামীকে বা পুত্রকে সময়বিশেষে যুক্তি ও উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য কামনা করা স্ত্রীদিগের অনুচিত। তাঁহারা পিতাকে স্বামীকে বা পুত্রকে সময়বিশেষে যুক্তি বা উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র কামনা যেন না করেন স্বাতন্ত্রের ফলে পারিবারিক সুখ বিনষ্ট হইতে পারে। মনুসংহিতায় বোধ হয় এমন কোন নীতি লিপিবদ্ধ নাই, যাহাতে স্ত্রীদিগের সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র অবরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অপরিনামদর্শী সনাতনপন্থিদিগের সমাজশাসনে স্বাতন্ত্রের দ্বার অর্দ্ধরুদ্ধ হইয়াছিল, এখন সেই অর্দ্ধরুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া দুই চারিটী মহিলারত্ন ভারতীয় সমাজে স্থান গ্রহণ করিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষার দৃঢ়ভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনবিরোধী ব্যক্তিগণের সংখ্যা সমগুণহিসাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। উদ্বাহসম্বন্ধ স্থাপনকালে পাত্রীর শিক্ষা বর্ত্তমানকালে প্রধান আলোচ্যবিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা লইয়া বর্ত্তমান সমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয় না। তবে ভারতীয় শিক্ষা কোন নীতির দ্বারা পরিচালিত হইবে ঐ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদ হয়। কেহ কেহ নারিদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত ও সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা নারিদিগকে সামাজিক ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য দিতে, ও রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্য ও সমকক্ষতা দিতে ইচ্ছুক। অন্যদল নারিদিগকে পারিবারিক কার্য্যশিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে চাহেন। তাঁহারা নারিদিগকে সামাজিকক্ষেত্রে সামান্য স্থান দিলেও দিতে পারেন; কিন্তু রাজনীতিতে নারিগণ হস্তক্ষেপ করিবেন, এ তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। আমাদিগকে এই সকল সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যজগতে পুরুষগণ যেরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, স্ত্রীগণও সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন। এইরূপ শিক্ষার ফলে স্ত্রীগণ কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদিগের সহিত সমভাবে দণ্ডায়মান হইতে চাহিতেছেন। রুশিয়াতে নারিগণ রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যজগতে প্রায় সর্ব্বস্থানেই নারিগন আইন ব্যবসায়ে স্থানলাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে মহিলা বৈজ্ঞানিকের সংখ্যাও কম নহে। "রসায়ণ শাস্ত্রে মাদাম কুরী, পদার্থবিজ্ঞানে হার্থা এয়ার্টন, অণুবীক্ষণ ও প্রস্তরীভূত উদ্ভিদবিজ্ঞানে মারী ষ্টোপস্ প্রভৃতি অনেক মহিলারত্ন বিজ্ঞানজগতে নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন" শ্রীমতী রাল্ফ্ স্মিথ্ ব্রিটিস কলোম্বিয়ার সচিবপদে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। রাণী বোডেসিয়া ও জোয়ান অফ্ আর্ক প্রভৃতি বীরমদিগের উষ্ণরক্ত এখনও ইউরোপের মহিলাদিগের ধমনীতে আছে।

হিন্দুদিগের ইতিহাসে যে নারীদিগকে সর্ব্ববিষয়ক কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইনা তাহা নহে। হিন্দুসাহিত্যের পৌরাণিক যুগে বিশ্ববারা

অপালা, অদিতি, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, দেবাহুতি, আত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষীর নাম পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবযুগে বঙ্গনারী রামমণি, মাধবী ও রসময়ী প্রভৃতিকে কবিতাচর্চ্চাকারীরূপে দেখিতে পাই। সাহিত্যের কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে বৈজয়ন্তী, প্রিয়ম্বদা সুন্দরীদেবী, আনন্দময়ী, গঙ্গামণি, যজ্ঞেশ্বরী, করুণাময়ীদেবী, তারিণীদেবী প্রভৃতির রচনা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানকালেও লেখিকার সংখ্যা অল্প নহে। জ্যোতির্বিদ্যাপারদর্শিনী খনাদেবীর নাম সর্ব্বগৃহেই পরিচিত। কৈকয়ী দশরথের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বীরত্বময়ী মহাপ্রাণা নারী অহল্যাবাইর পাঁচশত নারী সৈনিক ছিল। পদ্মিনী প্রভৃতি রাজপুত ললনাগণ অশ্বারোহন ও আত্মরক্ষণোপযোগী যুদ্ধবিদ্যা জানিতেন। ময়নাগড়ের মহিমারাজা লাউসেনের পত্নী রাণী কলিঙ্গাদেবী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া মহম্মদপালের নবলক্ষ সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মাহিষ্য রাণী রাসমণি স্বহস্তে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অধুনা ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মহিলাগণ প্রবেশলাভ করিতেছেন।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় কি পাশ্চাত্যজগতে—কি ভারতীয় সমাজে নারিগণ সর্ব্ববিষয়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও করিতেছেন। পাশ্চাত্যজগতে নারিগণের আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য সময়বিশেষে শান্তিরক্ষকের আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নয় যে নারিগণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অধিকার পাইলে বিপৎপাতের সম্ভাবনা। যাহা হউক, দুএকজন ভারতীয় মহিলা রাষ্ট্রীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও ভারতীয় নারীসমাজের রাজনৈতিক ত দূরের কথা—সামাজিক কার্য্যেরও অনুপযুক্ত। ভারতীয় মহিলাগণকে হঠাৎ অসংযত স্বাধীনতা দানে নারিগণ তাহাদের সেই অপ্রম[illegible]

স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবে ও পুরুষগণ নারিদিগের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবেনা। এইজন্য, নারিদিগকে হঠাৎ রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে বিবেচকব্যক্তিগণ উপদেশ দিতে পারেন না। তবে পারিবারিক ব্যাপারে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্বাধীনতা দিয়া তাহাদিগকে তত্ত্বমূলক ও কার্য্যকরী জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া উচিত।

পিতা পুত্রের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া যেরূপ তাঁহাকে সংসার-পরিদর্শনের যোগ্য করিয়া তোলেন; training school এর শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে শিশুশ্রেণীর কার্য্যভার ছাড়িয়া দিয়া যেরূপ তাহাদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষাদান করেন; ডাক্তারগণ শিক্ষার্থিদিগকে hospital এর কার্য্যভার কিয়ৎপরিমানে দিয়া তাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলেন। সেইরূপ পুরুষদিগকে পারিবারিক কার্য্যের ভার স্ত্রীদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপ করিলে পুরুষদিগের কার্য্যশ্রম যথেষ্ট লঘু হইবে ও ভারতীয় সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

পারিবারিক শিক্ষালাভ করিয়া নারিগণ বিজ্ঞা ও কর্ম্মকুশলা হইলে তাঁহারা পরবর্ত্তীকালে হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্খা পোষন করিবেন ও সুভাবে সামাজিক ব্যাপারে স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান নারিদিগকে কিরূপ সামাজিক অধিকার দিতে হইবে ও কি কি শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে হইবে তাহা বারান্তরে আলোচনা করা হইবে।

শ্রী গোরাচাঁদ গিরি।

সূর্য্য

হে সহস্র অংশুমালী তাপের প্রভব ?
অন্তহীন নভঃকেন্দ্রে বিশ্বস্রষ্টা বসি,
চরাচর মূল ধাতু করিতে কি দ্রব,
তরঙ্গীন রুদ্র তেজে কি দিবা তামসী !

নির্ম্মিতে বসুধার অঙ্গ অলঙ্কার,
গড়িতে তাদের লাগি সুখদ প্রকৃতি,
ক্ষিতি ছাঁচে রশ্মিসহ ঢাল অনিবার,
তাইত নবীনা চির ভূতধাত্রী ক্ষিতি।

ভাঙ্গাগুলি গলাইয়া তোমার চাপরে,
পুনঃ ছাঁচে ঢালে বুঝি বিশ্বশিল্পকর,
সৃজন প্রবাহে মিশি সতত সঞ্চরে,
এই মরভূমি রহে সতত অমর।

তাই বন্দ্য ঋষিগণ বিশ্ব-বিধাতার,
সবিতৃ মণ্ডল মধ্যে ভাবি অধিষ্ঠান,
মনপ্রাণে স্তুতি গান করিত তোমার।
সুরে সুর মিলাই গাই সেই গান।

শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ।

নিবেদনঃ— আমাদের নানাবিধ অসুবিধার জন্য পত্রিকা প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে। সেজন্য ক্রটী গ্রহণ করিবেন না।

যাঁহাদের নিকট বার্ষিক চাঁদা বাকি আছে দয়া করিয়া প্রদান করুন।

বিনীত—পরিচালক

বাণী প্রেস হরিপুর।

শ্রীযাদব চন্দ্র সিংহটাল দ্বারা মুদ্রিত।

শোভনা

প্রথম বর্ষ—১৩৪০ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ

আত্মসমর্পণ।

তোমার, একি পথদিয়ে যাওয়া ?
বাঁশির সুরে উদাস ক'রে মনচুরী ক'রে নেওয়া।
সংসারে কাজে যায় না মন,
পায় পায় ভুল অনুক্ষণ;
না বুঝে লোকের চোখ ঠারা ঠারি, মিছাই গঞ্জনা দেওয়া।
কি যেনই গেল ঘটি !
সৌরভিত বায়ে তোমার পরশ যেন, চমকি উঠি।
পিকের কুহুতে যেন তব সুর,
প্রাণ উন্মাদক সঙ্গীত মধুর,
নিশিথে বিধুর অধরে যেন তব হাসি পড়ে ফুটি।

ও হে বিশ্ব-রূপ !
প্রাণের দেবতা ! যে দিকে তাকাই দেখিরূপ অপরূপ।
নিম্নে শ্যামল লতায় পাতায়,
উর্দ্ধে নীলিম আকাশের গায়,
তোমার স্নিগ্ধ স্বরূপ প্রভা, তুমি যে বিশ্বের ভূপ।
কি দোষে দোষিনী রাধা ?
প্রেমিক রতনে আপনা হইতে পরাণ পড়েছে বাঁধা।
যমুনা ধায় দূর সিন্ধু পানে,
সাধে উন্মাদিনী ? প্রেমের টানে।
মিলনের পথে জীবনের গতি; অভিসারে কেন বাধা ?
এসহে হৃদয় সখা !
প্রেমধন জীবন যা' কিছু আমার সব নেহ; দাও দেখা।
হৃদে আশা আলো জ্বলিয়াছ যদি
নিভায়ে দিওনা হে দয়াল নিধি !
প্রাণ চায় তব রাঙা পদ, ঘরে যায় কিহে মনরাখা ?

শ্রী পূর্ণচন্দ্র দাস।

জাতীয় উন্নতির অন্তরায়

এই যে আমাদের সঙ্ঘ, যে প্রজাসাধারণ আজ সুষুপ্তির ঘোর জড়তায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেন নির্বিকার, জড়পিণ্ড, অথচ তাহাই বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার সর্ব্বস্ব, তাহাদের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। জাতীয় উন্নতি বলিলে আগে আমাদের সমাজের উন্নতি দেখিতে হইবে। কারণ— এই যে সীমাবদ্ধ সমাজ ইহার উন্নতিই জাতীয় উন্নতি। যাহাদিগকে লইয়া আমাদের এই সমাজ গঠিত তাহাদের অধিকাংশই শিক্ষা, সভ্যতা, ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চিরবঞ্চিত হইয়া আছে। কৈ সমাজত তাহাদের জন্ম কিছুই ভাবেনা। কিম্বা তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও করেনা। বরং সমাজের তথাকথিত আভিজাত্য সম্প্রদায়ের দ্বারা তাহারা ঘৃনিত, লাঞ্ছিত ও অস্পৃশ্য, আজ যে এই সমাজ দিনে দিনে অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে, সমাজের মধ্যে যে অশেষবিধ দোষ প্রবেশ করিয়াছে এবং এই প্রাচীন সমাজের অঙ্গ যে গলিত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহা সর্ববাদী সম্মত, সমাজদ্রোহী দেশদ্রোহী স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ভিন্ন তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

জাতীয় উন্নতি বিধান করিতে হইলে জাতীর মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বিভাগ আছে তাহার বন্ধন মোচন অথবা শিথিল করিতে হইবে। জাতি বলিলে— ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ, নমঃশূদ্র, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার বা এইরূপ ক্ষুদ্র বিভাগ বুঝিলে আর চলিবেনা। যেমন ইংরাজ জাতি বলিলে ইংলণ্ডের অধিবাসী, আমেরিকান জাতি বলিলে আমেরিকাবাসী বুঝায়, সেইরূপ আমাদের জাতি হইবে বঙ্গবাসী এইরূপ সংজ্ঞাদ্বারা আমাদের জাতির পরিচয় দিতে হইবে। এখনকি কেহ সেই পুরাকালের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণকে প্রধান মন্ত্রী

করিতে হইবে এরূপ দাবি বা আবদার করিতে পারেন ? কিম্বা নির্ব্বাচিত ব্যক্তি নমঃশূদ্র বা পোদ হইলে আপত্তি করিতে পারেন কি ? এখন প্রাচীন সংস্কার কতকাংশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নীচ জাতির মধ্যে অনেকে শিক্ষিত হইয়া উচ্চ জাতির শিক্ষকতা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। হিন্দু সমাজ এখন আর সে হিন্দু সমাজ নাই। থাকিতেও পারেনা। যোগ্যতাই পূজা লাভ করিবে, জন্ম জনিত বংশগৌরব আর চলিবেনা। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি শিক্ষিত ও গুণবান হইলে তথাকথিত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব নির্গুণ, অশিক্ষিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে আভিজাত্য-মদে মত্ত হইয়া জাতীয় উন্নতির বিষয় ভাবিবার সময় পান না।

ছুঁৎমাগ দোষ উঠাইয়া দিতে হইবে, ছুঁওনা একথাটী যেন কাহারও মুখ হইতে বাহির না হয়। গো, মহিষ, অশ্ব, কুকুর আমাদের নিকট অস্পৃশ্য নয়, কিন্তু হায়, আমাদের মত বিবেক বুদ্ধি, আমামাদেরই মত ধর্ম্মজ্ঞান যাহাদের সেই ভ্রাতাকে আমরা অনাচরণীয়; অস্পৃশ্য বলিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এই পৃথিবীতে আর কোথায় এমন হতভাগ্য দেশ আছে, যেখানে ভ্রাতা ভ্রাতাকে অনাচরণীয় বলে, যেখানে ভ্রাতা ভ্রাতাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে, যেখানে ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিলে পতিত হয়। হায় ! হতভাগ্য অভিশপ্ত দেশ ! তোমার কি অভিসম্পাত কখনই মোচন হইবে না ?

অনেকে বলেন যে অনাচরণীয়গণের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা ও সভ্যতা এত হীন যে, উচ্চ জাতি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে উচ্চ জাতির অসম্মান হইবে, তাঁহাদের আত্মা কলুষিত হইবে, সেইজন্য শাস্ত্রে তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়াছে। শাস্ত্রে অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে তাহা ঋষিকথিত নয় বা হইতে পারে না।

যাঁহারা ঐতিহাসিক ভাবে শাস্ত্রালোচনা করিবেন তাঁহারা একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন । আর ও দেখা যাইতেছে যে অস্পৃশ্য বা অনাদরনীয় হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতীয় বালক ব্রাহ্মন বালকের ন্যায় প্রতিভাশালী হইতে পারে । তাহাদিগকে প্রতিভা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সুবিধা না দিয়া; তাহাদের আচার ব্যবহারে, শিক্ষা সভ্যতারদোষ দেওয়া নিতান্ত বুদ্ধিহীন ও অদূরদর্শীর কার্য্য। যাঁহারা অপরকে পতিত করিতে পারে, পতিতকে টানিয়া তুলিতে পারেনা, চিরকালই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন; তাহাদের সঙ্গে এক আসনে বসিতে ও নিজেকে অপমানিত ও লজ্জিত মনে করেন, তাঁহারা আবার সমাজের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচয়দেন কি গুনে ? হায় ! আজ সমাজের পদাঘাতে জর্জ্জরিত ও ভগ্নপঞ্জর হইয়া কত ভ্রাতা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে । এ দোষ কাদের ? এরূপ সমাজের আর দরকার নাই, ধ্বংসই বাঞ্ছনীয় । এ কথা নিশ্চয়ই জানা উচিত যে সমাজের মধ্যে জনকতক সামান্য, মুষ্টিময় তথাকথিত উচ্চ ও সভ্য জাতির উন্নতি হইলে সমাজের উন্নতি হয়না এবং কখন হইতে ও পারেনা । যেমন শরীরের মধ্যে যে কোন একটা যন্ত্র (Organ) খারাপ বা কার্যক্ষম হইলে শরীরের উন্নতি হয়না সেইরূপ যে সকল জাতি বা লোক লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত তাহাদের উন্নতির বিধান না হইলে সমাজ বা জাতি কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না ।

যে সকল উপায় দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে তন্মধ্যে শিক্ষাই একটী প্রধান উপায় । শিক্ষা বলিলে কেবল পুরুষের শিক্ষাই চলিবে না । স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাই বুঝিতে হইবে । বাঙ্গলা দেশে শতকরা দশজন মাত্র পুরুষ লিখিতে পড়িতে পারে । স্ত্রীশিক্ষা নাই বলিলেও চলে । বালিকাগণের হাতে খড়ি দেওয়ার সময়েই তাহাদিগকে বরের হস্তে অর্পণ করা হয় ।

তাহারা বরের ঘরে গিয়া একটী চতুরস্র কুঠির মধ্যে আবদ্ধ হয়! এই অবস্থায় তাহারা অল্পবয়সে পুত্র মুখ দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। তাহাদের স্বামীও অবরোধ প্রথার দৃঢ় বন্ধনে তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ জলবায়ুর সংস্রবে আসিতে না দিয়া, তাহাদের পরমায়ুর হ্রাস করিয়া দেন। ইহার ফলে তাহাদের অধিকাংশই মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা হয় এবং দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া, রুগ্ন পুত্র কন্যাগণের অকাল মৃত্যু চক্ষে দেখিয়া, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া অকালে কালের কবলে নিষ্পেষিত হয়। বাল্য বিবাহে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, রুগ্ন সন্তানের জন্ম, শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি যে কত দোষ তাহা বলা যায় না। যে পিতামাতা অল্পবয়সে পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধু দেখিবার জন্য লালায়িত তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন যে যত শীঘ্র পারি পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে পিতামাতার কর্ত্তব্য হয়, কিন্তু তাহাতে বংশরক্ষা দূরে থাকুক বরং সেইখান হইতেই বংশ লয় পাইতে আরম্ভ করে।

হায়! কত কাল আর বাঙ্গালী এ দৃশ্য দেখিবে? কে আছে ইহার প্রতিবিধান করিয়া বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবে? তার পর আবার বিবাহ পনের ব্যাপার চিন্তা করিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। বাল্য বিবাহ ও বিবাহপণ—উভয়ই যে দোষাবহ এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ, এ বিষয় অনেক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা প্রমান করিয়াছেন, সকলে তাহা স্বীকার ও করেন; কিন্তু কার্য কালে যখন নিজের স্বার্থের উপর ঈষৎ আঘাত লাগে, তখন শত উপদেশ, শত প্রতিজ্ঞা জলস্রোতে তৃনদলের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। পনের প্রাবল্যে যে কত শত গৃহস্থ উৎসন্ন হইয়াছে, কতগৃহ দেনার দায়ে হস্তান্তর হইয়াছে তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। এই উভয় প্রথাকে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে বাঙ্গালী কখন সমাজের উন্নতি করিতে পারিবেনা। আর যে সকল বৈদেশিক

ভাবগুলি কেবল আড়ম্বরপূর্ণ এবং আমাদের সমাজের কোন হিত সাধন করেনা পরন্তু অকারণ অর্থব্যয় করাইয়া কেবল স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অনিয়মের সৃষ্টি করে তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইবে সভ্যতার অনুরোধে সর্ব্বনাশ সাধন বাঞ্ছনীয় নহে। যে পিতার রোগের সময় টাকা খরচের ভয়ে ডাক্তার কবিরাজ ডাকাই না কিম্বা এক পয়সার সাগু বা মিছরি আনিয়া দিই নাই তাহার মৃত্যুতে আমরা ন্যূনকল্পে একশত টাকা ব্যয় করিয়া থাকি।

বিবাহে বাইনাচ, আতষবাজী প্রভৃতিতে আমরা মুক্তহস্ত। কিন্তু দেশের কত গরীব দুঃখী যে দিনান্তে এক মুঠ অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। তাহাদের উদরে অন্ন নাই, কোটিতে বস্ত্র নাই, ইহলোকে সুখ স্বচ্ছন্দ নাই।

সে দিকেত আমাদের দৃষ্টি যায় না। তাহাদের কথাত কৈ আমরা একবারও ভাবিনা।

শ্রী[illegible]ভূষণ মাইতি

যোগী ও গৃহী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হইল কর্ত্তব্য শেষ, কুটীর মাঝারে সতী
দিলেন দর্শন ;
সভক্তি লুণ্ঠিত শির চরণে নিবেদে যোগী
গদগদ বচন,—
"কহ মাতঃ! কহ মোরে কেমনে মরমকথা
পড়িলে আমার ?
কেমনে জানিলে তুমি কাক-বক-ভষ্মকথা
অপূর্ব্ব ব্যাপার ?
কোন্ পুণ্য অনুষ্ঠানে লভিলা চরম জ্ঞান
দিব্য দরশন ?
দ্বাদশ বৎসর ধরি যোগে যাগে লাভে যাহা
না হনু সক্ষম !"
স্নেহময়ী মাতৃকণ্ঠে সতী কহে "ওরে বৎস!
নারী জ্ঞানহীনা
কেমনে জানিবে বল যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান
দর্শন গরিমা ?
তবে জানি নারীধর্ম্ম নারীর কর্ত্তব্য য
যাকিছু আমার—
স্বামীসেবা, গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, জননীধর্ম্ম,
অতিথি সৎকার।
কুমারী যখন ছিনু কন্যার কর্ত্তব্য য
করেছি পালন।

এবে বিবাহিতা নারী, গৃহিনী কর্ত্তব্য গালি
করি প্রাণপন !
পীড়িত স্বামী যে মোর ! তাঁহার সেবায় মগ্না
ছিলাম যখন
কর্ত্তব্যে কণ্টক হলো, না শুনিতে মর্ম্ম পীড়া
দিছি বাপধন !

* * * * * *

"সতী স্ত্রীর এই ধর্ম্ম, এই তার যোগাভ্যাস;
সর্ব্বস্ব যে স্বামী,
এর বাড়া আর কিছু রমণীকর্ত্তব্য আছে
জানিনাত আমি।
এই সে কর্ত্তব্য-বরে লভিয়াছি দিব্য চক্ষু,
সেই চক্ষু দিয়া
কাক-বক-ভস্ম আদি তব যোগবল গর্ব্ব
লয়েছি গড়িয়া।
এ হতে উচ্চ তত্ত্বে শিক্ষার পিয়াস যদি
মিটাবারে চাও,
ওই যে নগর মাঝে বাজারে আছেন ব্যাধ
তাঁর কাছে যাও !
জ্ঞানেরভাণ্ডার তিনি, পূর্ণিমার রাকা শশী,
অমিয় জোছনা;
তাঁর পুণ্য উপদেশ সচ্চিদ আনন্দ, বৎস !
অমৃতের কণা !"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস

নিলাম খরিদদার

(ক)

দুর্গা পূজার দিন চারেক পূর্ব্বে বৃদ্ধ পদু ওরফে পদ্মলোচন মণ্ডল যখন তাহার বাড়ীর নিকট তিন কাঠা দুই বিঘা জমিতে উৎপন্ন পাট গাছ গুলাকে কাটিবে বলিয়া, পিতা-পুত্রে তিনজন মজুর সহিত দু'এক বোঝা সবে মাত্র কাটিয়া ফেলিয়াছে, তখন গোবর্দ্ধন দাস এক-দল লাঠিয়াল লইয়া দাঙ্গা বাধাইবে বলিয়া আস্ফালন করিতে করিতে একখানি বংশদণ্ড হস্তে করিয়া অগ্রসর হইতেছিল এবং বলিল, আর একগাছি গাছে হাত দিলেই সে কিছু না কিছু একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে।

তাহাদের আস্ফালনের মধ্যে একথা বাহির হইল যে হ্যাণ্ড নোটের টাকা বাবদে ইতিপূর্ব্বে তাহার সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছে।

বোধকরি পদ্মলোচন এমন যে একটা কাণ্ড ঘটিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। সে গোবর্দ্ধনকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বলি দাসেরপো নিজেরা কেন দাঙ্গা হাঙ্গাম করি বাবুর কাছে এ বিবাদটা মিটাইয়া লওয়া কি সঙ্গত নয়?"

ক্রোধদীপ্ত গোবর্দ্ধন, "এ খুনিএর মিমাংসা হউক! আর বিচার আচার চাইনা" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিলে ও শেষে গ্রামের বিচারকের প্রতি নিতান্ত অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বলিল "আচ্ছা তাই হ'ক, আজ তবে তুমি বাড়ী যাও!"

পদ্মলোচন ও গোবর্দ্ধন একত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে বসিলেই অধিকন্তু গোবর্দ্ধনের সজ্জিত লাঠিয়াল দল ও পদ্মলোচনের নীরিহ তিনটী মজুর একটি জটলা পাকাইয়া বসিয়া পদ্মলোচনের তামাকের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। অতি মাত্রায় তামাকের ধূম পানে হউক

আর উভয়কে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য হউক দুইদলে তর্কের একটা মজলিস বসিয়া গেল।

(খ)

সোণারপুর গ্রামে ঘোষেরা সাত পুরুষে জমিদার বলিয়া পরিচিত আছে; সাতপুরুষ ধরিয়া তাহাদের জমিদারী থাকুক আর না থাকুক তিন চারি পুরুষ তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে জমিদার দেখা যাইতেছে। তাঁহাদেরই বংশে গোপীনন্দপের জন্ম, তিনি বর্ত্তমান গ্রামের সমস্ত গণ্ডগোল মীমাংসা করিতে বসেন, কিন্তু কাজ হয় অন্যরূপ! —— হয় বিচার এক পক্ষে জয় জয়কার হয় নচেৎ গড়াইয়া অধিকতর সংঘাতিক হইয়া আদালতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের জন্য ন্যায়বান প্রভুদের নিকট যায়।

সোণারপুরে পদ্মলোচন ও গোবর্দ্ধন উভয়েরই বাস। বিচার আসিয়া পড়িল গোপীনন্দনের নিকট, গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি যে উপস্থিত হন নাই এমন নহে।

* * * * * *

গোবর্দ্ধন বলিতে আরম্ভ করিল বছর চারেক পূর্ব্বে পদ্মলোচন হ্যাণ্ড নোট দিয়ে ত্রিশটা টাকা লয়েছিল; তা চাইবামাত্র দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় আদালতের ন্যায্য বিচারে মায় সুদ খরচা ইত্যাদি সহ পঞ্চাশ টাকায়, আজ এক বছর হল সাড়ে সতের কাঠা জমি নিলাম হয়েছে। তাতে কি ওর সত্ত্ব থাকতে পারে?

গোবর্দ্ধনের পক্ষে যাহারা ছিল তাহারা পদ্মলোচনকে নানাপ্রকার কড়া কথা শুনাইতে লাগিল। কেহ বা বলিল, "বেটা যেন মগের মলুক পেয়েছে নিলাম খরিদা জমার উপর জোর জুলুম আরম্ভ করেছে।"

বিচারকের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসিত হইল "পদ্মলোচন, এ ত সঙ্গত কথা এর উপর তোমার কি বলবার আছে?"

আহত বিষধরের লাঙ্গুলে হাত দিলে সে যেমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠে তেমনি চীৎকার করিয়া পদ্মলোচন বলিতে আরম্ভ করিল, "মার শ্রাদ্ধে সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা দিবে বলে আশা দিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট লেখিয়ে লয়ে আমার চার গণ্ডা টাকা দিয়েছিল! এক বছর পরে, হ্যাণ্ডনোটখানা পাইনি বলে গ্রামের ৩। ৪ জনের সমুখে সুদে আসলে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা নিয়েছে।

* * * * * * *

যখন সাক্ষ্য গ্রহণের অবসর হইল, তখন পদ্মলোচন তাহার উক্ত সাক্ষ্যগণের মুখের দিকে করুণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,— কিন্তু অর্থের প্রভাবে দীনের হৃদয়ের এ করুণ মিনতি তাহাদের মনে এতটুকু ধাক্কাও দিতে পারিল না। যখন সকলেই নীরব সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিচারক রায় দিলেন— "আর কি পদ্ম তোমার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই, এতে আইন আদালতও করতে পার বা মারামারি করেও মরতে পার তাতে আমাদের কিছুই নাই।"

পদ্মলোচনের হৃদয়খানা দুঃখে ও রাগে ফুলিয়া ও গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল,— এমনি ঘুষখোর বিচারকও সাক্ষ্যগণকে পদাঘাতে— বজ্রমুষ্টিতে শেষ করিয়া দেয়। আরও কত কি কথা তাহার মনে উদিত হইতেছিল। পদ্মলোচনের পুত্র পিতার ভাব দেখিয়া "ভাবনা কি বাবা, ভগবান আছেন, তিনি দরিদ্রেরি তাই তাঁর নাম দীনবন্ধু, অনাথনাথ, ————" বলিয়া পিতার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পিতার ক্রোধ দুঃখ কোথায় উড়িয়া গেল।

পিতা পুত্র বাহির হইয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই সকলেই নীরব।

গোপীনন্দন চোখ ঠেরাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন,—"বট্টার কেমন দেমাক দেখলে ?"

(গ)

বিচারক হইলে ঘুষখোর হইতে হয় ! এ দুর্নিতি বাঙ্গলার পল্লী হইতে কবে দূর হইবে ! দীনদরিদ্রের উপর অত্যাচারের অবসান হইবে !

পদ্মলোচনের বিবাদের ত মীমাংসা হইল না, অধিকন্তু গ্রামে যে ১টা অমঙ্গলের সূত্রপাত হইবে তাহার সূচনা হইল ! পদ্মলোচনের জমির ধান কাটিতে যাইলে যে মস্ত বড় একটা দাঙ্গা হইবে তাহাও বিচারাসনে উভয়পক্ষের তর্জ্জন গর্জ্জনে জানা গেল।

* * * *

অগ্রাণে পাকা ধানের গন্ধে দেশ ভরপূর হইয়া পড়িয়াছে, গোবর্দ্ধন যখন তাহার দলের সকলের নিকট টাকাবিনা কোন কাজ হইবেনা শুনিল, তখন জোর করিয়া তাহার উপ্ত ধান্য কাটিবে বলিয়া স্থির করিল।

নবান্নের দাগা দিনটীর দুদিন পূর্ব্বে পিতা পুত্রে পাঁচ কাঠা জমির ধান্য কাটিতে আরম্ভ করিল। বিবাদী জমি বলিয়া কেহ তাহা-দিগকে মজুর দিতে স্বীকৃত হইল না ! গোবর্দ্ধন তিনজন লাঠিয়ার সঙ্গে লইয়া আসিয়া কোন কথাটি পর্য্যন্ত না বলিয়া তাহার নিলাম খরিদ জমিতে অনধিকার প্রবেশ দেখিয়া পিতা পুত্রের উপর পড়িল।

বৃদ্ধ পিতা আর পুত্র কতক্ষণ টিকিবে ! পুত্রের মাথায় একটী সজোর লাঠির আঘাত পড়িতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল ! পুত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মাথা হইতে রক্তগঙ্গা ছুটিতেছে দেখিয়া পিতার স্নেহ-ময় হৃদয় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পুত্রের রক্তাক্ত মাথাটাকে পিতা কোলের উপর লইয়া বসিয়া পড়িল।

(ঘ)

পত্নীহীন পদ্মলোচন একমাত্র পুত্রের জন্যই লোটা বগল হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু সে পুত্র আজ পিতাকে ফাঁকি দিয়া পলাইল। আদালতের বিচার চলিতে লাগিল, কিন্তু যাহার জন্য এত কষ্ট সে যখন ফাঁক কাটিল তখন পদ্মলোচন গ্রামের কাহাকে কিছু না বলিয়া একদিন রাত্রে কোথায় বাহির হইয়া গেল।

গ্রামের লোকেরা টাকা কড়ি হইতে খড় কুটাটী পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিল, বৃদ্ধ যে কি লইয়া পলাইয়াছে তাহা তাহারা স্থির করিতে পারিল না।

* * * *

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির জন্যই হউক, আর ভগবানের ইচ্ছায়ই হউক, সে বৎসর বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে মহামারী দেখা দিয়াছে। সোণার পুর গ্রামে মহামারীর প্রাদুর্ভাব অনেকটা বেশী। স্ত্রীর যখন ভেদ বমি আরম্ভ হইল তখন গোবর্দ্ধন পুত্রটীকে রক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থ এক প্রতিবেশীর নিকট গেল।

গোবর্দ্ধন আর স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারিল না, তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর যখন গোবর্দ্ধনেরও ভেদ বমী আরম্ভ হইল তখন প্রতিবেশী কেহই তাহাকে গৃহে স্থান দিল না। অগত্যা পুত্রকে লইয়া গোবর্দ্ধনকে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

গ্রামের সাহসী দু একজন ভিন্ন আর সকলের যাতায়াত বন্ধ হইল। কিন্তু পুত্রটীরও কলেরা হইয়াছে, তাহাকে লইয়া গোবর্দ্ধন আরও বিপদে পড়িল। মাতা নাই, নিজে চোখ বুজাইলে ছেলেটীর আপনার বলিতে কেহ থাকিবেনা ভাবিয়া তাহার গা কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল, যাহার সহিত দেখা হয়, তাহার হাতে পুত্রটী আর যাকিছু আছে সবই তুলিয়া দিতে চাহিল কিন্তু কেহ তাহাতে কথাটী পর্য্যন্ত বলিল না।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার গোবর্দ্ধনের নিকট যমের মত ভয়ঙ্কর বোধ হইল। ছেলেটীর প্রাণের আশা রহিলেও গোবর্দ্ধনের আশা আদৌ নাই। "জল একটু" "জল একটু" সে ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে!

শুষ্ককণ্ঠে এক ঢোক জল পাইয়া গোবর্দ্ধন বলিল "কে বাঁচালি বাবা!"

"দাসের পো, আমায় চিন্তে পারবেনা বাবা, আমি পদ্ম।"

"কেও মণ্ডল খুড়ো, এতকাল কোথায় ছিলে? এখানে আসছ কেন? জল একটু— —" মৃতপ্রায় গোবর্দ্ধনের মুখে এক গণ্ডুষ জল দিয়া পদ্মলোচন বলিল "তোর ছেলেকে তোর বুক থাকতে ছিনিয়ে নিতে।" বলিয়া নরকের মত বাহ্নি-বমি-পূর্ণ বিছানা হইতে ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া চাঁদের মত ছোট মুখখানিতে সস্নেহে চুম দিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন এতক্ষণ চিত্রাপিতের ন্যায় পদ্মলোচনের কাণ্ড দেখিতেছিল! কি এক অপরূপ রূপলাবণ্যে তাহার মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। যাহাকে সে একদিন অনর্থক টাকা পাইয়াও চাতুরী করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রনা—এমন কি পুত্রশোক পর্য্যন্ত দিয়াছে, সে আজ তাহার অন্তিম সময়ে তাহার নিকট আসিয়াছে তাহার পুত্রকে রক্ষা করতে। আর যাহাকে নিতান্ত উপকারী ভাবিয়া উহাকে নিষ্পেষনের সময় কত অর্থ সাহার্য্য করিয়াছে, তাহার ত কে এমন দুদিনে মুখ তুলিয়া চায় না! ...... এমনি নানা চিন্তায় তাহার অন্তর খানা পুড়িয়া খাক হইতে ছিল, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস যেন তাহারি অগ্নি শিখা লইয়া বাহির হইল।

সে ক্ষীন অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "এমন নৃশংস অত্যা-চার—এমন কি তোমার পুত্র হন্তাকে কেমন করে ক্ষমা করলে মণ্ডল খুড়ো?"

পদ্মলোচনের মুখখানা একবার কেমন বিকৃত হইয়া গেল; তারপর তেমনি হাস্যকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বনের মাঝে নানা জীব মারামারি

করে মরছে বলে মনে কোনো মানুষও হিংসা করুক। মানুষের ধর্ম্মই যে ক্ষমা করা দাসের পো!"

ক্ষীণতর কণ্ঠে গোবর্দ্ধন উত্তর দিল "সত্যি মণ্ডল খুড়ো, আজ তোমার মুখে দেবতার জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি, সারা জীবন ধরে তোমায় শত্রু বলে ভেবে এসেছি; আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দেখতে পাচ্ছি তুমি আমার মস্ত বড় বন্ধু। জানতুম না তোমার কৃষকপ্রাণ এত উদার—এত মহৎ—এত দেবোপম! আজ তোমার হাতে আমার ছেলেকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারবো বলে আমার মনটা মৃত্যু শয্যায়ও আনন্দে উথলে উঠছে! এতদিন তোমার সব সম্পত্তি নিয়েও প্রকৃত নিলাম খরিদ্দার হতে পারিনি—তোমার পুত্রকে যমের হাতে তুলে দিয়ে। আজ কিন্তু তুমি প্রকৃত নিলাম খরিদ্দার হলে—আমার ছেলেকে যমের মুখ থাকতে ফিরিয়ে এনে!"

এই কথা কয়টী বলার পর কি যেন একটা শুষ্ক পাণ্ডুর ছায়া তাহার মুখখানিকে আবরিয়া ফেলিল। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুষ্ক ও জড়িত কণ্ঠে বলিল—"একটু জ—ল।"

তখন দূরে কোন শ্রান্ত পথিক ভীতকণ্ঠে গাহিয়া যাইতেছিল :—

"মন পাখী ছাড় কে চালাকী।
তুমি পরকে ফাঁকি দিতে গিয়ে
নিজের কাজে দাও ফাঁকি।"

শ্রীআদিত্যকুমার বাঁকুড়া

সুখ।

অদূরে জ্বলিছে আলো মিটি মিটি,
কভু নিবে কভু জ্বলে,
জমাট আঁধার চাপে আঁখি দুটী,
তবু ছুটি পাব বলে।

বন্ধুর প্রান্তরে স্খলিত চরণ;
উঠি পড়ি প্রভু স্মরে,
কণ্টক বেধনে যাতনা ভীষণ,
অবসাদে কাঁপি থরে;
পরাক্রম বৃত্তি তথাপি নিরত,
কভু ত না চাহি পিছে,
ধরিতে নারিনু আসি দূর যত,
এটা কি আলেয়া মিছে।

ছুটিলে পশ্চাতে দূরে সরে যায়,
স্থিরে হেরি কাছে তায়,
কিবা অপরূপ এর গতি হায়,
সবে তবু পিছে ধায়।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ।

তাজমহল

পৃথিবীবক্ষে মানবহস্তনির্ম্মিত আশ্চর্য্য বস্তুগুলির মধ্যে আগরার তাজমহল অন্যতম বলিয়া প্রায়ই পরিগণিত হয়। দর্শক ভারতবাসী হউন বিদেশীয় হউন তাজমহলের সৌন্দর্য্যদর্শনে বিহ্বল না হইয়া পারেন না। এইরূপ বহুমূল্য প্রস্তরাকীর্ণ, শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট সুসজ্জিত সমাধি আর নাই। এই অদ্ভুত কীর্ত্তির বক্ষে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট সাহাজাঁহা ও তাঁহার প্রাণপ্রিয়া পত্নী মোমতাজ সমাহিত আছেন।

আমি যখন আমার সহযাত্রীগণের সহিত আগরা কেল্লা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী পথে তাজমহল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি, তখন আমার একজন সহযাত্রী একটি শ্বেতবর্ণ বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ঐ তাজমহল।" আমরা যুগপৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "ঐ যদি তাজমহল হয়, আমাদের অর্থব্যয় নিষ্ফল হয়েছে, কায়িক পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।" যিনি এইরূপ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাঁহাকে নানারূপ ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্যে ফেলিয়া হাস্যপরিহাস করিতে করিতে সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রস্তরখণ্ডবিনির্ম্মিত পথে এক মাইল অগ্রসর হইলাম। হাস্যপরিহাসের মধ্যে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্বেতবর্ণ গৃহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা মাত্রই আমাদের মুখমণ্ডল একবারে সঙ্কুচিত হইয়াই বিস্ময়বিহ্বল হইল; আমাদের সহযাত্রীটি অপমানের প্রতিশোধ তুলিবার সুবিধা পাইয়াই বলিয়া উঠিল "কেমন আমার কথা ঠিক হয়েছে ত?"

সামান্য পথ অতিক্রম করিয়াই দেখিলাম সম্মুখে প্রশস্ত তোরণদ্বার। তোরণদ্বারের প্রাচীনত্ব ব্যতীত সৌন্দর্য্য বিশেষ উপলব্ধি করিলাম, কারণ নানা সহর ভ্রমণে দিল্লী ও আগরা কেল্লার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান একটু উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছিল। ঐ তোরণ পার হইবার পরই পথি-পার্শ্বে তৃণসমাচ্ছাদিত মাঠে পুষ্পবাটিকা পরিদৃষ্ট হইল।

আমাদের মন অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল, তাই এই সকল সাধারণ সৌন্দর্য্যে বিশেষ দৃকপাত না করিয়াই অদূরবর্ত্তী রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত কারুকার্য্যমণ্ডিত বৃহদাকার দ্বিতীয় তোরণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। দ্বিতীয় তোরণের সম্মুখে বামদিকে ফিরিয়াই অবাক হইয়া গেলাম! এই সেই আগরার তাজমহল! সার্থক আমার অর্থব্যয়, সার্থক আমার পথপর্য্যটন!!"

সকলে দ্রুতচরণবিক্ষেপে তোরণপার্শ্বে কি বৃত্তান্ত ও কি বিজ্ঞাপন লেখা আছে দেখিবার জন্য দৌড়িয়া গেল। আমি তোরণ মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে তাজমহলের দিকে চাহিয়া রহিলাম—ভাবিলাম সত্যই যেন বিমল শুভ্রচন্দ্রালোক জমাট বাঁধিয়া তাজমহলরূপে ভূতাত্মকদেহ ধারণ করিয়াছে। তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়া মনে হইল তাজমহলে পৌঁছিতে আরও এক মাইল পথ যাইতে হইবে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; তাজমহল নির্ম্মাণের এরূপ কৌশল যে তাজমহলের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লক্ষ্য করিলে মনে হয় উহা বহুদূরে অবস্থিত। তোরণ দ্বারের দ্বিতলে তাজমহলের নানাবিধ প্লানে, সাহজাঁহার ও মোমতাজের প্রতিকৃতি ইত্যাদি বহুবিধ দর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি আছে জানিলেও আমাদের মন তাজমহলের সৌন্দর্য্যে অভিভূত— তাই আমরা তোরণদ্বার ছাড়িয়া শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত চৌবাচ্চার পার্শ্ব দিয়া উভয় পার্শ্বস্থ পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এই পুষ্পবাটিকার তুলনায় কলিকাতার ইডেন গার্ডেন ও দিল্লীর কুইন্স পার্কের সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোরম মনে হইল না; দ্বিতীয় তোরণ ও তাজমহলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী উচ্চ চৌবাচ্চা, তাহার জল কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ ও বরফের ন্যায় শীতল। তাহার মধ্যে জলপদ্ম শোভা বিকাশ করিতেছে।

এই চৌবাচ্চার উপরিস্থিত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত চৌকীর উপর বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে তাজমহল, পুষ্পবাটিকা ও তোরণদ্বারের সৌন্দর্য্য সম্যকরূপ উপলব্ধি করা যায়। তোরণদ্বার হইতে তাজমহল পর্য্যন্ত যে ফোয়ারাগুলি আছে তাহাতে জলবিন্দু বিচ্ছুরণ না থাকিলেও শ্বেতচৌবাচ্চার জলের উপরে জীবনহীন ফোয়ারাশ্রেণীটী বেশ দেখায়।

বড়লাটের লিখিত আদর্শানুযায়ীও বটে আন্তরিক শ্রদ্ধায়ও বটে আমরা আমাদের পাদুকাগুলি নিম্নে খুলিয়া রাখিয়া তাজমহলের উচ্চ প্রাঙ্গনে উঠিয়াই তাজমহলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সাহজাঁহার ও মোমতাজের কবরের পার্শ্বে একজন মোল্লা দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের আগমনে তিনি গম্ভীরস্বরে "আল্লা" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেন। ঐ শব্দটী কতক্ষণ ঐ গৃহের উর্দ্ধদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কারুকার্য্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা আমাদিগকে অতি ধীরে বলিতে হইতেছিল। কারণ সাধারণ স্বরে দুই তিনজন কথা বলিলে প্রতিধ্বনিতে সমূহ কথা ডুবিয়া যাইত।

কবরে ও দেওয়ালে হাত দিয়া আমরা সহযাত্রীগণ কারুকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিলেও আমি সাহজাঁহার পত্নীপ্রীতির কথা ভাবিতেছিলাম। ইংরাজকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার স্ত্রীর উদ্দেশে কবিতা লিখিয়া ও সাহজাঁহা তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর জন্ম এইরূপ কবর নির্ম্মান করিয়া পত্নীপ্রীতির যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যজনক। একথা সকলেই বোধ হয় জানেন, সাহজাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মোমতাজ একদিন রহস্যচ্ছলে সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মৃত্যুর পরেও কি আমাকে এইরূপ ভালবাসিবেন?"

তদুত্তরে সাহজাঁহা বলিয়াছিলেন " আমি তোমার স্মৃতির জন্য এরূপ কার্য্য করিব যাহা দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইবে ।" সাহজাঁহা তাঁহার কথা প্রকৃতই রক্ষা করিয়াছিলেন— তাজমহলের ন্যায় এরূপ সুদৃশ্য মনোরম গৃহ জগতে আর নাই । এই সমাধি ১৬৩১ খৃীঃ আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খৃীঃ ইহার নির্ম্মান কার্য্য শেষ হয় । ক্রমাগত সতের বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ২২০০০ কারিগর ইহার নির্ম্মান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল । ইটালী ও গ্রীস হইতে কারিগরগণ আসিলেও সম্ভবতঃ ভারতীয় সুদক্ষ শিল্পিগণই এই বিশ্বমনোরম সৌধ নির্ম্মান করিয়াছেন । ভারতীয় স্থাপত্যরীতি ইহাতে যথেষ্ট আছে ।

সাহজাঁহা ও মোমতাজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কারুকার্য্যখচিত গোলাকৃতি প্রকোষ্ঠ ও তাহার উচ্চতা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়? কবরের উপরে যে যে নানাবিধ প্রস্তরখণ্ডে পুষ্প রচিত আছে তাহা দেখিয়া মিঃ ভয়সের কথা মনে হইল । তিনি বলিয়াছিলেন— একটী পুষ্পের মধ্যে একশত খণ্ড নানাবর্ণের প্রস্তর আছে ও ঐ প্রস্তর এইরূপ সুন্দরভাবে কাটা হইয়াছে যে দেখিলে পুষ্পগুলিকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয় । বিশপ হেবার বলিয়াছিলেন কারুকার্য্য গুলির সৌন্দর্য্য নয়নতৃপ্তিকর আড়ম্বর অপেক্ষাও অধিক impressive, এই সৌন্দর্য্য দেখিয়াই কর্ণেল স্লীমানের পত্নী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন "যদি এইরূপ সমাধি দ্বারা আমাকে সম্মানিত করা হয় তবে আমি কালই মরিতে প্রস্তুত আছি।"

কবরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রকোষ্ঠগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আমরা পার্শ্বস্থ মিনারগুলিতে উঠিতে লাগিলাম । যমুনা পার্শ্বস্থ একটী মিনারে উঠিয়া যমুনার দৃশ্য, আগরা কেল্লার দৃশ্য, ও তাজমহলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম । তাজের দৃশ্য যতই দেখিতে লাগিলাম ততই দর্শনেচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল ।

সত্যই কবি তাজমহলকে "মর্ম্মরে রচিত কাব্য" ও "মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্ন-দৃশ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; বাস্তবিকই তাজমহল অতুলনীয় দৃশ্য।

শ্রীগোরাচাঁদ গিরি।

সময়-বিহঙ্গ

[১]

বলে যারে তুই সময় বিহঙ্গ
গেয়ে গেলি আজ কোন সুরে,
রেখে গেলি তার একি নব তান
চির জাগরণ ভবপুরে।
অসাড় হৃদয়ে শকতি চালিলি,
অলস চোখের ঘুম ভেঙ্গে দিলি,
ভুবন ভরিয়া তরঙ্গ তুলিলি
করমের স্রোত গেল ঘুরে।
বলে যারে তুই সময়-বিহঙ্গ
গেয়ে গেলি আজ কোন সুরে।

[২]

তোর সুর-ধ্বনি ভূধরে, গহনে
হইবে ধ্বনিত গগনে, পবনে,
জলধির তানে মানবের প্রাণে,
রহিবে সে তান যাবেনা দূরে.
বলে যারে তুই সময়-বিহঙ্গ
গেয়ে গেলি আজ

[৩]

শত কোটি প্রাণ উঠিল জাগিয়া,
স্বাধীন জীবন সাধনা লাগিয়া,—
খোদার আশিষ আসিল নামিয়া
জাগিল ভারত তোর সুরে
বলে যারে তুই সময় বিহঙ্গ
সাধনার ধন কত দূরে।

[৪]

আসিবে সেদিন– সুদিন কখন
বিশ্ব-মানব মহা সম্মিলন
স্বাধীন আলোকে হাসিবে ভুবন
বহিবে পুলক হৃদি-পুরে
বলে যারে তুই সময়-বিহঙ্গ
গেয়ে গেলি আজ কোন সুরে।

[৫]

মানবের কাছে মানব জীবন
দলিত মথিত রবে কতক্ষণ
মোদের রাজ্যে স্বাধীন জীবন
—বলে যাকে পাখি, আয় ঘুরে,
দিয়ে যারে পাখি! সাধনার ধন,
গেয়ে গেলি আজ কোন সুরে।

শেখ মহিউদ্দিন আহম্মদ

চয়ন।

শিক্ষায় স্বাধীনতা।

* * * * * *

শিক্ষা প্রনালীর যদি পরিবর্ত্তন না হয় তবে দেশের মুক্তি নাই। তাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন। পরীক্ষা পাশের জন্য কতকগুলি তথ্য গলাধকরণ করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয়না—লোকের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কতকগুলি ভাব ও সূত্রের পরিপাক করাই জ্ঞান বৃদ্ধির সোপান নহে। * * * প্রাচীন শিক্ষা প্রনালী বিষবৎ পরিত্যজ্য। ছেলেদের পরিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বাধীনতা উন্মেষের উপযোগী হওয়া দরকার। প্রত্যেক শিশুকে তাহার স্বাভাবিক কল্পনা শক্তির বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। কোনরূপ কৃত্রিম শাসন বা কঠোর বাধাবাধ্যকতার মধ্যে না রাখিয়া শিশুর চিত্তকে মুক্তক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতে দিতে হইবে। স্কুলে শিক্ষকেরা এক পাশে দাঁড়াইয়া ছেলেদের চিত্তের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন— তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিবেন না। ইহাতে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে শিশুর চিত্ত আপনা হইতেই সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে। তাহারা পৃথিবীর দুরূহ সমস্যাগুলিও সহজে মীমাংসা করিতে পারিতেছে, কারণ তাহারা যে স্বর্গ রাজ্যের সাযুজ্য হইতে অল্পদিনমাত্র পৃথক হইয়াছে।

শিশুর স্বাভাবিক সৎবুদ্ধির উপর বিশ্বাস রাখিয়া এইভাবে শিক্ষায়তন— প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই যে চৈতন্য বোধ আছে, তাহারই আলোকে সে তাহার নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান করিতে পারে, এই সত্যে আমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে। কোনরূপ বাহ্যিকভাবে-বা আইন কানুনের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এমন কতকগুলি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। পরীক্ষার হাঙ্গামা রাখিলে চলিবেনা। কারণ তাহাতে শিশুর কচি প্রাণে কঠোর দাগ লাগে।

বাগানের মালী যদি প্রত্যেকটী গাছ কতখানি বড় হইল তাহা দেখিবার জন্ত উহার গোড়া খুঁড়িয়া ফেলে তাহাতে চারাগুলি নষ্ট হয়— পরীক্ষার দ্বারা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সেইরূপ বিফল হইয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতেও সেইরূপ হওয়া দরকার। মানবশিশুর আত্মা কিরূপে বিকাশলাভ করে, আমরা সবে তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি! ভবিষ্যতে ইহার সফলতার বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতের শিশুর আত্মা মুক্তিলাভ না করিলে ভারতের আশা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেনা।

আমরা ভারতের মুক্তি চাই। প্রথমে এইজন্ত শিশুদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহাদের প্রকৃতির অদ্ভুত ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহাহইলেই আমরা শিশুদের স্বরূপ বুঝিব, আর বুঝিব স্বর্গরাজ্য তাহাদের।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শিক্ষক, কার্ত্তিক ১৩৩০

রাখী

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশিস আমার কাজে সফল হবে বিশ্বমাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে॥
কর্ম্ম করি যে হাত লয়ে কর্ম্ম-বাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি, সকল বাঁধন যাবে কাটি
কর্ম্ম তখন বীণার মত বাজবে মধুর মূর্চ্ছনাতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশ্বিন ১৩৩০

বঙ্কিমের বাঙ্গলা ।

বাঙ্গলার নবীন যুগের মন্ত্র দাতা ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র বাঙ্গালীর নিকটে উপন্যাস-কার বলিয়াই বিখ্যাত । তাঁহার উপন্যাস-রচনাচাতুর্য্যের মধ্যে মানবের মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে বহু সাহিত্যিক ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। "বঙ্কিম বাবুর নভেল" দেশের উপন্যাস পিপাসু পাঠক বৃন্দের বড়ই তৃপ্তিকর । কেননা তাহার নূতনত্ব চিরকালই অটুট । কিন্তু এই উপন্যাসকার বঙ্কিম ভিন্ন আর একটী নূতন মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে সেটী বাঙ্গালী বঙ্কিমের মূর্ত্তি । বাঙ্গলা দেশে জন্মিলে বাঙ্গালী হয় একথা অভিধানে সত্য হইলেও প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইলে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ছাড়া আরও কিছু থাকা চাই, তাই বলিতেছি, বাঙ্গলা দেশে জন্মিলেই বাঙ্গালী হয় না। যে এই সোনার বাঙ্গলার শস্য জলে জীবন ধারণ করিয়া এই দেশকে, ইহার গৌরবময় অতীতকে, ইহার প্রাচীন তত্ত্ব জ্ঞানের আদর্শকে ভুলিল, তাহাকে কোন প্রাণে বাঙ্গালী বলিব। যে বাঙ্গালী অর্থে ভীরু কাপুরুষ বুঝায় আমি সে বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না! যে বাঙ্গালী সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, মগ ফিরিঙ্গীকে দমন করিয়াছিল, বন্দেমাতরম্ গান করিতেছিল আমি তাহার কথা বলিতেছি। বঙ্কিম চন্দ্র সেই বাঙ্গালী ছিলেন ফাঁকা প্রেমের উপন্যাসকার ছিলেন না। যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন—কেমন করিয়া ছত্রে ছত্রে বাঙ্গলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শারদীয়া পূজার দিনে কেমন করিয়া এই বাঙ্গলার মাতৃ মূর্ত্তি তাঁহার রুদ্ধ-হৃদয়ের সমুদয় আকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমরা

অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহার পরি কল্পনা শারদীয়া মূর্ত্তি অনন্ত কালসাগরে ডুবিলে আর সেই মাতৃভক্ত সন্তান আকুল স্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— উঠমা বঙ্গজননি, উঠ দেবি, দেবানুগৃহিতে, এবার সুসন্তান হইব, তোমার মুখ রাখিব, আপনা ভুলিব, ভাতৃবৎসল হইব। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! একাই রোদন করিতেছি, উঠমা।

তাই বলিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব দেখান নাই। তিনি বাঙ্গলার প্রাণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গলার বন্দনা-গাতি আজ ভারতবর্ষের দূর হইতে দূরতম প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ শুধু বাঙ্গলার নয় সমগ্র ভারতের তরুণ-হৃদয় তাঁহার রচিত দুইটী কথায় পুলকে, হর্ষে, নির্ভয়তায়, তন্ময়তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বঙ্কিমের সে বাঙ্গলা কবে সকল বাঙ্গালীর চক্ষে প্রতিভাত হইতেপারিবে তাহা বলিতে পারিনা কিন্তু বঙ্কিমের বাঙ্গলা একদিন যে অতীত গৌরবের মহিমায় মহিমান্বিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

কমলাকান্ত বাক্তয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের দিন হইতে দিন গনিত। কিন্তু আক্ষেপ করিত, "মনের মানসে বিধি মিলাইল কই।" আর জাহ্নবীকে তিরস্কার করিয়া বলিত— "বিশ্বাসঘাতিনি! তোর অতল সলিলে নিশ্চয়ই বাঙ্গলার রাজলক্ষ্মী লুকাইয়াছেন। বুঝি কুপুত্রগণের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া চিরতরে অন্তর্হিতা হইয়াছেন। এখনও কুপুত্রগণ সুপুত্র হয় নাই— এই ছিল বঙ্কিমের কথা। বঙ্কিম একা রোদন করিয়াছে, একা প্রার্থনা করিয়াছে— আমরা তাহাকে ও তাহার বাঙ্গলাকে একবার চিনিব কি?

শ্রীরমণীমোহন মাইতি

আবহাওয়া।

স্বরাজ্য পার্টী হইতে মেদিনী মাতার সুসন্তান শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা হইতে ও স্বদেশ সেবক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মাইতি মেদিনীপুর দক্ষিণ বিভাগ হইতে মনোনীত হইয়াছেন। দেশনায়ক শ্রীযুত সাতকড়ি পতি রায় এম, আর দাসকে পরাজিত করিয়া মেদিপুরের মুখোজ্জল করিয়াছেন।

এবার বাঙ্গলার অপূর্ব্ব দৃশ্য, অলৌকিক কাণ্ড-স্বরাজ দলের" কনষ্টিটিউসনাল পর্টি" ও একা একদলের (Independent) অভূত পূর্ব্ব যুদ্ধ। তবে অধিকাংশ স্থলে "স্বরাজ দল" জয় মাল্য ও "কনষ্টিটিউস্তাল পার্টী চুণ-কালি পাইয়াছেন। নির্ব্বাচন পূর্ব্বে প্রায় সকলেই জাহির করিয়াছিলেন তাঁহারা স্বদেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিবেন। নির্ব্বাচিত অনির্ব্বাচিতের মধ্যে যিনি দেশ সেবা না করিবেন তাঁহাকে মিথ্যা বাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া ঘৃণা করা উচিত।

সাহিত্যের নোবল প্রাইজ ভারতের ইনি পাইবেন তিনি পাইবেন বলি সংবাদ পত্র মহলে নানা কথা রটিয়াছিল। আসলে এমন পাইলেন কে ?

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ আবার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তিনি আশা রাখেন আবার ইংলণ্ডে প্রচার দ্বারা ভারতের সৌভাগ্য ফিরাইবেন।

দানবীর যুগল কিশোর বিরলা "কাশী—হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ে" ১৫ টাকা করিয়া একশতটী বৃত্তি দিতেছেন। এদিকে প্রত্যেক হিন্দুর দৃষ্টি পড়া বাঞ্ছনীয়।

"জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" হইতে ৩ জন যুবক উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভের জন্য জার্ম্মানীতে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রেথিতনামা বৈজ্ঞানিক হউন ইহা আমরা আশা করি।

"নায়কের" ধারা, "হিন্দুবান্ধব" বন্ধু "সাহিত্যের" ওস্তাদ ইত্যাদি নানা পত্রিকার সুরসিক লেখক ৺পাঁচ কড়ি বন্দোপাধ্যায় আর ইহ-জগতে নাই ; তাঁহার ন্যায় নির্ভীক সমালোচক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বিরল। তাঁহার বৃদ্ধ মাতা-পিতা এখনও জীবিত ! তাঁহাদিগকে আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব।

"সন্দেশ" সম্পাদক ৺সুকুমার রায় চৌধরী ওপারের যাত্রী হইলে। তিনি শিশু সাহিত্যে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন এবং বিলাত হইতে ব্লক প্রস্তুত প্রনালী উত্তম রূপে শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি।

বরিসালের প্রথিতনামা স্বদেশ সেবক, অক্লান্ত কংগ্রেস কর্ম্মি, ত্যাগী কর্ম্মবীর সাহিত্যিক ৺অশ্বিনী কুমার দত্ত ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন তাঁহার স্বদেশ সেবা—স্বজন প্রীতি—ত্যাগ ও সদানুষ্ঠান তাঁহাকে চির-দিন অমর করিয়া রাখিবে।

আলিগড়ের গণিতাধ্যাপক, গণিতবিদ্যায় পারদর্শী ৺যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন ! তাঁহার সন্তপ্ত পরিজনের সহিত আমারা সম-বেদনা প্রকাশ করিতেছি।

—। সমাপ্ত।—

হরিপুর বাণী প্রেসে—
শ্রী যাদব চন্দ্র সিংহটাল দ্বারা মূদ্রিত।

সূচি

নিবেদন— ২য় বর্ষের শোভনার কলেবর বৃদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করণ হেতু যাবতীয় আয়োজনের জন্য এবং প্রেস বিভাগের কোন কোন অভাব পূরণ জন্য ২য় বর্ষের শোভনা কিছু বিলম্বে অর্থাৎ ১লা মাঘ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বাহির হইবে। গ্রাহকগণ ঐ সময় হইতে যথারীতি পত্রিকা পাইবেন।

বিনীত— শোঃ সম্পাদকদ্বয়।

নিয়মাবলী

শোভনার বার্ষিক মূল্য দুই টাকা প্রতি সংখ্যা তিন আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষারম্ভ হয়। শোভনা প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। পরের সপ্তাহে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকবিভাগে অনুসন্ধান করিয়া সেই উত্তর সহ আমাদিগকে জাণাইতে হইবে নতুবা নগদ মূল্যে সেই সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিবেন ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার-রূপে লিখিবেন। রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয় না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত লইতে হইলে ডাক খরচ দিতে হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তাহার উত্তর দিতে সম্পাদক অসমর্থ।

বাং ১০ইর মধ্যে টাকা সহ বিজ্ঞাপন পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হয় এবং বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসে ১০ইর মধ্যে জানান চাই।

সাধারণ পৃষ্ঠা ৫ — কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা ৯

ঐ অর্দ্ধ „ ২৷৷ — ঐ অর্দ্ধ „ ৫

ঐ সিকি „ ১৷৷ — ঐ ২য় ৩য় „ ৭

অন্যান্য বিষয় টিকিট সহ পত্র দ্বারা অবগত হউন, টাকা কড়ি ও প্রবন্ধাদি নিম্নের ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ "শোভনা" নন্দিগ্রাম, মেদিনীপুর